খুশবন্ত সিং নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ পাঞ্জাবী গল্প

অনুবাদঃ অনীশ দাস অপু



শ্রেষ্ঠ পাঞ্জাবী গল্প
শ্রেষ্ঠ পাঞ্জাবী গল্প
শ্রেষ্ঠ পাঞ্জাবী গল্প

খুশবন্ত সিং নির্বাচিত
শ্রেষ্ঠ পাঞ্জাবী গল্প

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

ব র্ত মা ন স ম য়

খুশবন্ত সিং নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ পাঞ্জাবী গল্প

অনুবাদ   অনীশ দাস অপু



প্রকাশক
বর্তমান সময়
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
পহেলা বৈশাখ ১৪১৪
১৩ এপ্রিল ২০০৭

কম্পোজ
মঞ্জুরী কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (২য় তলা)
বাংলাবাজার

ছাপা
হেরা প্রিন্টার্স

মূল্য ১৮০.০০ টাকা

ISBN   984-794-062—8

উৎসর্গ

কৈশোরে আমি তাঁর 'চিতা-রহস্য' পড়ে রীতিমত মুগ্ধ। এরপর তাঁর লেখা পড়ার নেশা ধরে গেল। কিশোর তারকালোক-এ তিনি যখন সম্পাদক, ওই সময় লেখা দিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। সুদর্শন, হাসিখুশি মানুষটিকে প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে গেল। আমার অনুবাদের খুব প্রশংসা করছিলেন তিনি। মূলতঃ তাঁর উৎসাহেই ওই পত্রিকায় লিখতে শুরু করি আমি। তিনি এক সময় সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দিলে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তাঁর লেখা পাঠ থেকে কখনও নিজেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেইনি। গ্রামের পটভূমিকায় যে সব গল্প এবং উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন, আমার ধারণা, ভাষা শৈলী এবং কাহিনীর বৈচিত্রে তার ধারে কাছেও কোনও লেখক যেতে পারবেন না।

তিনি আমার প্রিয় কথা সাহিত্যিক

ইমদাদুল হক মিলন

সূচি

ভূমিকা ০৪।০৩।

আমি হিন্দি, উর্দু এবং পাঞ্জাবি ভাষায় বহু গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করেছি। এসব গল্প নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বেশীরভাগ ছাপা হয়েছে দ্য ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়ায়। ওই সময় এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম আমি। এসব গল্পের কিছু আবার অনূদিত হয়েছে তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, কানাড়া, মারাঠী, গুজরাটি এবং বাংলাভাষায়। আমার ঠিক মনে নেই পাঞ্জাবি লেখকদের লেখা গল্প নিয়ে সংকলন করতে কে আমাকে উৎসাহিত করেছিল। তবে এ বইয়ের নামকরণই বা পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ গল্প কেন করা হলো তাও আমার ঠিক বোধগম্য নয়। কারণ সবগুলো গল্প কিন্তু পাঞ্জাবকে ঘিরে নয় এবং আব্বাসের মতো লেখক ওই প্রদেশে জন্মগ্রহণ করলেও সেখানে বাস করতেন না কিংবা পাঞ্জাবি ভাষা বলতে অথবা বুঝতে পারতেন না। কিন্তু গল্প সংকলনটি যেহেতু এ নামেই দাঁড়িয়ে গেছে কাজেই আমার কিছু বলার নেই।

পঞ্চ নদীর দেশ পাঞ্জাবের লেখকদের মধ্যে কী বিশেষ কিছু আছে ? আমার বিশ্বাস আছে। কিছু গল্প স্টেরিও টাইপ হলেও সে সব কাহিনিতে রয়েছে বৈচিত্র। এ বইয়ের দু'টি গল্প আমার সর্বকালের সেরা প্রিয় গল্প। গল্প দু'টি হলো খাজা আহমেদ আব্বাসের *শেখ বুরহানউদ্দিনের মৃত্যু* এবং সাদত হাসান মান্টোর *পাগল বিনিময়*। এ গল্প দুটিতে পাঞ্জাবি চরিত্র নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, দেশ ভাগের পরে পাঞ্জাবি মুসলমান, পাঞ্জাবি হিন্দু এবং শিখদের করুণ গাথা দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। আর কোনও ছোট গল্পে, এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে এমন দক্ষতার সঙ্গে এটা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

এ গল্প সংকলনে আমি দু'জন নতুন পাঞ্জাবি লেখিকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি পাঠকদের । তাঁরা হলেন অজিত কাউর এবং উষা মহাজন। অজিত কাউর চমৎকার বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সরস ভঙ্গিতে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। আমি অজিত কাউরের আরও কিছু গল্প প্রকাশ করেছি। উষা মহাজনের নাম বেশীরভাগ পাঠকের কাছে নতুন মনে হবে। পাঁচবছর আগে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। তখন তিনি কিছুই লিখতেন না। হতাশ, নির্যাতিত এক গৃহবধূ ছিলেন উষা যিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চাইতেন। আমি তাঁকে লেখালেখিতে উৎসাহী করে তুলি। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল এঁকে দিয়ে হবে।

উষার লেখা হিন্দি গল্প আমি দ্য ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া'য় ছেপেছি। এরপর দেশের স্বনামধন্য নানান পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে। এবং নিজে একটি গল্প সংকলনও প্রকাশ করেছেন।

এই গল্প সংকলনে পাঞ্জাবের সেরা অনেক লেখকের গল্প স্থান পেয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে অনেক ভালো লেখকের গল্প এখানে সংকুলান করা যায়নি সময়ের অভাবে। কারণ তাঁদের লেখা অনুবাদ করার সময় বা শক্তি কোনটাই আমার ছিল না। তবে এজন্য তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

খুশবন্ত সিং

অনুবাদকের অনুভূতি

খুশবন্ত সিং-এর লেখার দারুণ ভক্ত আমি। কিন্তু তাঁর কোনও গল্প বা উপন্যাস অনুবাদের সুযোগ এর আগে ঘটেনি। খুশবন্ত সিং-এর জনপ্রিয় এবং সাড়াজাগানো গল্প উপন্যাসগুলো বেশীরভাগ আগেই অনুবাদ হয়ে গেছে। যদ্দুর জানি, এ বইটি এখনও অনুবাদ হয়নি। এটি বই আকারে প্রকাশ করব এমন ভাবনাও ছিল না। এ বইয়ের কিছু গল্পের অনুবাদ রহস্য পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। গল্পগুলো পড়ে খুব প্রশংসা করতেন সেবা'র স্বনামধন্য লেখক কাজী শাহনূর হোসেন। সেবা'র আর এক শক্তিমান লেখক কাজী মায়মূর হোসেন উৎসাহ যোগাতেন খুশবন্ত সিং-এর সম্পাদিত আরও গল্প অনুবাদে। মূলতঃ ওঁদের দু'জনের উৎসাহেই আমি খুশবন্ত সিং-এর পাঞ্জাবী ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত গল্পগুলোর বঙ্গানুবাদ শুরু করি। প্রখ্যাত প্রচ্ছদশিল্পী ধ্রুব এষ এসব গল্পের ইলাস্ট্রেশন করেছেন রহস্য পত্রিকায়। তিনি খুবই চমৎকৃত গল্পগুলো পড়ে। আমি পাঠকদের কাছ থেকেও বেশ সাড়া পাচ্ছিলাম। তখন ভাবলাম গল্পগুলো দিয়ে একটা সংকলন করা যায় কিনা। প্রকাশককে বলতেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। তারপর....

...রহস্য পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পসহ আরও কিছু নতুন গল্পের অনুবাদ সংযোজিত হয়েছে এ বইতে। গল্পগুলো সম্পর্কে আমি একটা কথাই বলব- গল্পগুলো বিষয় বৈচিত্রে অসাধারণ ! কোনও কোনও গল্প পড়ে আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি *(তাই ইশ্রী)* আলোড়িত হয়েছি *'শেখ বুরহানউদ্দিনের মৃত্যু,' 'কেরোসিনের গন্ধ', 'সাদাত' পড়ে। ভাবিয়েছে 'অন্ধ গলি', 'ফুলশয্যা'* এবং *'খিদে'র* মত গল্প। এ সংকলনের কোনও কোনও গল্প আমাকে স্তম্ভিত করেছে, শিহরিত করেছে। সবশেষে ভেবেছি খুশবন্ত সিং যদি এ গল্প সংকলনটি প্রকাশ না করতেন আমরা খুব ভালো কিছু গল্প পাঠ থেকে বঞ্চিত হতাম। পাঠক, খুশবন্ত সিং-এর সম্পর্কে যারা জানেন তাঁদেরকে কিছু বলতে চাই না, কিন্তু যারা এই অসম্ভব প্রতিভাধর মানুষটির লেখা পড়েননি কিংবা সম্পাদক হিসেবে তাঁর তীক্ষ্ণধী সম্পর্কে অবগত নন, তাঁরা চোখ বুজে এ বইটি পড়তে পারেন।

গ্যারান্টি দিচ্ছি, গল্পগুলো পড়ার সময় অনুবাদ করতে গিয়ে যে সব বিচিত্র অনুভূতির সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছি, আপনিও সেই আবেগ দ্বারা আক্রান্ত হবেন।

অনীশ দাস অপু
২৬৩, জাফরাবাদ (৪র্থ তলা)
শংকর, ঢাকা।

বিষ্ণুর চিহ্ন

খুশবন্ত সিং

'এটা কালনাগের জন্য,' একটা প্লেটে দুধ ঢালতে ঢালতে বলল গঙ্গারাম। 'প্রতি রাতে দেয়ালের কাছের গর্তের সামনে আমি দুধটা রেখে আসি। সকাল বেলায় দেখি পিরিচে দুধ নেই।'

'বোধহয় বেড়ালে খেয়ে যায়,' কিশোররা বলি।

'বেড়াল !' মুখ বাঁকায় গঙ্গারাম। 'কোনও বেড়ালের গর্তের ধারে যাবার সাহস নেই। কালনাগ থাকে ওখানে। ওকে যতদিন দুধ খাওয়াব ও ততদিন কাউকে কামড়াবে না। খালি পায়ে তোমরা ওখানে যেতে পারো, খেলতে পারো।'

'তুমি একটা বোকা ব্রাহ্মণ,' বলি আমি। 'জানো না সাপ দুধ খায় না ? বিশেষ করে প্রতিদিন তো এক প্লেট করে দুধ খাওয়ার প্রশ্নই নেই। সার বলেছেন সাপ অনেক দিন না খেয়ে থাকতে পারে। সেদিন একটা ঢোঁড়া সাপকে ব্যাঙ খেতে দেখেছি। গিলতে পারেনি। গলার কাছ ঠেকে ছিল। কয়েকদিন সময় লেগেছে গিলতে। মেথিলেটেড স্পিরিটের মধ্যে, ল্যাবে আমরা এরকম সাপ ডুবিয়ে রাখি। গতমাসে সার এক সাপুড়ের কাছ থেকে দু'মুখো একটা সাপ কিনে এনে আমাদের দেখিয়েছেন। ল্যাবের একটা বোতলও খালি ছিল না বলে রাসেলস ভাইপারের জারে ওটা রাখেন তিনি। তারপর যা মজা হলো! জারের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে যেতে লাগল। বড় সাপটা টুকরো টুকরো করে ফেলল রাসেলস ভাইপারটাকে।'

গঙ্গারাম আঁতকে উঠে বুজে ফেলল চোখ। 'এ জন্য তোমাদেরকে একদিন ভুগতে হবে। অবশ্যই ভুগবে।'

গঙ্গারামের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। সে অনেক হিন্দুর মত ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের পরম ভক্ত। এদের মধ্যে বিষ্ণুর প্রতি তার ভক্তি সবচেয়ে বেশি। প্রতিদিন সকালে সে চন্দন কাঠ জলে গুলে কপালে ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মত তিলক কাটে। ব্রাহ্মণ হলেও সে অশিক্ষিত, কুসংস্কারে ভরা মন। তার কাছে সকলের জীবন পবিত্র। সে সাপ, বিছে আর কেন্নোই হোক। আমরা এগুলো দেখতে পেলেই মেরে ফেলি। অথচ গঙ্গারাম ওগুলোর কোনটাকে রাস্তায় বা মাঠে পড়ে থাকতে দেখলে দ্রুত নিরাপদ

স্থানে সরিয়ে রাখে যাতে আমাদের চোখে না পড়ে। ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটের বাড়ি মেরে আমরা সোৎসাহে ভিমরুল কিংবা বোলতা আহত করি। আর গঙ্গারাম আহত বোলতার পাখা জোড়া লাগানোর চেষ্টা করতে গিয়ে হুলের দংশন খায়। তবু তার বিশ্বাস বিন্দুমাত্র টলে না। যে প্রাণী যত বেশি বিপজ্জনক, তার প্রতি গঙ্গরামের শ্রদ্ধা তত বেশি। আর সাপের মধ্যে সে সবচেয়ে বেশি ভক্তি করে গোখরা অর্থাৎ তার কালনাগকে।

'তোমার কালনাগকে দেখতে পেলেই মেরে ফেলব,' বলি আমরা।

'তোমাদেরকে অমন কাজ করতেই দেব না। ও শখানেক ডিম পেড়েছে। কালনাগকে মেরে ফেললে সবগুলো ডিম ফুটে গোখরা বেরিয়ে এসে ভরিয়ে ফেলবে বাড়িঘর। তখন কী করবে?'

'ওগুলোকে জ্যান্ত ধরে বোম্বে পাঠিয়ে দেব। ওগুলোকে দুধ দুইয়ে ওরা সাপে কাটার ওষুধ বানাবে। একটা জ্যান্ত গোখরা সাপের জন্য ওরা দুই রূপী দেয়। তার মানে দুশো রূপী পাব আমরা।'

'আমি কোনদিন শুনিনি সাপের দুধ হয়। দেখিওনি। তবে সাবধান এটার গায়ে হাত দিতে যেয়ো না। এটা ফণিহার-ফণা আছে। আমি দেখেছি। তিন হাত লম্বা। লেজ থেকে মস্ত ফণা পর্যন্ত।' হাতের তালু মেলে ফণার আকার দেখায় গঙ্গারাম। 'মাঠে ওকে রোদ পোহাতে দেখবে।'

'তুমি আমাদের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলছ। পুরুষ সাপের ফণা থাকে না। কাজেই একশো ডিম পাড়ার প্রশ্নই ওঠে না। তুমিই নির্ঘাত ডিমগুলো পেড়েছ।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি আমরা।

'ওগুলো অবশ্যই গঙ্গারামের পাড়া ডিম। আমরা শীঘ্রি একশো গঙ্গারাম পেতে চলেছি।'

গঙ্গারামকে নিয়ে তামাশা শুরু করে দিলাম। চাকরবাকরদের নিয়ে তামাশা করতে মজাই লাগে। তবে আমাদের ঠাট্টা-মশকরা তেমন গায়ে মাখে না গঙ্গারাম। সে আছে নিজের প্রবল বিশ্বাস নিয়ে। সাপ মাটির পৃথিবীতে ঈশ্বরের সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী বলেই সে তাদেরকে খেতে দেয়, রক্ষা করে। তার মতে, সাপকে হত্যা না করে ভালবাসতে পারলে সাপও তোমাকে ভালবাসবে। তাই সে প্রতি রাতে গর্তের সামনে দুধের পিরিচ রেখে আসে। পরদিন সকালে দেখে পিরিচ থেকে দুধ অদৃশ্য।

একদিন আমরা কালনাগকে দেখতে পেলাম। বর্ষা শুরু হয়েছে। অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি। সারারাত ধরে বৃষ্টি। সূর্য তাপে ফেটে যাওয়া মাটি যেন জীবন ফিরে পেল। ছোট ছোট ডোবায় মনের সুখে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ কোরাস শুরু করে দিল ব্যাঙের দল। কর্দমাক্ত মাটিতে কিলবিল করে হেঁটে বেড়াতে লাগল কেঁচো আর কেন্নো। সবুজ ঘাসে ছেয়ে গেল মাঠ, চকচক করতে লাগল কলাগাছের সবুজ পাতা। বৃষ্টির জলে ভরে গেল কালনাগের আস্তানা। গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল সে। খোলা মাঠে চলে এল। রোদ পড়ে ঝিলিক দিচ্ছে তার কালো ফণা। বেশ বড় সে-লম্বায় প্রায় ছয় ফুট, আমার কব্জির সমান মোটা। 'রাজ গোক্ষুরের মত দেখাচ্ছে ওটাকে। চলো সাপটাকে ধরি।' কালনাগ

ছুটে পালাবার সুযোগ পেল না। মাটি পিচ্ছিল, তা ছাড়া ইঁদুরের গর্তগুলো বৃষ্টির জলে সব ভরাট হয়ে আছে। গঙ্গারামের কাছ থেকে কোন সাহায্য পেল না কালনাগ। বাড়িতে নেই সে।

উঠোন ভর্তি কাদা। কালনাগ গড়িয়ে গড়িয়ে চলল। তবে পাঁচ হাত দূরেও যেতে পারেনি, দড়াম করে একটা লাঠি আছড়ে পড়ল তার শরীরের মাঝখানে, ভেঙে দিল পিঠ। তারপর একের পর এক লাঠির বাড়িতে অল্পক্ষণের মধ্যে সাদা-কালো জেলির একটা পিন্ডে পরিণত হলো সে, রক্তাক্ত এবং কর্দমাক্ত। তবে মাথাটা এখন ও অক্ষত।

'ফণায় মেরো না,' আমাদের একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'কালনাগকে স্কুলে নিয়ে যাব।'

সাপটার পেটের মধ্যে একটা লাঠি ঢুকিয়ে মাটি থেকে তুলে ফেললাম। বড় একটা বিস্কিটের টিনের মধ্যে ঢোকালাম, টিন বেঁধে ফেললাম রশি দিয়ে। বিছানার নীচে লুকিয়ে রাখলাম।

রাতের বেলা গঙ্গারামের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন সে কালনাগের জন্য দুধ নিয়ে যায় দেখতে। 'আজ কালনাগের জন্য দুধ নেবে না ?'

'হ্যাঁ, ' বিরক্ত গলায় জবাব দিল গঙ্গরাম। 'তুমি ঘুমাতে যাও।'

'ওর আর দুধ খাওয়ার দরকার হবে না।'

ভুরু কুঁচকে গেল গঙ্গারামের। 'কেন ?'

'না, এমনি বললাম। পুকুরে এত ব্যাঙ। কালনাগ দুধের চেয়ে ওগুলো বেশি পছন্দ করবে।'

পরদিন গঙ্গারাম দুধের পিরিচ নিয়ে এল। পিরিচ ভর্তি দুধ। গঙ্গারামকে বিমর্ষ লাগল। একই সঙ্গে সন্দেহ ঝিলিক দিচ্ছে চোখে।

'তোমাকে তো বললামই সাপ দুধের চেয়ে ব্যাঙ খেতে বেশি ভালবাসে।'

আমরা জামা-কাপড় পরলাম, নাস্তা খেলাম। সারাক্ষণ গঙ্গারাম আমাদের পাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। স্কুল বাস এলে বিস্কিটের টিন নিয়ে উঠে পড়লাম গাড়িতে। ছেড়ে দিল বাস। গঙ্গরামকে বিস্কিটের টিন দেখালাম।

'এই যে তোমার কালনাগ। বাক্সের মধ্যে নিরাপদে আছে। ওকে স্পিরিটের মধ্যে চুবিয়ে রাখব।'

নির্বাক গঙ্গারাম। তাকিয়ে রইল চলে যাওয়া বাসের দিকে।

স্কুলে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। আমরা চার ভাই। সবাই জানে আমরা বদের হাড্ডি। ব্যাপারটা আবার প্রমাণ করলাম।

'রাজ গোক্ষুর।'

'ছয় ফুট লম্বা।'

'ফণিহার।'

বিস্কিটের টিন বিজ্ঞান সারের কাছে দেয়া হলো।

টিনটা সারের টেবিলে। অপেক্ষা করছি উনি কখন ওটা খুলবেন এবং আমাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন। সার ব্যস্ততার ভান করে টিনের দিকে তাকালেন না। তারপর অনেকটা অন্যমনস্কতার ভঙ্গিতে একজোড়া ফরসেপ আর একটা কাঁচের জার

টেবিলে রাখলেন। ওটার ভেতরে একটা কেউটে, মেথিলেটেড স্পিরিটে ডোবানো। বিজ্ঞান সার গুনগুন করতে করতে টিনের বাক্সের রশি খুলতে লাগলেন।

রশি আলগা হয়ে যেতেই শূন্যে ছিটকে গেল ঢাকনা, একটুর জন্য বিজ্ঞান সারের নাকে বাড়ি খেল না। কালনাগ! অঙ্গারের মত জ্বলছে চোখ। অক্ষত ফণা মেলে ধরা। হিস্‌হিস্‌ করে উঠল সে, ছোবল দিল সারের মুখ লক্ষ্য করে। সার চট করে মাথা সরিয়ে নিলেন এবং তাল সামলাতে না পেরে চেয়ার উল্টে পড়ে গেলেন। মেঝেতে শুয়ে রইলেন তিনি, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সাপটার দিকে, নড়তে ভুলে গেছেন। ছাত্ররা ডেস্কের উপর দাঁড়িয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল।

কালনাগ রক্ত লাল চোখ মেলে দৃশ্যটা দেখল। চেরা জিভ মুখ থেকে ঘন ঘন বেরোচ্ছে আর ভেতরে ঢুকছে। থুথু ছিটাল সে। তারপর পালাবার চেষ্টা করল। টিন থেকে মেঝেতে নেমে পড়ল কালনাগ শব্দ করে। পিঠের কয়েক জায়গা ভেঙে গেছে, যন্ত্রণাকাতর শরীরটাকে মেঝের উপর দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে চলল। দোরগোড়ায় পৌঁছে আবার ফণা তুলল নতুন কোন বিপদের মোকাবেলা করার জন্য।

ক্লাসরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গারাম। হাতে একটা পিরিচ আর জগভর্তি দুধ। কালনাগকে দেখে হাঁটু গেড়ে বসল সে। পিরিচে দুধ ঢেলে ওটা দোরগোড়ায় রাখল। প্রণামের ভঙ্গিতে হাত জড়ো করে মাথা ঠেকাল মাটিতে। মানুষের নিষ্ঠুরতার জন্য ক্ষমা চাইছে। প্রচন্ড ক্রোধে হিসিয়ে উঠল গোক্ষুর, থুতু ছিটাল। তারপর প্রবল আক্রোশে কয়েকবার ছোবল মারল গঙ্গারামকে। শেষে একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল, চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

গঙ্গারাম হাত দিয়ে মুখ ঢেকে পড়ে আছে মাটিতে। গোঙাচ্ছে। বিষ তাকে তাৎক্ষণিকভাবে অন্ধ করে দিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার শরীর নীল হয়ে গেল, ফেনা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। ওর কপালে রক্তের ফোঁটা। শিক্ষক রুমাল দিয়ে মুছে দিলেন রক্ত। কালনাগ কপালের যেখানটাতে ছোবল মেরেছে সেখানে ইংরেজি ভি অক্ষরের মত দাগ ফুটে উঠেছে-বিষ্ণুর চিহ্ন।

লেখক পরিচিতি

খুশবন্ত সিং ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক এবং সাংবাদিক। প্রথম উপন্যাস 'ট্রেন টু পাকিস্তান' লিখেই তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তারপর অসংখ্য ছোট গল্প এবং সমসাময়িক বিষয়ে প্রচুর বই লিখেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ইন্দিরা গান্ধি রিটার্নস এবং ট্রাজেডি অভ পাঞ্জাব। তিনি জোকসের ওপর দুটো বই লিখেছেন যা পেয়েছে বেস্ট সেলারের মর্যাদা। ১৯৬৯ সালে দ্য ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অভ ইন্ডিয়ায় সম্পাদক হিসেবে যোগ দিয়ে পত্রিকাটির সার্কুলেশন বাড়িয়ে তোলেন বহুগুণ। তারপর নিউদিল্লী সাময়িকী এবং দ্য হিন্দুস্তান টাইম্‌স-এ সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছেন। তাঁর লেখা দ্য মার্ক অভ বিষ্ণু তাঁকে ছোট গল্পের লেখক হিসেবে পরিচিত করে তোলে। লন্ডনে ১৯৫০ সালে 'দ্য মার্ক অভ বিষ্ণু অ্যান্ড অস্কার স্টোরিজ' নামে গল্প সংকলনটি বের হওয়ার পর থেকে তাঁর কলম আর থেমে থাকেনি। আজও লিখে চলেছেন নিরন্তর।

কেরোসিনের গন্ধ

অমৃতা প্রীতম

গুলেরির বাবা-মা বাস করে চাম্বায়। স্বামীর বাড়ি থেকে মাইল কয়েক দূরে, রাস্তাটা এঁকেবেঁকে খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে গেছে পাহাড় থেকে। পরিস্কার দেখা যায় চাম্বা। গুলেরির বাড়ির জন্য মন কেমন করলেই স্বামী মানককে নিয়ে সে পাহাড়চূড়োয় গিয়ে দাঁড়ায়। চাম্বার বাড়িঘরের ছাদে সূর্যরশ্মি পড়ে ঝকঝক করে জ্বলতে থাকে, মন ভরে দেখে গুলেরি। বুক ভরা খুশি আর গর্ব নিয়ে ফিরে আসে স্বামীর ঘরে।

প্রতি বছর ফসল তোলার সময় গুলেরি তার বাপের বাড়ি যায়। বাবা মা লাকারমান্ডিতে লোক পাঠিয়ে দেয় মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য। গুলেরির আরও দুই বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে চাম্বার বাইরে। বছরের এ সময়ে তারাও বেড়াতে আসে। বিশেষ এই দিনটির জন্য সারাটা বছর তারা চাতক পাখির তৃষ্ণা নিয়ে প্রতিক্ষার প্রহর গোণে। তিন বান্ধবী মিলে মেতে ওঠে জম্পেশ আড্ডায়, নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্পে কেটে যায় ঘন্টার পর ঘন্টা। দল বেঁধে রাস্তায় নেমে পড়ে । তারপর প্রধান আকর্ষণ শস্য তোলার উৎসব তো আছেই। এ অনুষ্ঠানের জন্য মেয়েরা নতুন জামাকাপড় বানায়। দোপাট্টায় রঙ করে , মাড় দেয়, অভ্র রাঙ্গায়। কেনে কাঁচের চুড়ি আর রূপোর কানের দুল।

উৎসব কবে আসবে সে জন্য সবসময় দিন গুনতে থাকে গুলেরি। যখন শরতের বাতাস আকাশের বুক থেকে সরিয়ে দেয় বর্ষার কালো মেঘ, চাম্বার কথা মনে পড়তে থাকে গুলেরির।

দৈনন্দিন কাজগুলো নিয়মিত করে যায় সে–গরু-বাছুর খাওয়ানো, শ্বশুর-শ্বশুড়ির জন্য রান্না, তারপর হিসেব করতে বসে ক'দিন পরে বাপের বাড়ি থেকে লোক আসবে তাকে নিয়ে যেতে।

আবার বাবার বাড়ি যাওয়ায় সময় হয়েছে। ঘোটকীটাকে আদর করে গুলেরি, বাপের বাড়ির চাকর নাটুকে উৎফুল্ল মুখে স্বাগত জানায়, পরদিন যাত্রা করার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

গুলেরির চেহারা খুশিতে জ্বলজ্বল করছে। ওর স্বামী, মানক হুঁকাটা হাতে নিয়ে চোখ বুজে টানতে লাগল। তার মুখ গম্ভীর। কেন, বোঝা যাচ্ছে না।

'চাম্বার মেলায় তুমি যাবে না?' জানতে চাইল গুলেরি। মিনতি ফুটল কণ্ঠে, 'অন্তত একটা দিনের জন্যে হলেও এসো।' মানক হুঁকার কলকি নামিয়ে রাখল, কিছু বলল না। 'আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?' ঝাঁজিয়ে উঠল গুলেরি।

'তোমাকে একটা কথা বলি?'

'তুমি কী বলবে তা জানাই আছে।'

'বাপের বাড়ি যাবে। সে প্রতিবছরই তো যাচ্ছ।'

'তা হলে এবার যেতে মানা করছ কেন?' ক্রুদ্ধ কণ্ঠ গুলেরির।

'শুধু এবারে যেয়ো না।'

'তোমার মা তো কিছু বললেন না। তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?' ভুরু কোঁচকাল গুলেরি।

'আমার মা...' কথাটা শেষ করল না মানক, চুপ করে রইল।

পরদিন সকালের আলো ফোটার আগেই সেজেগুজে তৈরী হয়ে গেল গুলেরি। তার সন্তান নেই। ফলে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কিংবা শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে বাচ্চাকাচ্চা রেখে যাওয়ার ঝামেলা থেকে সে মুক্ত। নাটু ঘোটকীর পিঠে জিন চাপাল। গুলেরি মানকের বাবা-মা'র কাছ থেকে বিদায় নিল। তাঁরা পুত্রবধূর মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

'তোমাকে কিছুটা রাস্তা এগিয়ে দিয়ে যাব আমি' বলল মানক। উৎফুল্ল মনে বেরিয়ে পড়ল গুলেরি। দোপাট্টার আড়ালে মানকের বাঁশি নিতে ভোলেনি।

খাজ্জার গ্রামের পর, রাস্তা ঢাল বেয়ে নেমে গেছে চাম্বার দিকে। এখানে এসে দোপাট্টার নীচে থেকে বাঁশি বের করে মানককে দিল গুলেরি। মানকের হাত ধরে বলল,'এবার তোমার বাঁশি বাজাও!' কিন্তু মানক গভীর চিন্তায় মগ্ন, গুলেরির কথা কানে যায়নি।

'তুমি বাঁশি বাজাচ্ছ না কেন?' বিরক্ত হলো গুলেরি। মানক ম্লান চোখে একবার তাকাল স্ত্রীর দিকে, তারপর ঠোঁটে তুলল বাঁশি। করুণ একটা সুর তুলল।

'গুলেরি, যেয়ো না,' অনুনয় করল মানক। 'আবারও বলছি এবার যেয়ো না।' বাঁশিটি স্ত্রীকে ফেরত দিল সে, বাজাতে পারছে না।

'কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করল গুলেরি। 'তুমি তো মেলার দিন আসছই। তখন এক সঙ্গে বাড়ি ফিরব আমরা। কসম, আরেকটা দিন থাকার জন্য বায়না ধরব না।'

মানক আর অনুরোধ করল না।

রাস্তার পাশে থামল ওরা। নাটু ঘোটকীটাকে নিয়ে কয়েক কদম সামনে বাড়ল দম্পতিটিকে একা কথা বলার সুযোগ দিয়ে। মানকের মনে পড়ে গেল সাত বছর আগে, এই রাস্তা দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে চাম্বায় যাচ্ছিল সে উৎসব দেখতে। মেলায় সাক্ষাৎ হয় গুলেরির সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই প্রেমের মত ব্যাপারটি ঘটে যায় তাদের মধ্যে। তারপর, একা কথা বলার সুযোগ করে নিয়ে মানক গুলেরির হাত ধরে বলেছিল, 'তুমি যেন অপক্ব শস্য-দুধে ভর্তি।'

'মোষের দল অপক্ব শস্য খেতেই ভালবাসে,' এক ঝটকায় নিজের হাত ছুটিয়ে নিয়ে বলেছিল গুলেরি। 'মানুষ খায় সিদ্ধ করে। আমাকে পেতে চাইলে আমার বাবার

কাছে যাও। গিয়ে বলো আমার হাত ধরতে চাও।' মানকদের গোত্রে বিয়ের আগে কন্যাপক্ষকে যৌতুক দিতে হয়। মানক চিন্তিত ছিল গুলেরির বাবা তাঁর মেয়ের জন্য কত টাকা দাবি করে বসেন ভেবে। গুলেরির বাবা ধনী গৃহস্থ, শহরে থেকেছেন অনেকদিন, যৌতুক প্রথায় বিশ্বাসী নন। মেয়েকে একটি ভাল পরিবারের সুপাত্রের হাতে তুলে দিতে পারলেই তাঁর চাইবার কিছু ছিল না। আর মানকের মাঝে সে সব গুণ ছিল। ফলে গুলেরির গলায় মালা পরাতে বেশি সময় লাগেনি। সেই সব দিনের কথা ভাবছিল মানক, কাঁধে গুলেরির হাতের স্পর্শ পেয়ে চমক ভাঙল।

'এতক্ষণ কোন্ স্বপ্নের মধ্যে ডুবে ছিলে?' ঠাট্টা করল গুরেরি। জবাব দিল না মানক।

ঘোটকী চিঁহিঁহিঁ করে উঠল অধৈর্যভঙ্গিতে। গুলেরি বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো।

'নীলঘন্টার মঙ্গলের কথা শুনেছ, না?' জিজ্ঞেস করল সে। 'এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে। ওখানে যে যায় সে নাকি আর কানে শুনতে পায় না।'

'শুনেছি।'

'তোমার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সেই জঙ্গল থেকে ঘুরে এসেছ; আমি যা বলছি কোনকিছুই তোমার কানে যাচ্ছে না।'

'ঠিকই বলেছ, গুলেরি। তুমি কী বলছ কিছুই শুনতে পাইনি আমি,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মানক। ওরা একে অন্যের দিকে তাকাল। কেউ জানে না অপরজন কী ভাবছে। 'আমি এখন যাব। তুমি বাড়ি যাও। অনেকখানি রাস্তা এসেছ।' মৃদু গলায় বলল গুলেরি।

'এতটা রাস্তা পায়ে হেঁটে এলে। বাকিটুকু ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাও।' বলল মানক।

'এই নাও তোমার বাঁশি।'

'তুমি এটা নিয়ে যাও।'

'মেলার দিন এসে বাজাবে তো?' হাসি-মুখে জানতে চাইল গুলেরি। সূর্যরশ্মি ঝিকমিক করছে ওর কালো চোখের তারায়। মানক অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। অবাক হলো গুলেরি, কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর চাম্বার রাস্তা ধরল। মানক ফিরে এল নিজের বাড়ি। ঘরে ঢুকে ধপ্ করে বসে পড়ল চারপাইতে।

'এতক্ষণ পর এলি,' খেঁকিয়ে উঠলেন মা, 'চাম্বা পর্যন্ত গিয়েছিলি নাকি?'

'না। শুধু পাহাড় পর্যন্ত।' ভারী গলা মানকের।

'বুড়িদের মত অমন গোমড়ামুখো হয়ে আছিস কেন?' ধমক দিলেন মহিলা। 'হাসিখুশি থাকতে পারিস না?'

মানক বলতে চাইল হাসিখুশি থাকার মত অবস্থা তো তুমি তৈরি করোনি, তা হলে থাকতাম। কিন্তু কিছু বলল না সে। নিশ্চুপ হয়ে রইল।

মানক আর গুলেরির বিয়ে হয়েছে সাত বছর। এখনও মা হতে পারেনি গুলেরি। মানকের মা কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এরকম অবস্থা তিনি চলতে দেবেন না। ঘরে নাতি দেখতে চান তিনি। দেখবেনই।

কিছু দিনের মধ্যে আট বছরে পড়বে মানকের দাম্পত্য জীবন। মানকের মা ছেলেকে পাঁচশো রুপী দিয়েছেন আরেকটি বিয়ে করার জন্য। তিনি আর অপেক্ষা করতে রাজি নন। অপেক্ষা করছিলেন কখন গুলেরি তার বাপের বাড়ি যাবে আর তিনিও নতুন পুত্র বধূ ঘরে নিয়ে আসবেন।

মা ও সামাজিক প্রথার একান্ত অনুগত মানকের শরীর সাড়া দিল নতুন নারীটির জন্য, তবে মন নয়।

এক সকালে হুঁকা ফুঁকছে মানক দাওয়ায় বসে, দেখল তার পুরানো এক বন্ধু যাচ্ছে বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে। 'ওহে, ভবানী,' হাঁক ছাড়ল সে। 'এত সকাল সকাল চললে কোথায়?'

দাঁড়াল ভবানী। কাঁধে ছোট একটি পুটুলি। 'তেমন কোথাও না।' নিরুত্তাপ কণ্ঠ তার।

'তা হলে আর তাড়া কীসের? এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাও,' আমন্ত্রণ জানাল মানক।

ভবানী দাওয়ায় এসে হাঁটু গেড়ে বসল, হুঁকাটা নিল মানকের হাত থেকে। কিছুক্ষণ হুঁকা ফুঁকে শেষে বলল, 'আমি চাম্বার মেলায় যাচ্ছি।'

ছোরার খোঁচা খেল যেন মানক হৃৎপিণ্ডে।

'আজ মেলা নাকি?'

'প্রতি বছর এ সময়ই মেলা হয়,' শুকনো গলায় জবাব দিল ভবানী। 'মনে নেই সাত বছর আগে আমরা একসঙ্গে মেলায় গিয়েছিলাম?' ভবানী আর কিছু বলল না তবে মানক ওর নিরুত্তাপ আচরণের কারণ ঠিকই বুঝতে পারছে। অস্বস্তি লাগছে। ভবানী কল্কে নামিয়ে রাখল মাটিতে, পুঁটুলি তুলে নিল কাঁধে। পুঁটুলির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে একটি বাঁশি। মানককে বিদায় জানিয়ে সে নিজের রাস্তা ধরল। ওকে যতক্ষণ দেখা গেল, বাঁশির দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকল মানক।

পরদিন বিকেলে মাঠে কাজ করছে মানক, ভবানীকে দেখতে পেল। আসছে এদিকেই। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল মানক। ভবানীর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নেই। ভবানী সোজা ওর সামনে চলে এল, বসল। চেহারা ম্লান।

'গুলেরি মারা গেছে,' বিষন্ন গলায় বলল ভবানী।

'কী!'

'তোমার দ্বিতীয় বিয়ের কথা শুনে মেয়েটা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেছে।'

মানকের চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেল, বিস্ফোরিত চোখে শুধু তাকিয়ে রইল ভবানীর দিকে।

মুখে রা ফুটল না। বুকের ভিতরটা জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

দিন যায়। মানক মাঠে কাজ করে ফিরে আসে বাড়িতে। চুপচাপ খেয়ে উঠে যায়। একটি কথাও বলে না। মরা মানুষের মত হয়ে গেছে সে। চেহারা অভিব্যক্তিশূন্য, চোখে ফাঁকা দৃষ্টি।

'আমি যেন ওর বউ নই,' অনুযোগ করে মানকের দ্বিতীয় স্ত্রী। 'যেন জোর করে ওর কাছে গছিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাকে।' তবে কিছুদিনের মধ্যে গর্ভবতী হয়ে পড়ল সে, মানকের মার খুশি আর ধরে না। নতুন পুত্রবধূর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট তিনি। ছেলেকে জানালেন ঘরে নতুন অতিথি আসছে, কিন্তু মানকের চেহারা ভাবলেশহীন হয়ে রইল, চোখের ফাঁকা চাউনিরও কোন পরিবর্তন ঘটল না।

শাশুড়ি পুত্রবধুকে সাহস যোগালেন। বললেন সন্তান জন্ম নেওয়ার পরে বাচ্চাকে বাপের কোলে বসিয়ে দিলেই মানকের মন মেজাজের পরিবর্তন হবে।

যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান জন্ম দিল মানকের স্ত্রী। মানকের মা অত্যন্ত খুশি মনে নাতিকে স্নান করালেন, সুন্দর জামা কাপড় পরিয়ে বসিয়ে দিলেন ছেলের কোলে। স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকল মানক পাথর মুখ নিয়ে। হঠাৎ তার শূন্য চোখে ফুটল আতঙ্ক, চিৎকার করতে লাগল সে মৃগী রোগীর মত,'ওকে নিয়ে যাও! ওর গা থেকে কেরোসিনের গন্ধ আসছে।'

লেখক পরিচিতি

অমৃতা প্রীতম (১৯১৯-২০০৫) পাঞ্জাবী সাহিত্যের সুপরিচিত নাম। কবি ও লেখক হিসেবে বিখ্যাত অমৃতার বই বেরিয়েছে ৭০টিরও বেশি। এরমধ্যে জনপ্রিয় কয়েকটি গ্রন্থ হলো: কাগজ কে ক্যানভাস (কবিতা), পিঞ্জর (উপন্যাস), ইয়ে সাচ হ্যায় (উপন্যাস), কোরে কাগজ (উপন্যাস) ইত্যাদি। অমৃতার আত্মজীবনী 'রশীদী তিকত্' প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে। কাগজ কে ক্যানভাস ১৯৮২তে তাঁকে এনে দিয়েছে লোভনীয় পুরস্কার 'জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড'। ১৯৫০ সালে তিনি অর্জন করেন সাহিত্য একাডেমী অ্যাওয়ার্ড। চারটে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অমৃতাকে ডি.লিট পদবীতে ভূষিত করেছে। অমৃতার লেখা ৩৪টি ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। 'কেরোসিনের গন্ধ' অমৃতার সেরা ছোটগল্পের একটি। মূল পাঞ্জাবী থেকে গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন যশস্বী সাংবাদিক ও লেখক খুশবন্ত সিং।

শেখ বুরহানউদ্দিনের মৃত্যু

খাজা আহ্‌মদ আব্বাস

আমার নাম শেখ বুরহানউদ্দিন।

দিল্লীতে যেবার ভয়াবহ আকারে সন্ত্রাস আর খুন ছড়িয়ে পড়ল আর রাস্তা রঞ্জিত হয়ে উঠল মুসলমানদের রক্তে, আমি তখন প্রতিবেশী হিসেবে একজন শিখকে পেয়ে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিচ্ছিলাম। এ লোক বিপদের সময় আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে সে চিন্তা তো করিই না, যেটা একজন প্রতিবেশীর কর্তব্য, বরং কৃপাণটা কখন আমার পেটে ঢুকিয়ে দেয় সে আতঙ্কে অস্থির ছিলাম। শিখরা তখনও আমার কাছে হাসির পাত্রই ছিল। তবে তাদেরকে অপছন্দ করতাম, আর খানিকটা ভয়ও পেতাম।

শিখদের প্রতি ঘৃণা আমার ছেলেবেলার, প্রথম এদের একজনকে দর্শন করার পর থেকে। তখন আমার বয়স ছয়ের বেশি হবে না, একদিন দেখলাম এক শিখ রোদ পোহাতে পোহাতে তার লম্বা চুল আঁচড়াচ্ছে। 'ইক্' গা ঘিনঘিন করে উঠল। 'লম্বা দাড়ির মহিলা !' বড় হবার পরে বিতৃষ্ণাটা ঘৃণায় পরিণত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গোটা জাতির প্রতি।

আমাদের বাড়ির বৃদ্ধারা সবসময় শিখদের প্রতি বিষোদগার করতেন। যেমন কোন বাচ্চা নিউমোনিয়া বাধিয়েছে অথবা কারো ঠ্যাং ভেঙেছে, তারা বলতেন, 'বহু আগে এক শিখের অথবা ইংরেজের নিউমোনিয়া হয়েছিল কিংবা বহু আগে এক শিখের ঠ্যাং ভেঙে গিয়েছিল।' বড় হবার পরে শুনেছি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু আর মুসলমানদেরকে পরাজিত করার জন্যে শিখ যুবরাজরা ফিরিঙ্গী বা বিদেশীদেরকে সাহায্য করেছিল। আমি কোন ঐতিহাসিক দলিল লিখতে বসিনি, শুধু বোঝাতে চাইছি আমি ইংরেজ ও শিখদের প্রতি একটা সন্দেহ ও ঘৃণা নিয়ে বড় হয়েছি তবে শিখদের চেয়ে ইংরেজদের প্রতি ভীতিটা আমার বেশি ছিল।

দশ-বছর বয়সে দিল্লী থেকে আলিগড়ে ঘুরতে যাবার সুযোগ হয়ে গেল হঠাৎ করেই। থার্ডক্লাসে ভ্রমণ করেই আমি অভ্যস্ত। সেদিন সিদ্ধান্ত নিলাম অন্তত: একবারের

জন্যে হলেও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করে দেখব কেমন লাগে। টিকিট কাটলাম। একটি খালি সেকেন্ড ক্লাস কমপার্টমেন্ট পেয়েও গেলাম। লাফ দিয়ে বসে পড়লাম আরামদায়ক আসনে। কিছুক্ষণ পরে বাথরুমে গেলাম চুলটুল আঁচড়াতে। বাথরুম থেকে বের হয়ে কমপার্টমেন্টের সবগুলো পাখা চালিয়ে দিলাম। সুইচ টিপে বারবার বাতি জ্বালালাম আর নেভালাম। ট্রেন ছাড়ার কয়েক মুহূর্ত আগে চার লালমুখো টমি (ইংরেজ সৈনিক) ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল কমপার্টমেন্টে। তাদের মুখে 'শালা' আর 'বানচোত' ছাড়া কোন কথা নেই। প্রতিটি বাক্যে এই অশ্লীল শব্দ দুটো প্রয়োগ করতে লাগল তারা। তাদের দিকে তাকিয়ে আমার সেকেন্ড ক্লাসে ভ্রমণের ইচ্ছে সম্পূর্ণ উবে গেল।

দ্রুত সুটকেস নিয়ে এক ছুটে বেরিয়ে এলাম ওখান থেকে। একটি থার্ড ক্লাস কমপার্টমেন্টে ঢুকে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগলাম। এ কমপার্টমেন্টে সবাই স্থানীয় লোকজন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস সকলেই শিখ। তাদের লম্বা দাড়ি পেট ছুঁয়েছে, নিম্নাঙ্গে হাফপ্যান্ট ছাড়া কিছু নেই। এ ঘর থেকে অন্য কোথাও যাবার উপায় নেই। তবু নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বসে পড়লাম। শিখদের চেয়ে সাদা মানুষদের বেশি ভয় পেলেও আমি সাদাদেরকে অনেক সভ্য মনে করি। তারা আমাদের মতই পোশাক পরে। আমিও ওদের মত ইংরেজিতে 'শালা' 'বানচোত' বলে গালি দিতে চাই। তাদের মত পোশাক শ্রেণীভুক্ত হতে চাই। ইংরেজরা ছুরি কাঁটা হাতে নিয়ে খাবার খায়, আমিও সেভাবে খেতে চাই যাতে এই শিখগুলো আমাকে সাদাদের মতই সভ্য আর উন্নত মনে করে।

আমার শিখ ফোবিয়া একটু ভিন্নরকম। শিখদের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা ছাড়া কিছু নেই। এরা কি রকম নির্বোধ মেয়েদের মত চুল লম্বা রাখে। আমি অবশ্য চুল খুব ছোট করে ছাটার পক্ষপাতি নই। যদিও আমার বাবা বড় চুল রাখা পছন্দ করতেন না। কিন্তু শুক্রবার, নাপিতের দোকানে চুল ছাঁটতে যাবার সময় বলে দিতাম চুল বেশি ছোট যেন না করে। আমি মোটামুটি লম্বা চুল রাখতাম। যখন হকি বা ফুটবল খেলতাম, বাতাসে আমার চুল উড়ত ইংরেজ খেলোয়াড়দের মত। বাবা প্রায়ই অভিযোগ করতেন, 'মেয়েদের মত লম্বা চুল রেখেছ কেন ?' বাবার যত আদ্যিকালের ধ্যান ধারণা। তাই বাবাকে তেমন পাত্তা দিতাম না। বাপ পারলে সবার মাথা ন্যাড়া করে থুতনির নিচে কৃত্রিম দাড়ি লাগিয়ে দেন.... দাড়ির প্রসঙ্গ উঠলেই মনে পড়ে যায় শিখদেরকে ঘৃণা করার দ্বিতীয় কারণ হলো তাদের লম্বা দাড়ি, যাতে তাদেরকে বুনোদের মত লাগে।

চারদিকে শুধু দাড়ি আর দাড়ি। আমার বাবার দাড়ি, ফরাসী কায়দায় নিখুঁতভাবে ছাঁটা; কিংবা আমার চাচার চিবুকের নিচে সুঁচালো ডগার দাড়ি। কিন্তু সেরকম দাড়ি দেখলেই ঘেন্না লাগে যে দাড়িতে কোনদিন নাপিতের কাঁচি পড়েনি, বুনো ঝোপের মত শুধু বেড়েই চলেছে- তাতে আবার তেল, দই ছানা সহ আরো কি সব মাখানো হয়, খোদা মালুম। এ দাড়ি কয়েক হাত লম্বা হবার পড়ে মেয়েদের চুলের মত চিরুনি দিয়ে

আবার আঁচড়ানো হয়। আমার দাদারও খুব লম্বা দাড়ি ছিল, তিনি চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতেন। কিন্তু আমার দাদার সাথে তো আর শিখদের তুলনা করা যায় না। আমার দাদা হলেন আমার দাদা। আর শিখরা তো স্রেফ শিখ।

মেট্রিক পাস করার পরে আমাকে ভর্তি করা হলো আলিগড়ে, মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে। আমরা, ছেলেরা, যারা দিল্লী বা উত্তর প্রদেশ থেকে এসেছি, পাঞ্জাব থেকে আসা ছাত্রদেরকে পাত্তা দিতাম না। ওরা ছিল গাঁইয়া, কিভাবে কথা বলতে হয় জানে না, কিভাবে টেবিলে বসতে হয় জানে না। ওরা শুধু জানে বড় বড় গ্লাস ভর্তি ঘোল গিলতে। লিপটন চা ওরা জীবনেও পান করেছে কিনা সন্দেহ। আর কি চোয়াড়ে ঢঙের কথাবার্তা ! ওরা যখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে, মনে হয় ঝগড়া করছে। প্রতিটি বাক্যে 'উসসি, তুসসি, সাদি, তোহাদি'র অনর্গল ব্যবহার। আমি পাঞ্জাবীদের কাছ থেকে সবসময় দূরত্ব রেখে চলতাম।

কিন্তু আমাদের হোস্টেলের ওয়ার্ডেন, (খোদা তাকে ক্ষমা করুন) আমার রুমমেট হিসেবে গুছিয়ে দিল এক পাঞ্জাবীকে। একে ঝেড়ে ফেলার কোন উপায় নেই দেখে ঠিক করলাম নতুন রুমমেটের সঙ্গে খামোকা দ্বন্দ্বে জড়াতে যাব না। এতে অবশ্য লাভই হলো। কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। আমার নতুন রুমমেটের নাম গোলাম রসুল, এসেছে রাওয়ালপিন্ডি থেকে। এর মাথা ভর্তি কৌতুক গিজগিজ করছে, সঙ্গী হিসেবে বেশ ভাল।

গোলাম রসুল শিখদেরকে নিয়ে সারাক্ষণ ঠাট্টা করত। তার গল্প কিংবা কৌতুকের বিষয়বস্তুই ছিল শিখ। তার চোখে শিখদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলোঃ সকল শিখই নির্বোধ ও ডাহা মূর্খ। দুপুর বেলা এর সবাই এক যোগে বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে ফেলে। যেমনঃ একদিন বেলা বারটার সময় এক শিখ অমৃতসরের টাউন হল বাজারে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় একজন কনেস্টবল, এও শিখ, তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাতি কই ?'

সাইকেল আরোহী কাঁপা গলায় জবাব দিল, জমাদারসাব, আমি বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বাতি নিয়ে বেরিয়েছিলাম। ওটা নিশ্চয় এইমাত্র নিভে গেছে।' জমাদার তাকে হাজতে পুরে দেয়ার ভয় দেখাল। ওই সময় সাদা দাড়িঅলা এক শিখ পথচারী ওদিক দিয়েই যাচ্ছিল। সে সবশুনে বলল, 'ভায়েরা, ছোটখাট জিনিস নিয়ে ঝগড়া করার মানে নেই। বাতি যদি নিভে গিয়েই থাকে, ও আবার জ্বালানো যাবে।'

গোলাম রসুল এ ধরনের প্রচুর কৌতুক জানত। পাঞ্জাবী উচ্চারণে কৌতুকীগুলো যখন বলত সে, শ্রোতা-দর্শক না হেসে পারত না।

শিখরা শুধু নির্বোধই নয়, ভয়ানক নোংরাও। গোলাম রসুলের সঙ্গে প্রচুর শিখের পরিচয় ছিল। সে আমাদেরকে বলত শিখরা কখনো মাথা কামায় না। আমরা মুসলমানরা অন্ততঃ শুক্রবার দিন খুব ভালভাবে মাথা ধুই, আর শিখরা হাফপ্যান্ট পরে যত রাজ্যের নোংরা জিনিস মাথায় ঢালে। যেমন আমি খুলিতে লেবুর রস আর গ্লিসারিন

ঘষি। গ্লিসারিন দইয়ের মত সাদা আর ঘন হলেও এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস- ইউরোপের বিখ্যাত সুগন্ধী কোম্পানির তৈরি। আমার গ্লিসারিন আসে সুন্দর বোতলে আর শিখরা দই কেনে নোংরা মিষ্টির দোকানদারের কাছ থেকে।

শিখদেরকে নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাতাম না, যদি না তারা নিজেদেরকে মুসলমানদের মত বীরযোদ্ধা বলে দাবি করত। পৃথিবীর সবাই জানে একজন মুসলমান দশজন হিন্দু কিংবা শিখের চেয়ে বেশি শক্তি রাখে। কিন্তু এই শিখগুলো মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে রাজি নয় বরং মিথ্যা অহংকারে গোঁফ ফুলিয়ে, দাড়িতে হাত বুলিয়ে গট্‌গট্ করে হাঁটে। গোলাম রসুল বলত, একদিন আমরা, মুসলমানরা শিখদেরকে এমন শিক্ষা দেব যে জীবনে ভুলবে না।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল।

আমি কলেজের পাট চুকালাম। প্রথমে কেরানীর চাকরি পেলাম, সেখান থেকে প্রমোশন হয়ে হেড ক্লার্ক। আলিগড় ছেড়ে চলে এলাম নয়া দিল্লী। সরকারী কোয়ার্টার্স পেয়ে গেলাম। বিয়ে শাদী করলাম। বাচ্চাকাচ্চার বাপও হয়ে গেলাম।

আমার কোয়ার্টার্সের পাশেই থাকেন এক শিখ। রাওয়ালপিন্ডি থেকে উচ্ছেদ হয়ে চলে এসেছেন। অনেকদিন কেটে গেলেও গোলাম রসুলের একটা কথা আমি ভুলিনি। সে বলেছিল মুসলমানরা একদিন শিখদেরকে জন্মের শিক্ষা দেবে। তাই ঘটেছে রাওয়ালপিন্ডিতে। মুসলমানরা একযোগে ওই শহর থেকে মুছে ফেলেছে শিখদের নিশানা। শিখরা নিজেদেরকে বিরাট যোদ্ধা বলে গর্ব করে, লম্বা কৃপাণ উঁচিয়ে হম্বিতম্বি করে। কিন্তু রাওয়ালপিন্ডিতে সাহসী মুসলমানদের সামনে তারা দাঁড়াতেই পারে নি। জোর করে সবগুলো শিখের দাড়ি কেটে দেয়া হয়েছে। খত্‌না করতে তারা বাধ্য হয়েছে। বাধ্য হয়েছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে। হিন্দু পত্রপত্রিকাগুলো তাদের অভ্যাসমত যাচ্ছেতাই গালাগাল করেছে মুসলমানদেরকে। তারা লিখেছে মুসলমানরা শিখ মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করছে। এটা মোটেই সত্য নয়। ইসলাম ধর্মে পরিষ্কার বলা আছে কোন মহিলা বা শিশুর গায়ে হাত তোলা যাবে না। হিন্দু পত্রিকাগুলোতে মহিলা ও শিশুদের লাশের যে ছবি ছাপা হচ্ছে সব ভুয়া। কোনদিন শোনা যায় নি মুসলিম যোদ্ধারা নারী কিংবা শিশুর উপর অত্যাচার করেছে। আমার ধারণা শিখরা নিজেরাই নিজেদের স্ত্রী আর বাচ্চাদেরকে খুন করেছে মুসলমানদের উপর দোষ চাপানোর জন্যে।

মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দু ও শিখ নারীদেরকে তুলে নেয়ার অভিযোগও এসেছে। আসল ব্যাপার হলো মুসলমানদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে শিখ আর হিন্দু মেয়েরা তরুণ মুসলমানদের প্রেমে পড়েছিল এবং তাদের হাত ধরে চলে যেতে চেয়েছিল। মহান হৃদয়ের অধিকারী এই তরুণদের সামনে ওই মেয়েদেরকে আশ্রয় দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এবং এভাবে শিখ ও হিন্দু মেয়েরদেরকে তারা ইসলামের সত্য পথে নিয়ে এসেছে। শিখদের ফালতু অহংকারের পতন ঘটেছে। তাদের নেতারা কৃপাণ হাতে

মুসলমানদেরকে হুমকি দিতে পেরেছে কি পারে নি তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। তবে আমার বুকটা ইসলামের জন্যে গর্বে ফুলে উঠেছে দেখে রাওয়ালপিন্ডি থেকে শিখরা দলে দলে পালাচ্ছে।

আমার প্রতিবেশী শিখের বয়স ষাটের কাছাকাছি। দাড়ি পুরোটাই সাদা। মৃত্যুর চোয়াল থেকে অল্পের জন্যে রক্ষা পেলেও বুড়োকে দেখছি সারাক্ষণই দাঁত কেলিয়ে হাসছেন। নির্বোধ না হলে এভাবে কেউ হাসতে পারে ? প্রথম প্রথম উনি সেধে আমার সঙ্গে ভাব জমাতে চাইছিলেন। রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে আসতেন। একবার কি একটা শিখ উৎসবে আমাদের বাড়িতে কিছু মাখন পাঠিয়ে দিলেন। আমার স্ত্রী সাথে সাথে ওটা আমাদের ঝাড়ুদারনীকে দিয়ে দিল। আমি বুড়োর সাথে যতটা সম্ভব দূরত্ব রেখে চলছিলাম। জানতাম কথা বলার সুযোগ দিলেই তিনি ঘনিষ্ঠ হতে চাইবেন। আর শিখরা যে কথায় কথায় অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে কে না জানে ? আমি এ ধরনের লোকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জিভটাকে নোংরা করব কেন?

রোববারের এক বিকেলে আমার বউকে শিখদের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে কৌতুক শোনাচ্ছিলাম। আমার বক্তব্য প্রমাণ করতে আমার চাকরটাকে ঠিক বারোটার সময় প্রতিবেশী শিখের বাড়িতে পাঠালাম কটা বাজে জেনে আসার জন্যে। সে এসে বলল, 'বারোটা বেজে দুই মিনিট।' আমি স্ত্রীকে বললাম, 'দেখলে, ওরা বারোটা বেজেছে এ কথাটা বলতেও ভয় পায়।' তারপর দু'জনেই হেসে উঠলাম হো হো করে। এরপরে বহুবার আমার শিখ প্রতিবেশীকে বোকা বানানোর জন্যে জিজ্ঞেস করেছি, 'সর্দারজী, বারোটা কি বেজেছে ?'

নির্লজ্জ লোকটির বেহায়ার মত সমস্ত দাঁত বের করে জবাব দিয়েছেন, 'জনাব, আমাদের জন্যে সবসময়ই বারোটা বাজে।' তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছেন যেন মস্ত ঠাট্টা করেছি।

আমার বাচ্চাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সবসময়ই সচেতন ছিলাম। শিখদেরকে কোনভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। আর এ লোক তো রাওয়ালপিন্ডি থেকে পালিয়ে এসেছেন। তাঁর বুকে নিশ্চয়ই মুসলমানদের জন্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে, প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। স্ত্রীকে বলে দিয়েছি কখনোই যেন বাচ্চাদেরকে শিখের বাড়ির ধারে কাছেও যেতে না দেয়। কিন্তু বাচ্চা তো বাচ্চাই। কয়েকদিন পরে দেখলাম আমার বাচ্চারা শিখের ছোট মেয়ে মোহিনী এবং তার এক নাত্নীর সঙ্গে খেলছে। মোহিনীর বয়স দশ-টশ হবে, নামের মতই চেহারা তার। ফর্সা, অপূর্ব সুন্দরী। হারামজাদা শিখগুলোর বউরা খুব সুন্দরী হয়। গোলাম রসুল বলত যদি শিখ পুরুষগুলোকে বউ আর মেয়েদেরকে রেখে পাঞ্জাব থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা যেত তাহলে আর মুসলমানদেরকে হুরপরীর খোঁজে বেহেশতে যাবার দরকার হতো না।

রাওয়ালপিন্ডি থেকে ধাওয়া খেয়ে শিখরা কাপুরুষের মত পালিয়ে গেছে পুব পাঞ্জাবে। এখানকার মুসলমানরা ছিল দুর্বল এবং অপ্রস্তুত। তাই শিখরা তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা শুরু করে দিল। হাজার হাজার মুসলমান শাহাদাত বরণ করল, তাদের রক্তের নহর রইল। হাজার হাজার মুসলিম নারীকে নগ্ন করে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নেয়া হলো। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে বিপুল পরিমাণে শিখ পালিয়ে এসে ঢুকে পড়ল দিল্লীতে, পরিষ্কার বোঝা গেল এবার রাজধানীতে গন্ডগোল শুরু হয়ে যাবে। তক্ষুনি পাকিস্তানে চলে যাবার মত প্রস্তুতি আমার ছিল না। তবে স্ত্রী এবং বাচ্চাদেরকে আকাশ পথে, আমার বড় ভাই সহ পাঠিয়ে দিলাম, নিজের ভাগ্য সঁপে দিলাম খোদার হাতে। প্লেনে বেশী মালপত্র পাঠাতে পারিনি। তাই ফার্নিচার সহ অন্যান্য জিনিসপত্র পাকিস্তানে পাঠানোর জন্যে একটি গোটা রেলওয়ে ওয়াগন ভাড়া করলাম। কিন্তু যেদিন মালপত্র তুলতে যাব, শুনলাম পাকিস্তানের পথে যাত্রা করা ট্রেনে হামলা চালাচ্ছে শিখ লুঠেরারা। আমার আর মালপত্র পাঠানো হলো না। ওগুলো রয়ে গেল দিল্লীর বাসায়।

১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করল ভারত। ভারতের স্বাধীনতা দিবস তো আমার কি ! সারাদিন বিছানায় গড়াগড়ি দিলাম আর পড়ে ফেললাম ডন ও পাকিস্তান টাইমস। দুটি পত্রিকাই অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ভারত যেভাবে স্বাধীন হয়েছে তার সমালোচনা করে উপসংহার টেনেছে। হিন্দু ও ব্রিটিশরা মিলে ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের নেতা, মহান মোহম্মদ আলী জিন্নাহ তাদের ষড়যন্ত্র টের পেয়ে তা নসাৎ করে মুসলমানদের জন্যে জিতে নিয়েছেন পাকিস্তান। ইংরেজরা হিন্দু আর শিখদের চাপে পরাজয় স্বীকার করে ভারতকে অমৃতসর দিতে বাধ্য হয়েছে। অথচ পৃথিবী জানে অমৃতসর সম্পূর্ণ একটি মুসলিম নগরী। এর বিখ্যাত স্বর্ণ মসজিদ, নাকি স্বর্ণ মন্দিরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললাম কথাটা !- নাহ্, স্বর্ণ মসজিদ তো দিল্লীতে। দিল্লীতে স্বর্ণ মসজিদের সাথে রয়েছে জামে মসজিদ, লাল কেল্লা, নাজিমউদ্দিন ও সম্রাট হুমায়ুনের জাঁকাল সমাধি, সফদর জং-এর কবর ও স্কুল- সবকিছুই ইসলামী শাসনের পরিচয় বহন করছে। এমনকি এই দিল্লীকেও (এ শহরের প্রতিষ্ঠাতা মুসলমান শাসক শাহজাহানের নামে শাহজাহানাবাদ রাখাই আসলে ঠিক ছিল) হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের পতাকা ওড়ানোর যন্ত্রণা ও অবমাননা সইতে হয়েছে।

আমার বুক যেন ছিঁড়ে টুকরো হয়ে যেতে লাগল এসব কথা ভেবে। আমার দু:খের পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল যখন বুঝতে পারলাম এই দিল্লী, যা একসময় ছিল ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, তাকে আজ আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন থেকে আমাদেরকে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধ ও বেলুচিস্তানের মরুভূমিতে বর্বর, অসভ্য লোকজনের সঙ্গে বাস করতে হবে। আমাদেরকে যেতে হবে এমন এক দেশে যেখানকার লোকেরা শুদ্ধ উর্দুই বলতে পারে না, যেখানে পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের মত ঢোলা সালোয়ার পরে, আর চার পাউন্ড ওজনের একেকটা মোটা রুটি খায়। অথচ আমরা বাড়িতে ফিনফিনে পাতলা রুটি খেয়ে অভ্যস্ত।

নিজেকে শক্ত করলাম আমি। এটুকু কষ্ট করতেই হবে আমার মহান নেতা জিন্নাহ এবং আমার নতুন দেশ পাকিস্তানের জন্যে। যদিও দিল্লী ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না।

সন্ধ্যাবেলায় ঘর থেকে বেরিয়েছি, আমার শিখ প্রতিবেশী কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে বললেন, 'ভাই সাব, আজ আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে যান নি ?' ইচ্ছা করল ব্যাটার দাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিই।

একদিন সকালে খবর ছড়িয়ে পড়ল পুরানো দিল্লীতে দাঙ্গা বেধে গেছে। করলবাগে মুসলমানদের বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। চাঁদনী চকে মুসলমানদের দোকান লুঠ হয়েছে। এই হলো হিন্দু আইনের উদাহরণ ! আপন মনে বললাম, 'নয়া দিল্লী সত্যিকারের ইংরেজ নগরী, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এখানে সর্বাধিনায়ক হিসেবে বাস করেন। অন্তত: নয়া দিল্লীতে কেউ মুসলমানদের গায়ে হাত তুলতে সাহস পাবে না।' নিজের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আমি অফিসে রওনা দিলাম। প্রভিডেন্ট ফান্ডের ঝামেলা সেরে ফেলা দরকার। পাকিস্তানে যেতে দেরী করছি শুধু ওই টাকাটা তোলার জন্যে। আমি মাত্র গোলে মার্কেটে পৌছেছি, অফিসের এক হিন্দু কলিগের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে বলল, ''আপনি এখানে কি করছেন ? শিগ্গির বাড়ি যান। আর ঘর থেকে বেরুবেন না। দাঙ্গাকারীরা কনাট সার্কাসে হত্যা করছে মুসলমানকে।' আমি দ্রুত পা চালালাম বাড়ির দিকে।

ঘরে না ঢুকে শিখ প্রতিবেশীর বাড়ি গেলাম। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন, 'শেখজী ! ভয় পাবেন না। আমি বেঁচে থাকতে কেউ আপনার গায়ে হাত তুলতে পারবে না।'

আমি মনে মনে বললাম, 'লোকটার দাড়ির আড়ালে কত যে ভণ্ডামি লুকিয়ে আছে ! মুসলমানরা কচুকাটা হচ্ছে জেনে এ নিশ্চয় ভেতরে ভেতরে খুশিতে লাফাচ্ছে কিন্তু মুখে সহানুভূতি দেখাচ্ছে। এ মহল্লায় একমাত্র আমিই মুসলমান আছি, আর কেউ নেই।'

তবে এ লোকদের সহানুভূতি কিংবা দয়া কোনটারই আমার প্রয়োজন নেই। নিজের ঘরে ঢুকে ভাবলাম, মরতেই যদি হয়, অন্তত: ওদের দশটাকে আগে মেরে মরব। খাটের নিচে আমি ডাবল ব্যারেলের বন্দুক লুকিয়ে রেখেছি। কিছু কার্তুজও আছে। কিন্তু শোবার ঘরে বন্দুক পেলাম না। বাড়ির কোথাও না।

'হুজুর কিছু খুঁজছেন ?' আমার বিশ্বস্ত চাকর মোহাম্মদ জিজ্ঞেস করল।

'আমার বন্দুক কই ?'

চুপ করে রইল মোহাম্মদ। কিন্তু ওর চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম হয় ও অস্ত্রটা লুকিয়ে রেখেছে কিংবা চুরি করেছে।

'জবাব দিচ্ছিস না কেন ?' রেগে গেলাম আমি।

ধমক খেয়ে সত্য কথা বেরিয়ে এল। ও আমার বন্দুক চুরি করে তার এক বন্ধুকে দিয়েছে। ওরা দরিয়াগঞ্জের মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্যে অস্ত্র সংগ্রহ করছে।

'আমরা কয়েকশো বন্দুক, প্রচুর মেসিন গান, দশটি রিভলভার আর একটা কামান জোগাড় করে ফেলেছি,' গর্বের সাথে জানাল মোহাম্মদ, 'এই নাস্তিকগুলোকে জবাই করব আমরা; জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব।'

'আমার বন্দুক দিয়ে দরিয়াগঞ্জে নাস্তিকদের তোরা পুড়িয়ে মারতে পারবি বটে কিন্তু আমাকে এখানে কে বাঁচাবে ? এই বুনো জানোয়ারগুলোর মধ্যে আমি একা মুসলমান। আমি খুন হয়ে গেলে কে তার দায়-দায়িত্ব নেবে ?'

মোহাম্মদকে হুকুম দিলাম দরিয়াগঞ্জ থেকে আমার বন্দুক আর শ'খানেক কার্তুজ নিয়ে আসতে। তবে ছোকরা চলে যাবার পরে মনে হলো ও আর এদিকে পা মাড়াচ্ছে না। আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম। ম্যান্টলপিসের উপরে পারিবারিক একটি ছবি আছে। আমার স্ত্রী আর বাচ্চারা নীরবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ছবিটি দেখে বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল, চোখ ভরে গেল পানিতে এ জীবনে হয়তো আর ওদের সঙ্গে দেখা হবে না ভেবে। তবু সান্ত্বনা পেলাম চিন্তা করে পাকিস্তানে ওরা ছহি সালামতে আছে। হায়, কেন মরতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার লোভ করেছিলাম ? কেন ওদের সঙ্গে চলে গেলাম না ? এমন সময় তুমুল একটা হল্লার শব্দ শুনতে পেলাম।

'সৎ শ্রী তাকাল.....'

'হর হর মহাদেব'

চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ ক্রমে কাছিয়ে এল। এরা দাঙ্গাবাজ- আমার মৃত্যু সমন নিয়ে আসছে। আমি যেন এক আহত হরিণ, প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছি এদিক-ওদিক, শিকারীর দল বেঁধে পিছু নিয়েছে। পালাবার পথ নেই। দরজা খুব পাতলা কাঠ আর কাচ দিয়ে তৈরি। প্রবল এক ধাক্কাতেই ভেঙে যাবে।

'সৎ শ্রী আকাল.....'

'হর হর মহাদেব'

ওরা আরো কাছে এসে পড়েছে, মৃত্যুও সমান পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। আমার শিখ প্রতিবেশী ভেতরে ঢুকলেন, 'শেখজী, এক্ষুনি আমার বাড়িতে চলুন।' আমি কিছু না ভেবেই শিখের বারান্দার দিকে ছুটলাম, লুকিয়ে পড়লাম খাম্বার আড়ালে। একটা গুলি ছুটে এল। বিঁধল আমার মাথার উপরের দেয়ালে। একটা ট্রাক দেখতে পেলাম। জনা বার তরুণ লাফিয়ে নামল ট্রাক থেকে। তাদের নেতার হাতে একটা ফর্দ- 'কোয়ার্টাস নাম্বার আট- শেখ বুরহানউদ্দিন।' আমার নাম পড়ল সে। দলকে নির্দেশ দিল আগে বাড়তে। আমার বাড়িতে হামলা চালাল তারা। চোখের সামনে তছনছ করতে লাগল আমার সাজানো সংসার। আমার আসবাব, বাক্স, ছবি, বই, কার্পেট এমনকি নোংরা লিনেনগুলো পর্যন্ত ট্রাকে তুলে নিল। দস্যু ! লুটেরা ! বদমাশ !

শিখ বুড়ো, যিনি আমাকে সহানুভূতি দেখানোর ভান করছিলেন ইনিও কম লুটেরা নন। দাঙ্গাবাজদেরকে তিনি বলছিলেন, 'ভায়েরা, থামো ! আমাদের প্রতিবেশীর জিনিসপত্রের উপরে আমারও দাবি আছে। লুঠের ভাগ আমাদেরকেও দিতে হবে।' তিনি ইশারা করলেন তার ছেলেমেয়েকে। তারা যে যা পারল হাতে করে নিয়ে ছুটল নিজেদের ঘরে।

হারামজাদা শিখ ! খোদা যদি এ যাত্রা রক্ষা করে তাহলে তোর একদিন কি আমার একদিন। কিন্তু এ মুহূর্তে প্রতিবাদ করারও উপায় নেই। দাঙ্গাবাজরা প্রত্যেকেই সশস্ত্র, আর আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা যদি আমার উপস্থিতি টের পেয়ে যায়....

বুড়ো শিখের হাতের খোলা কৃপাণের দিকে আমার নজর আটকে গেল। উনি আমাকে ঘরে যেতে ইশারা করছেন। আমার জিনিস লুট করে হাত নোংরা করার পরে লোকটাকে আরো ভয়ংকর লাগছে। তার হাতের ঝলসানো কৃপাণের ফলা আমাকে নিয়তির প্রতি আহ্বান করছে। এখন আর বিবাদ করার সময় নেই। দাঙ্গাবাজদের বন্দুকের গুলি কিংবা বুড়োর কৃপাণ যে কোন একটি আমার বেছে নিতে হবে। সশস্ত্র গুন্ডাদের সম্মিলিত আক্রোশ থেকে বুড়োর কৃপাণই বরং ভাল ভেবে ইতস্তত: ভঙ্গিতে, নি:শব্দে ঘরে ঢুকলাম।

'এখানে নয়, ভেতরে চলুন,' আমি ভেতরের ঘরে ঢুকলাম, কসাইয়ের পেছন পেছন যেভাবে ছাগল যায়। কৃপাণের ফলার ঝলসানিতে চোখ অন্ধ হবার জোগাড়।

'এই যে আপনার জিনিসপত্র। নিন,' বললেন শিখ।

তিনি এবং বাচ্চারা যে সব জিনিস লুট করার ভান করে এনেছিলেন, সমস্ত কিছু আমার সামনে এনে রাখলেন। শিখের বৃদ্ধা স্ত্রী বললেন, 'বাবা, আমি দু:খিত এর বেশি কিছু উদ্ধার করতে পারি নি।'

আমি বিস্ময়ে হতবাক। মুখে কোন কথা জোগাল না।

লুটেরার দল আমার স্টীলের আলমারি টেনে বের করে এনেছে ঘর থেকে, ওটা ভাঙার চেষ্টা করছিল। শুনতে পেলাম একজন বলছে, 'চাবি পাওয়া গেলে খুলতে আর সমস্যা হতো না।'

'চাবির খোঁজ মিলবে শুধু পাকিস্তানে। কাপুরুষের বাচ্চা মুসলমানটা পিঠটান দিয়েছে।'

প্রতিবাদ করল ছোট্ট মোহিনী। 'শেখজী কাপুরুষ নন। আর তিনি পাকিস্তানেও পালিয়ে যান নি।'

'তাহলে ব্যাটা মুখ লুকিয়েছে কোথায় ?'

'তিনি কেন মুখ লুকোতে যাবেন ? তিনি আছেন......' বলেই মোহিনী বুঝতে পারল মস্ত ভুল করে ফেলেছে। চুপ হয়ে গেল সে। তার বাবার চেহারা লালচে হয়ে উঠল। তিনি ভেতরের ঘরে আমাকে তালা মেরে রাখলেন, ছেলের হাতে কৃপাণ ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দাঙ্গাবাজের মুখোমুখি হতে।

বাইরে এরপরে কি ঘটেছে ঠিক বলতে পারব না আমি। শুধু দুমদাম ঘুসির শব্দ শুনতে পেলাম; তারপর ভেসে এল মোহিনীর কান্নার আওয়াজ; শিখ পাঞ্জাবী ভাষায় তারস্বরে গালাগাল দিতে লাগলেন। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ হলো আর শিখ কাতরে উঠলেন 'হা !' বলে।

শুনতে পেলাম ট্রাক স্টার্ট নিচ্ছে; তারপর আশ্চর্য নীরবতা নেমে এল।

তালা খুলে আমাকে ঘর থেকে যখন বের করে আনা হলো দেখলাম শিখ দড়ির খাটিয়ায় চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। তার পাশে ছেঁড়া, রক্তমাখা জামা। পরনের নতুন জামা বেয়েও রক্ত ঝরছে। তার ছেলে গেছে ডাক্তারকে ফোন করতে।

'সর্দারজী, এ আপনি কি করেছেন ?' জানি না কিভাবে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল কথাগুলো। এতদিন ধরে যে ঘৃণার রাজ্যে বাস করে এসেছি, এক লহমায় তা টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

'সর্দারজী, আপনি কেন এ কাজ করতে গেলেন ?' প্রশ্ন করলাম আবার।

'বেটা, তোমার কাছে আমার একটা ঋণ ছিল।'

'কিসের ঋণ ?'

'রাওয়ালপিন্ডিতে তোমার মত একজন মুসলমান তার জীবন দিয়ে আমাকে আর আমার পরিবারের সম্মান রক্ষা করেছিল।'

'তার নাম কি, সর্দারজী ?'

'গোলাম রসুল।'

নিয়তি কি দারুণভাবে খেলল আমাকে নিয়ে ! দেয়াল ঘড়িটি বেজে উঠল..... ১.... ২....৩....৪....৫.... শিখ মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন ঘড়ির দিকে। হাসি ফুটল মুখে। বৃদ্ধকে দেখে আমার দাদার কথা মনে পড়ে গেল। দাদার মুখেও এরকম বারো ইঞ্চি লম্বা দাড়ি ছিল। দু'জনের মধ্যে কি অপূর্ব মিল !

....৬....৭....৮....৯.... নীরবে গুণতে লাগলাম আমরা।

আবার হাসলেন তিনি। তাঁর সাদা দাড়ি এবং লম্বা, সাদা চুল যেন অলৌকিক দীপ্তি ছড়াচ্ছে, স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত...১০....১১....১২.... থেমে গেল ঘন্টা ধ্বনি।

আমি যেন শুনতে পেলাম উনি বলছেন, 'আমাদের, শিখদের জন্যে সবসময়ই বারোটা বাজে !'

কিন্তু দাড়িঅলা ঠোঁট জোড়া এখনো হাসি হাসি দেখালেও নিশ্চুপ। আমি জানি ইতিমধ্যে তিনি দূরের এক পৃথিবীতে চলে গেছেন যেখানে ঘড়ির ঘন্টা ধ্বনি কেউ শোনে না, যেখানে সন্ত্রাস ও উপহাস তাকে কখনো আঘাত করতে পারবে না।

লেখক পরিচিতি

খাজা আহমদ আব্বাস (১৯১৪-১৯৮৯) ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক, উপন্যাসিক ও চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিচালক। বাম ঘেঁষা এ লেখক উর্দুতে ৪০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দিয়া জ্বলে সারি রাত (উপন্যাস), ম্যায় কৌন হ্যায়, এক লাড়কি ও জাফরান কে ফুল (ছোট গল্প সংকলন)। তাঁর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে হোয়েন নাইট ফলস, ফেস টু ফেস উইথ ক্রুশ্চেভ, মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে দুই খন্ডের আত্মজীবনী ইন্দিরা গান্ধী: রিটার্ন অভ দ্য রেড রোজ এবং এটির পরবর্তী খন্ড দ্যাট উওম্যান।এ গল্পটি উর্দু থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার খুশবন্ত সিং।

তাই ইশ্রী

কৃষন চন্দ্র

আমি তখন ক্যালকাটার গ্রান্ট মেডিকেলের কলেজে শেষবর্ষের ছাত্র। লাহোরে ক'দিনের জন্য গিয়েছিলাম ভাইয়ের বিয়েতে। আমাদের পূর্ব পুরুষের বাড়ি শাহি মহল্লার কাছে, কুচা ঠাকুর দাস লেনে, ওখানে বিয়ে। আর ওখানেই আমার প্রথম পরিচয় তাই ইশ্রীর সাথে।

তাই ইশ্রী আমার আপন মাসি নন। তবে তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে ডাকত তাই- বড় মাসী বা খালা। তাঁর টোঙ্গা আমাদের মহল্লায় ঢুকলেই কারো চোখে পড়লেই হল, চেঁচিয়ে পাড়া মাত করত সে.' তাই ইশ্রী এসেছেন!' তখন বুড়ো-ধাড়ি, বাচ্চা-কাচ্চা সকলে ছুটে যেত তাকে অভ্যর্থনা জানাতে। তাঁকে টোঙ্গা থেকে নামতে সাহায্য করতে হাত বাড়িয়ে দিত।

তাই ইশ্রীর ছিল ভয়ানক হাঁপানী রোগ। সামান্য হাঁটাহাঁটি, কথা বলা, এমনকি কাউকে ডাক দিতে গেলেও তাঁর জান বেরিয়ে যেত। কেউ টোঙ্গাঅলার ভাড়া দিতে গেলে চোখ রাঙাতেন তাই। বলতেন ভাড়া আগেই দিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথা বলার ভঙ্গি, শ্বাস নেয়ার জন্য সংগ্রাম, হাঁপানী-হাসি, সব কিছুই আমাকে আকর্ষণ করত। ভাড়া দেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাই ইশ্রীর আত্মীয় স্বজনকে মনমরা দেখাত, তারা পকেটে পয়সা ঢুকিয়ে অভিমানের সুরে বলত,' আপনি কেন ভাড়া দিতে গেলেন? আপনার সেবা করার সুযোগ আপনি কখনোই দেন না।' তাই জবাব দিতেন না। পাশে দাঁড়ানো কোন তরুণী বা কিশোরীর হাত থেকে হাত পাখা নিয়ে নিজেকে বাতাস করতে করতে মুচকি হাসতেন।

তাই ইশ্রীর বয়স ষাটের বেশী বৈ কম হবে না। বেশীরভাগ চুল পেকে সাদা, তাঁর বাদামী গোল মুখখানাকে দান করেছে অপূর্ব মহিমা। সবাই তার সহজ সরল কথা বলার ঢঙটিকে পছন্দ করত। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে, শ্বাস টানতে টানতে কথা বলতেন। আমি প্রথম দিনেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম তাঁর চোখের দিকে, বৃদ্ধার চোখে এমন কিছু আছে , যেন সর্বংসহা ধরিত্রীও চোখের জমিনে যেন বিস্তৃত ক্ষেত

ছড়িয়ে রয়েছে আর বইছে গভীর নদী-একই সাথে সীমাহীন সারল্যের প্রতীক ও দুঃখ গোপন করে রাখার প্রচেষ্টা তাতে, এবং অসীম ভালবাসা ও স্নেহের ফল্গুধারা উপচে পড়ছে চোখ জোড়া থেকে। তাই ইশ্রীর চোখে ছিল নিরন্তর গুনের আধার যে চোখ যে কোন সমস্যা অবলীলায় হেলা করতে পারে।

তাই ইশ্রীর পরনে ছিল সোনালী বর্ডার দেয়া রেশমী কাপড়ের 'ঘাগড়া', জামা জাফরান রঙের সিল্কের, তাতে ফুল আঁকা। মাথায় মসলিনের দোপাট্টা । হাতে সোনার ব্রেসলেট। তিনি উঠোনে হাজির হওয়া মাত্রই বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। তরুণী বধূ, খালা , ভাবী, ননদ, ফুপু ইত্যাদি যত রকমের আত্মীয় স্বজন আছে সবাই ছুটে গেল তাঁকে প্রণাম করতে। এক মহিলা রঙিন একটা পিড়ি নিয়ে এসেছে, তাই ইশ্রী মৃদু হেসে ওটার উপরে বসলেন। প্রতিটি মহিলাকে তিনি আলিঙ্গনে বেঁধে নিলেন, মাথায় মাথা ছুঁইয়ে করলেন আশীর্বাদ।

মহিলাদের দলে সাবিত্রী নামে একটি কিশোরী ছিল। সে মহা উৎসাহে তাই ইশ্রীকে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছিল। তাই ইশ্রী সাথে একটা ঝুড়ি নিয়ে এসেছেন। তাঁর পায়ের কাছে, পিড়ির সামনে ওটা রাখা। যে-ই আসছে তাঁকে প্রণাম করতে, প্রত্যেককে তিনি ঝুড়ি থেকে চার আনা তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। পুরুষ, নারী, ছোকরা, মেয়ে, বাচ্চা সবাই তাই ইশ্রীকে প্রণাম করে চার আনা পেল। এবারে তাই ইশ্রী ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন পাশে দাঁড়ানো কিশোরীর দিকে। এ তাকে বাতাস করছিল। 'কে গো তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমি সাবিত্রী,' ভীরু গলায় জবাব এল।

'ওহ হো, তুমি জয় কিষানের মেয়ে! তোমার কথা তো ভুলেই গেছিলাম। এসো, আমার সঙ্গে কোলাকুলি করো..........

তাই ইশ্রী মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলেন। তারপর ঝুড়ি থেকে চার আনা দিলেন। তখন মহিলারা হি হি করে হাসতে লাগল। কর্তারো মাসি আঙুলের নীলকান্তমনির আংটি ঘুরিয়ে বললেন,' তাই , এ সাবিত্রী জয় কিষানের মেয়ে নয়। এ অস্পৃশ্য হীরুর মেয়ে।'

'হায়, আমি গেছি।' আর্তনাদ করে উঠলেন তাই ইশ্রী । হাঁপানি উঠে গেল তাঁর। 'হায়, আমাকে এখন আবার চান করতে হবে। ওর মুখেও চুমু খেয়েছি। আমি এখন কি করি।'

তাই ইশ্রী বিস্ফোরিত চোখে তাকালেন অস্পৃশ্য সাবিত্রীর দিকে। কিশোরী ফোঁপাতে শুরু করেছে। সাথে সাথে মন খারাপ হয়ে গেল তাইর। মেয়েটিকে আবার বুকে টেনে নিলেন তিনি। ' আরে বোকা , কাঁদে না। তুই কোন পাপ করিস নি। তুই দেবীর মত নিষ্পাপ আর খাঁটি। স্বয়ং ঈশ্বর বাস করছেন তোর এই ছোট্ট শরীরের মধ্যে। আমাকে চান করতে হবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্য। তোকে কাঁদতে হবে না। নে, কান্না বন্ধ কর । এই রাখ আরও চার আনা.....'

তাই ইশ্রী কিশোরীকে আরেকটি চার আনা দিলেন । সাবিত্রী চোখ মুছে ফেলে ফিক করে হাসল। তাই ইশ্রী হাত তুলে ডাকলেন ,'হীরু। আমার চানের জল দাও। তোমাকেও চার আনা দেব'খন।' উঠোনের ভিড় বিস্ফোরিত হল অট্টহাসিতে।

অনেকেই তাই ইশ্রীকে চার আনা খালা বা মাসী বলে ডাকত। কেউ বলত দাতা মাসী। সবাই জানে বুড়ো বোধরাজ তাই ইশ্রীকে বিয়ে করলেও তাদের মধ্যে কোন শারীরিক মিলন ঘটেনি। তরুণ বোধরাজের সাথে সুন্দরী মেয়েদের সম্পর্ক ছিল। সাধারণ কৃষকের কন্যা তাই ইশ্রীকে তার মোটেই পছন্দ হয় নি। বোধরাজ বিয়ের দিনই তাইকে ফেলে চলে গেছে। তবে তাইয়ের সাথে সে খারাপ ব্যবহার করে নি। প্রতি মাসে পঁচাত্তর রুপী করে পাঠাচ্ছে। তাই ইশ্রী তাঁর শ্বশুর শাশুড়ি আর দেবর ননদ নিয়ে গ্রামে থাকেন। বোধরাজ জলন্দরে লোহার ব্যবসা করত। তাইর বাপ-মা মেয়েকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসার বহু চেষ্টা করেছেন। আসেননি তাই। মেয়েকে আবার বিয়েও দিতে চেয়েছেন । রাজি হন নি তাই। তিনি শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা যত্নে মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। এমন সেবা আপন মেয়েও করত না, বলেন তারা। বোধরাজের বাপ মালিকচান্দ তাই ইশ্রীর হাতে সংসারের চাবি তুলে দিয়েছেন। শাশুড়ি তার বউমাকে এত ভালবাসেন, নিজের সমস্ত সোনার গহনা তাইকে দিতে দ্বিধা করেননি।

সব বাবা-মাই কোন না কোন সময় তাঁদের সন্তানদের আচরণে ক্ষুব্ধ হন। তাই এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম। কোনদিন কাউকে বিন্দুমাত্র জ্বালাতন করেন নি। লোকে মজা করে বলে , তাই নিশ্চয়ই তার জন্মের সময় মাকে মিষ্টি গলায় বলেছিলেন, 'আমার জন্য তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এই নাও চার আনা।'

সম্ভবত শান্ত মেজাজের কারণেই স্বামীর সাথে শান্তিময় সম্পর্কটা বজায় রাখতে পেরেছেন তাই ইশ্রী । বোধরাজ একটা অকর্মার ধাড়ি, মদ্যপ, ব্যভিচারী। ব্যবসায় ভাল করলেও তাই ইশ্রীর জীবনটাকে ধ্বংস করে দেয়ার অধিকার তার নেই। কিন্তু তাই ইশ্রীর এ নিয়ে কোন অভিযোগ নেই। আচরণ দেখে মনেই হয় না স্বামীর কারণে জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেছে তাঁর। সবসময় উৎফুল্ল চিত্তে বকবক করে চলেছেন তিনি, হাসছেন, লোকের সঙ্গে ঠাট্টা মশকরা করছেন; সবসময় মানুষের সুখ দুঃখের ভাগীদার তিনি, সাহায্যের জন্য বাড়িয়েই রেখেছেন হাত। মহল্লায় কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে আর সেখানে তাই ইশ্রী অনুপস্থিত এ কল্পনাই করা যায় না। আবার কারও আত্মীয় স্বজন মারা গেলেও তাকে সান্ত্বনা জানাতে ছুটছেন তিনি।

তাই ইশ্রীর স্বামীর টাকা থাকলেও তাইয়ের ছিল না। প্রতি মাসের ৭৫ রুপী মাসোহারা তিনি অন্যদের জন্য ব্যয় করতেন। ওই সময় ৭৫ রুপীর অনেক দাম। ওই টাকা দিয়ে অনেককে সাহায্য করতেন তাই ইশ্রী। তবে তাই ইশ্রী টাকা বিলোতেন বলে যে লোকে শুধু তার কাছে আসত তা কিন্তু নয়। পকেটে একটি পয়সাও নেই , তবু মানুষ তাঁর কাছে যেত আশীর্বাদ নিতে। লোকে বলত তাই ইশ্রীর পা ছুঁয়ে প্রণাম বা সালাম করলেই মনে শান্তি আসে।

বোধরাজ ছিল শয়তান এবং তাই ইশ্রী সাক্ষাৎ দেবী। ত্রিশ বছর ধরে শ্বশুর বাড়িতে বাস করে আসছিলেন তাই ইশ্রী। শ্বশুর-শাশুড়ি এক সময় মারা গেলেন, ননদ দেবররা বড় হবার পরে বিয়ে শাদী করে আলাদা হয়ে গেল । গ্রামের বাড়িটি হয়ে পড়ল শূন্য। বোধরাজ তখন বাধ্য হলো তাই ইশ্রীকে জলন্দরে নিয়ে আসতে। কিন্তু ওখানে বেশিদিন টিকতে পারলেন না তাই ইশ্রী। কারণ বোধরাজ পাঞ্জাব থেকে আসা এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। পাঠান পরিবারটি তাদের সম্মানের ভয়ে তাই ইশ্রীকে একদিন অনুরোধ করল তাঁর স্বামীকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে। কয়েক দিন পরে তাই ইশ্রী স্বামীকে নিয়ে চলে এলেন লাহোরে। এবং মহল্লা ভারিয়ারানে ছোট একটা বাসা ভাড়া করলেন। বোধরাজ্যের ভাগ্য সুপ্রসন্ন । এখানেও তার ব্যবসা জমে উঠল। একই সাথে লছমী নামে এক পতিতার বাড়িতে সে যাতায়াত শুরু করে দিল। লছমী শাহী মহল্লায় দেহ ব্যবসা করত। সম্পর্কটা এতটাই গভীরে চলে গেল যে বোধরাজ বেশ্যাটার সাথে থাকতে শুরু করল, খুব কমই তাকে দেখা যেত মহল্লা ভারিয়ারানে । তবে এ নিয়ে কোন দুশ্চিন্তার ছাপ ছিল না তাই ইশ্রীর চেহারায়।

বেশ্যা মেয়েটার সঙ্গে বোধরাজের সম্পর্কের কথা চাউর হয়ে যাবার সময়টাতে আমি এলাম আমার ভাইয়ের বিয়েতে। বোধরাজ বিয়েতে আসেনি, তবে তাই ইশ্রী সারাটা দিন কাটিয়ে দিলেন অতিথি আপ্যায়নে। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সবাই খুশী, এমনকি 'হাসতে মানা' ধরনের লোকের মুখেও হাসি ফুটল।

আমি কোনদিন শুনিনি তাই ইশ্রী কারও গীবত গেয়েছেন, নিয়তিকে দোষ দিয়েছেন। শুধু একবার তাকে কিছুক্ষণের জন্য মনমরা হতে দেখেছি।

ঘটনাটা বিয়ের সময়ের। আমার বড় ভাইকে সারা রাত ব্যস্ত থাকতে হল বিয়ের নানা আচার অনুষ্ঠানে। পরদিন সকালে সকল লৌকিকতা শেষে কনের বাড়ির লোকজন তাদের যৌতুকের জিনিসপত্র নিয়ে এল। ওই সময় লোকে সোফাসেটের বদলে বাহারী রঙের পিড়ি আর খাট উপহার দিত। সে সব খাটের পায়াও থাকত রঙ করা। ওই সময় ড্রইংরুমকে লোকে বলত বৈঠকখানা কিংবা দিওয়ান খানা । আমার বড় ভাইয়ের শ্বশুর ভারতীয় সেনা বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি তাঁর মেয়েকে প্রচুর যৌতুক দেন--এবং সবই লেটেস্ট স্টাইলের। আমাদের আত্নীয় স্বজন ওই প্রথম যৌতুক হিসেবে সোফা সেট চোখে দেখে।

সবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছিল এই সোফা। দুরের গাঁও থেকে মহিলারা এসেছিল 'ইংলিশ পিড়ি' দেখতে। তাই ইশ্রীও সেবারই প্রথম সোফা নামের বস্তুটি চাক্ষুস করেন। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তিনি সোফা সেটের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছিলেন আর বিড়বিড় করছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন ছুড়লেন,' বেটা , এ জিনিসের নাম সোফা সেট কেন?'

এ প্রশ্নের কি জবাব দেব আমি? শুধু মাথা নেড়ে বললাম,'জানি না মাসি।'

'দুটো চেয়ার ছোট আর তৃতীয়টা লম্বা কেন?'

এ প্রশ্নের জবাবও আমার জানা নেই। তাই মাথা নেড়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

তাই বিষয়টি নিয়ে কিছুক্ষণ আপন মনে কী যেন বললেন। হঠাৎ শিশুর মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা, যেন প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন। 'বলব তোমাকে?'

'বলুন।'

আমরা যেন শিশু, সেভাবে ব্যাখ্যা করলেন তিনি, 'শোনো!আমার মনে হয় লম্বা সোফাটা বানানো হয়েছে যখন স্বামী-স্ত্রীর মনে শান্তি থাকে এবং তারা শান্তিতে ওটার উপর বসতে পারে সে চিন্তা করে। আর ওরা যখন বিবাদ করে তখন যাতে আলাদাভাবে বসতে পারে, তাই ভেবে ছোট চেয়ার দুটো বানিয়েছে। ইংরেজদের মাথায় অনেক বুদ্ধি। এ জন্যেই তো ওরা আমাদেরকে শাসন করছে।'

তাইয়ের ব্যাখ্যা শুনে সবাই ফেটে পড়ল হাসিতে। আমি লক্ষ করলাম হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে গেছেন তিনি। তাইয়ের কি মনে পড়েছে স্বামীর সাথে তাঁর জীবনভর ভুল বোঝাবুঝির কথা? আমি ঠিক নিশ্চিত নই, তবে চোখের দিকে তাকাতে মনে হলো অদ্ভুত একটা আলো যেন দেখতে পেয়েছি ও চোখে। যেন মনের ভিতরে সবসময় বন্ধ হয়ে থাকা একটা দরজা এক মুহূর্তের জন্য খুলে গেছে।

ক্যালকাটা থেকে মেডিকেল ডিগ্রি নেওয়ার পরে আমি একটি বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করে ধর্মতলায় ডাক্তারী প্র্যাকটিস শুরুর চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই সুবিধে করে উঠতে পারছিলাম না। অবশেষে আমার বড় ভাই লাহোর চলে আসতে তাগাদা দিল। কুচা ঠাকুর দাসের একটি দোকানে আমাকে বসিয়ে দিল। সেখানে আত্মীয়স্বজন আর প্রতিবেশীদের নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করে দিলাম। ক্যালকাটায় আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, ছিলাম নবিশ, লাহোরে দশ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে, কীভাবে রোগীকে ফাঁদে ফেলা যায় সে কৌশল রপ্ত করে ভালই কাজ করতে লাগলাম। প্র্যাকটিস জমে উঠতে লাগল। দিন রাত পাগলের মত খেটে যাচ্ছি।

আমার এখন নিজের পরিবার হয়েছে, জীবন ঘূর্ণির মত চলছিল, কোথাও বেড়াতে যাবারও ফুরসত নেই।

তাই ইশ্রীর সঙ্গে দেখা নেই বহুদিন। শুনেছি তিনি এখনও মহল্লা ভারিয়ারানের সেই একই বাড়িতে বাস করছেন আর বোধরাজ তার পতিতা রক্ষিতা লছমীকে নিয়ে শাহী মহল্লায় থাকছে। মাঝে মাঝে সে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে।

একদিন সকালে, ক্লিনিকে বসে রোগীদের ভিড় নিয়ে ব্যস্ত, মহল্লা ভারিয়ারান থেকে এক লোক ছুটতে ছুটতে এসে জানাল, 'ডাক্তার সাব, তাই ইশ্রী মারা যাচ্ছেন। শিগগির চলেন।'

আমি রোগী দেখা বাদ দিয়ে লোকটির সঙ্গে রওনা হলাম। তাইয়ের বাড়ি মহল্লা ভারিয়ারানের শেষ মাথায়। সিঁড়ি বেয়ে প্রায় অন্ধকার একটি ঘরে ঢুকলাম। তাই বড় বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। ডান হাত দিয়ে চেপে

আছেন বুক, যেন ছেড়ে দিলেই কলজেটা ফেটে বেরিয়ে যাবে। আমাকে দেখে স্বস্তির হাসি ফুটল মুখে। 'বেটা, তুমি এসে পড়েছ। আর চিন্তা নেই আমার।'

'কী হয়েছে, মাসী?'

'মৃত্যু দেবতার ডাক পড়েছে ! গত দু'দিন খুব জ্বর ছিল, ঠান্ডা হয়ে গেল গা, (কথা বলার সময় তাইয়ের চোখের পাতা দ্রুত ঝাপ্টাচ্ছিল)। প্রথমে পা দুটো একদম নিস্তেজ হয়ে গেল, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি বরফের মত শীতল। চিমটি কাটলাম। কোন সাড়া পেলাম না। তারপর আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে গেল পেট, শেষে আমার শরীর থেকে যখন প্রাণবায়ুটা বেরিয়ে যাচ্ছিল, চেপে ধরলাম বুক (তাই বুকে হাতের চাপ বাড়ালেন)। তারপর চেঁচিয়ে বললাম, "কেউ আছে ? থাকলে জয় কিষেণের ছেলে রাধা কিষেণকে ডেকে নিয়ে এসো। ও-ই একমাত্র আমাকে সুস্থ করে তুলতে পারবে !"-তুমি এসে পড়েছ-জানি আমি আর মরব না।' শেষের কথাটা রায় ঘোষণার মত শোনাল।

আমি তাইয়ের ডান কবজির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। 'আপনার হাতটা দেখি। পালস পরীক্ষা করব।'

তিনি বাম হাতের ঝটকায় সরিয়ে দিলেন আমাকে। 'হায়, কেমন ডাক্তার গো তুমি!' চেঁচাচ্ছেন তাই। 'জানো না এ হাতে আমি আমার প্রাণবায়ু চেপে ধরে রেখেছি। আমি তোমাকে এ হাতের পালস দেখতে দেই কী করে ?'

কিছুদিনের মধ্যে আবার নিজের পায়ে খাড়া হতে পারলেন তাই। তাঁর উচ্চ রক্তচাপ আছে। প্রেশার নেমে গেলেই হাঁটাহাঁটি শুরু করে দেন, সবার খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। কয়েক মাস পরে তিনি যখন বেশ সুস্থ, মারা গেল বোধরাজ। রক্ষিতার বাড়িতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পটল তুলল সে।

তাই স্বামীর লাশ নিজের বাড়িতে আনতে দিলেন না। শাহী মহল্লা থেকে শবযান নিয়ে যাওয়া হলো। শোক যাত্রায় তাই অংশ নিলেন না, অন্ত্যোষ্টিক্রিয়াতেও না। কেউ তাঁর চোখে এক ফোঁটা জল দেখল না। একটিও কথা না বলে তিনি ভেঙে ফেললেন বিয়ের চুড়ি, রঙিন শাড়ি বদলে পরে নিলেন সাদা ধুতি, ঘষে ঘষে তুলে ফেললেন মাথার সিঁদুর, কপালে লেপে দিলেন সামান্য ছাই। ধর্মীয় রীতি এটুকুই অনুসরণ করলেন তিনি।

সাদা শাড়ি, সাদা চুলে তাইকে আগের চেয়ে অনেক শান্ত ও সমাহিত মনে হলো। তাঁর অদ্ভুত আচরণ নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের মাঝে গুঞ্জন উঠল। কেউ অবাক হলো, কেউ দুঃখ পেল। কিন্তু সবাই তাঁকে এতটাই শ্রদ্ধা করে যে সামনাসামনি কেউ কিছু বলার সাহস পেল না।

সময় যেতে লাগল। আমার প্রাকটিসের পরিধি মহল্লা ঠাকুর দাস ছাড়িয়ে শাহালাম গেটের কুচা কারমাল থেকে ওয়াচোবালির মূল চত্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সকালে আমি প্র্যাকটিস করি মহল্লা ঠাকুর দাসে, সন্ধ্যায় ওয়াচোবালিতে। কাজে প্রচন্ড ব্যস্ততার জন্য বহুদিন তাই ইশ্রীর সঙ্গে দেখা হয় না। তবে পরিবারের মেয়ে মহল থেকে তাঁর

খোঁজ-খবর পাই। বোধরাজ ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা পয়সা দিয়ে গেছে লছমীকে, শুধু একটি বাড়ি আর জলন্ধরের একটি দোকান উইল করেছে তাই ইশ্রীর নামে। তাই ওখান থেকে মাসে দেড়শো রূপী ভাড়া পান। তিনি মহল্লা ভারিয়ারানে আগের মতই জনসেবা চালিয়ে যাচ্ছেন।

একদিন এক রোগী দেখে শাহী মহল্লা দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ মনে পড়ল বোধরাজ আর লছমীর কথা। এরা তো শাহী মহল্লাতেই থাকত। তাই ইশ্রীর কথাও মনে পড়ে গেল। এক বছরেরও বেশি হয়েছে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা নেই। কষ্ট লাগল বেচারির জন্য। ঠিক করলাম একটু সময় পেলেই দু'একদিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

তাই ইশ্রীর কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শাহী মহল্লার একটা গলি থেকে বেরুচ্ছেন। বাহারি ঘাগরার বদলে সাধারণ কালো একটি ঘাগরা পরনে, তাতে কোন পাড় বা কুঁচি নেই। কামিজটাও ম্যাড়মেড়ে সাদা রঙের, সাদা মসলিন দোপাট্টা এমনভাবে পেঁচিয়েছেন চিবুক আর মাথায়, তাকে মা মেরীর মত লাগছিল।

তাই ইশ্রী প্রায় একই সঙ্গে দেখে ফেললেন আমাকে। তাঁকে খুবই বিব্রত মনে হলো। ঝট্ করে ঘুরলেন। যে গলি থেকে এসেছেন ওদিকে হাঁটা দিলেন আবার। আমি ডাক দিলাম তাঁকে। অবাক হয়ে ভাবছিলাম বেশ্যালয়ে তাই ইশ্রী কী করেছেন ? 'তাই ইশ্রী !' জোরে ডাকলাম আমি। 'তাই ইশ্রী !'

আমার গলা শুনতে পেয়েছেন তিনি, ঘুরলেন, মাথা নিচু করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। যেন মস্ত কোন অপরাধ করে এসেছেন।

'তাই ইশ্রী, এখানে কী করছেন ?' রাগ এবং বিস্ময় মেশানো কণ্ঠ আমার।

আমার চোখে চোখ তুলে তাকাতে পারলেন না তিনি। 'বেটা,' কাঁপা গলায় বললেন, 'আমি কী বলব ? ইয়ে মানে...ওই...শুনলাম লছমী মেয়েটার শরীর ভাল নেই...খুব অসুস্থ...ভাবলাম একবার একটু দেখে যাই...'

'আপনি লছমীকে দেখতে এসেছিলেন!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'লছমী ! সেই বেশ্যা, বদ মেয়েলোকটা...'

তাই ইশ্রী হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরলেন। 'না, না, বেটা !' নরম গলায় বললেন। 'ওকে এভাবে গালমন্দ কোরো না।' চোখ তুলে চাইলেন তিনি, দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেললেন। 'একমাত্র ওকে দেখে আমার মৃত স্বামীর কথা মনে করতাম। আজ সে সুযোগটাও হারিয়ে গেল চিরতরে।'

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার পরে লাহোর ছেড়ে জলন্ধরে চলে এলাম। ওখানে তাই ইশ্রীর একটি বাড়ি ছিল। তিনি দোতলাটা ছেড়ে দিলেন আমাদের জন্য। প্রতিদিন তিনি উদ্বাস্তু ক্যাম্পে গিয়ে সাধ্যমত সাহায্য করতেন। মাঝে মাঝে দু'একটি এতিম শিশুকে নিয়ে ফিরে আসতেন। চার-পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি চারটা ছেলে আর তিনটে মেয়েকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। এদের কারোর বাবা-মা'র খোঁজ মেলেনি। উদ্বাস্তুদের জন্য বাড়ির সামনের এবং পেছনের উঠানও ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।

কিছুদিনের মধ্যে তাই ইশ্রীর বাড়ি যেন সরাইখানায় রূপান্তর ঘটল। তবু কেউ এক লহমার জন্য তাঁকে বিরক্ত হতে দেখেনি। নিজের বাড়িতে তিনি ঢোকেন অচেনা মানুষের মত, যেন রিফুজিরাই এ বাড়ির মালিক। নিজেদের ব্যক্তিগত সহায়-সম্পদের প্রতি মেয়েদের স্বভাবজাত মোহ থাকে। শুধু তাই ইশ্রীর মধ্যে এ ব্যাপারটা অনুপস্থিত। কোন কিছুর প্রতি তাঁর মোহ নেই, শুধু মানুষের প্রতি রয়েছে অগাধ বিশ্বাস। জলন্ধরে আসার পরে এক বেলা খাবার খেতে হত তাঁকে, এ নিয়ে কখনও অভিযোগ করতে শুনিনি।

দাঙ্গার সময়টাতে স্বাভাবিক ভাবেই আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। তাই ইশ্রী জনে জনে সবাইকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিচ্ছেন, এ ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হত না আমার। লাহোরে লাভজনক একটা প্র্যাকটিস হারিয়েছি আমি, মডেল টাউনের বাড়িটিও ফেলে রেখে পালিয়ে আসতে হয়েছে। আমার মাথার উপর ছাদ নেই- জামা কাপড় নেই, শূন্য পকেট, খাবার কেনার টাকাও নেই। খাবার দেওয়া হলে খাই, না দিলে অনাহারে থাকি। এমনসময় আবার বাধিয়ে বসলাম আমাশা। নিজে ডাক্তার বলে রোগের চিকিৎসা জানি। কিন্তু আমাশা হলে ভাল খাবার-দাবার দরকার। তা কোথায় পাব ? দ্রুত আমার স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগল। রোগের কথা কয়েকটা দিন গোপন রেখেছিলাম তাই ইশ্রীর কাছে। কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম একদিন। তিনি আমার ঘরে এসে গভীর উদ্বেগ নিয়ে বলতে লাগলেন, 'বেটা, আমার কথা শোনো। এর নাম আমাশা। বড় ভয়ানক রোগ। ডাক্তাররা এ রোগ সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমি তোমাকে ভাড়া দিচ্ছি। সোজা গুজরানওয়ালায় চলে যাও। স্বর্ণকার গলিতে করিম বক্স চাচা থাকেন। পেশায় নাপিত। তার কাছে খুব ভাল ওষুধ আছে। ওই ওষুধ খেলে সবচে' বিশ্রী আমাশাও সেরে যায়। তোমার মেসোর কুড়ি বছর আগে একই রোগ হয়েছিল; করিম চাচা তাঁকে ভাল করেছিলেন। গুজরানওয়ালায় আমার স্বামী দশ দিন ছিলেন। ফিরে এসেছিলেন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে।'

আমি অসহিষ্ণু গলায় বললাম, 'তাই, আপনি জানেন না যে গুজরানওয়ালায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় ?'

'কেন সম্ভব নয় ? আমি তোমাকে যাবার ভাড়া তো দিচ্ছিই।'

'টাকা সমস্যা নয়। গুজরানওয়ালা পাকিস্তানে।'

'তাতে কী ? আমরা কি ওখানে ওষুধ আনতে যেতে পারব না ? আমাদের করিম বক্স চাচাও...'

'তাই, আপনি দেখছি চোখ মেলে ঘুমাচ্ছেন,' বেজায় বিরক্ত আমি। 'জানেন না, মুসলমানরা এখন তাদের জন্যে আলাদা রাষ্ট্র তৈরি করে নিয়েছে ? সে দেশের নাম পাকিস্তান, আমাদেরটা হিন্দুস্তান। কোন হিন্দুস্তানী এখন পাকিস্তানে যেতে পারবে না। পাকিস্তানীরাও আসতে পারবে না হিন্দুস্তানে। পাসপোর্ট লাগবে।' বিস্ময়ের ভাঁজ পড়ল তাইয়ের কপালে। 'পাসপোর্ট ? এ জন্যে আমাদের কোর্টে যেতে হবে ?'

'হ্যাঁ। যেতে হবে।' ক্রুদ্ধ গলায় জবাব দিলাম। এই বোকা বুড়িকে কিছু বোঝাতে যাওয়া বড্ড ঝকমারি।

'না, বেটা। কোর্টে যাওয়া ঠিক কাজ নয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা কখনও কোর্টে যায় না। কিন্তু করিম চাচা....'

'গোল্লায় যাক করিম বক্স !' গর্জে উঠলাম আমি। 'আপনি কুড়ি বছর আগের কথা বলছেন। জানেন না করিম বক্স বেঁচে আছে না মরে গেছে। তবু তোতাপাখির মত তার নাম আউড়ে চলেছেন।'

চোখে জল নিয়ে মুখ ঘোরালেন তাই। তিনি চলে যাবার পরে নিজের উপর খুব রাগ হলো আমার। সরল, বৃদ্ধ মানুষটিকে কেন এভাবে আঘাত দিলাম আমি ? এতটা মেজাজ না দেখালেও চলত। বর্তমান সময়ের জটিলতা যদি তাই বুঝতে না পারেন সে জন্য তাঁর কী দোষ ?

ওই সময়টা ছিল দুশ্চিন্তা আর মেজাজ গরমের সময়। কলেজে পড়ার সময় বিপ্লব নিয়ে খুব গলাবাজি করেছি। পরে বিয়ে করে, প্রাকটিস শুরু করলে বিপ্লবের উত্তাপে ঠান্ডা জল পড়ে শীতল হয়ে গিয়েছিল। একটা সময় শব্দটা আমার অভিধান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে রায়টের সময়ে, জলন্ধরে বিপ্লব আবার মহা তেজে ফিরে আসে আমার কাছে। উৎসাহ নিয়ে বিপ্লবের কথা বলতাম আমি সব হারানো মানুষগুলোর সাথে। দোতলায় আমার ঘরে মীটিং বসত। একের পর এক চায়ের কাপ ধ্বংসের পাশাপাশি চলত বিশ্ব সমস্যা নিয়ে আলোচনা। আমি মুঠো শক্ত করে উঁচিয়ে ষাঁড়ের গলায় চেঁচাতাম, 'আমাদের সঙ্গে মোটেই মানবিক আচরণ করা হচ্ছে না। এসব লোকের কাছ থেকে কোনদিন ন্যায় বিচার পাব না। আমি নিশ্চিত এ দেশে শীঘ্রি আরেকটি ইনকিলাব (বিপ্লব) আসছে।'

একদিন আমার বক্তৃতা শুনে ফেললেন তাই ইশ্রী। ভিতরে ঢুকলেন তিনি শুকনো মুখ নিয়ে, দারুণ উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইলেন, 'বেটা, মুসলমানরা কী আসছে?'

'না তো ! আপনাকে কে বলল এ কথা ?'

'তুমিই না বললে ইনকিলাব আসছে ?'

বেচারি তাই, 'ইনকিলাব' ভেবেছেন কোন মুসলমানের নাম। তাঁর কথা শুনে আমরা হাসতে হাসতে খুন।

'আপনি যে কী সরল, তাই ! আরে, আমরা যে ইনকিলাবের কথা বলছি তা হিন্দু-মুসলমান কোনটাই নয়। এ ইনকিলাব সবার জন্যে; আমরা একে আনতে চাই।'

তাই কী বুঝলেন কে জানে, মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, বেটা। তোমরা গল্প করো। আমি তোমাদের জন্যে চা নিয়ে আসি।

আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য তাই সোনার ব্রেসলেট বিক্রি করে দিলেন। ওই টাকা দিয়ে আমি আমার পরিবার নিয়ে চলে এলাম দিল্লীতে। কারণ তখন জলন্ধরের পরিস্থিতি খুবই অনিশ্চিত হয়ে উঠছিল। দিল্লীতে নতুন প্র্যাকটিস আরম্ভ

করলাম। কয়েক বছরের মধ্যে আবার খুঁজে পেলাম পায়ের তলার মাটি। আমার ক্লিনিক ছিল করল বাগে। ওখানে লাহোর থেকে আসা প্রচুর উদ্বাস্তু ঠাঁই নিয়েছিল। এদের অনেকেই আমার পূর্ব পরিচিত। ধীরে ধীরে এদের সাথে হৃদ্যতা বাড়ল। তারা আমার ক্লিনিকে আসতে লাগল। আমার উপার্জনও সেই সাথে বেড়ে চলল। দশ বছরের মাথায় একটি বাড়ি করে ফেললাম আমি, কিনলাম গাড়ি। করল বাগের নেতৃস্থানীয় নাগরিক আমি এখন। আবার ছুটি দিলাম বিপ্লবকে। আমার আর আমাশাও হলো না। ভাল ডাক্তার হিসাবে বেশ সুনাম কামিয়ে ফেলেছি মহল্লায়।

তেরো বছর বাদে, গত মার্চে আমাকে জলন্ধর যেতে হয়েছিল। এক আত্মীয়র বিয়ে। এই তেরো বছরে তাই ইশ্রীর কথা একবারও মনে পড়েনি। জলন্ধর পৌঁছা মাত্র মনে পড়ে গেল তাঁর কথা। মনে পড়ল এই মহিলা আমার জন্য কী করেছেন, বিশেষ করে তাঁর ব্রেসলেট বিক্রির টাকা দিয়ে আমি আবার নতুন করে প্র্যাকটিস শুরু করতে পেরেছি। তাই ইশ্রীর টাকাটা ফেরত দেওয়া হয়নি। জলন্ধর রেল স্টেশন থেকে সোজা চলে গেলাম তাঁর বাড়ি।

সন্ধ্যা নেমেছে। ধুলো, ধোঁয়া আর তেলের গন্ধ বাতাসে। পাশের বাড়ির শিশুদের কলরব শুনতে পেলাম তাই ইশ্রীর ঘরে ঢোকার সময়। তারা খেলাধুলা শেষে বাসায় ফিরেছে।

বাড়িতে তাই ইশ্রী ছাড়া কেউ নেই। প্রার্থনার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে রাখা। তেলের প্রদীপ জ্বালিয়েছেন তিনি, দেবতাকে ফুলের অর্ঘ্য দিচ্ছেন। আমার পায়ের শব্দ শুনে হাঁক ছাড়লেন, 'কে রে ?'

'আমি,' জবাব দিলাম হাসিমুখে ঘরে ঢুকে।

তাই দু'কদম এগিয়ে এলেন। কিন্তু চিনতে পারলেন না আমাকে। তেরো বছর দীর্ঘসময় ! কানে বোধহয় কম শোনেন উনি, চোখের জ্যোতিও হয়তো কমে এসেছে। আগের চেয়ে শুকনো দেখাল মুখখানা। হাঁটার সময় কদম ফেলেন খুব ধীরে। 'আমি রাধা কিষেণ,' মৃদু গলায় বললাম।

'জয় কিষেণের ছোট খোকা ?' আবেগে কেঁপে গেল তাইয়ের কণ্ঠ। দ্রুত এগিয়ে আসতে গেলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারেন সে ভয়ে চট করে আমি তাঁকে ধরে ফেললাম। আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকলেন তিনি। কাঁদছেন। অসংখ্যবার আশীর্বাদ করলেন তিনি আমাকে, চুমু খেলেন মুখে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, বিড়বিড় করলেন, 'বেটা, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি ? কোথায় ছিলে ? কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম !'

লজ্জায় মাথা নুয়ে গেল আমার, মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। কথা বলার চেষ্টা করলাম কিন্তু ভাষা যোগাল না মুখে। তাই আমার ব্রিবত হবার কারণ বুঝতে পারলেন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন হবার কারণ বুঝতে পারলেন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সেই পুরানো হাঁপানির মত টেনে প্রশ্ন করলেন, 'সরোজ ভাল আছে ?'

'আছে, তাই।'

'বড় ছেলেটা ?'

'ও ডাক্তারী পড়ছে।'

'আর ছোটটি ?'

'ও কলেজে।'

'শানু আর বাত্তু ?'

'দু'জনেই কলেজে উঠেছে। কমলার বিয়ে দিয়েছি।'

'ভাল। খুব ভাল !' সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন তিনি। 'আমিও সাবিত্রীর বিয়ে দিয়েছি। পুরান আছে রুরকিতে। নিম্নি আর বুমি ওদের বাবা-মা'র খোঁজ পেয়েছে। দেশ ভাগের ছ'বছর পরে ওরা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে গেছে ! দারুণ, না ? ওদের নিয়মিত খবরাখবর আমি পাই। শুধু গোপি আছে আমার সঙ্গে। সামনের বছর ও-ও আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। রেলওয়ে ওয়ার্কশপে শিক্ষানবিশের কাজ করবে।'

এরা সবাই রায়টের সময় তাইয়ের আশ্রয়ে ছিল।

আমি লাজুক ভঙ্গিতে থুতনি চুলকে নিয়ে বললাম, 'তাই, আপনার দেনাটা এখনও শোধ করতে পারিনি। টাকাটা পাঠাতে পারিনি বলে আমি খুবই লজ্জিত। আমি এবার দিল্লী ফিরেই টাকা পাঠিয়ে দেব।'

'কীসের দেনা ?' বিস্মিত দেখাল বৃদ্ধাকে।

'ব্রেসলেটের কথা মনে নেই আপনার ?'

'অঃ ওইটা !' মনে পড়েছে তাইয়ের। মুচকি হাসলেন। আঙুলের গাঁট দিয়ে আমার মাথায় টোকা দিলেন। 'তোমার কাছে আমার যে দেনা ছিল তা দিয়ে ও শোধবোধ হয়ে গেছে।'

'আমার কাছে আপনার তো কোন দেনা নেই !' অবাক আমি।

'বেটা, এ জীবনে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে দেনাদার ,' গভীর গলায় বললেন তাই। 'কেউ না কেউ দেনা শোধ করেই চলেছে। তুমি কি এই পৃথিবীতে আপনা আপনি আসতে পেরেছ ? না, তোমার বাবা-মা তোমাকে জীবন দিয়েছেন। তা হলে কি তুমি তোমার জীবনের জন্য আরেকজনের কাছে দেনাদার নও ? আমরা যদি এই ঋণ বা দেনা শোধ না করে চলি তা হলে পৃথিবী এগোবে কী করে ? শেষ হিসাব-নিকাশের দিন আসবে... বেটা, এ জন্যই বললাম আমার দেনা তুমি শোধ করে দিয়েছ। তুমি অন্য কারও দেনাও শোধ করে দেবে। সবসময় দায়মুক্ত থাকবে-এটাই জীবনের নিয়ম হওয়া উচিত।' দীর্ঘ বক্তৃতা শেষে বেদম হাঁপাতে লাগলেন তাই।

আমি আর কী বলব তাঁকে ? ছায়া আলোকে কী বলতে পারে ? তিনি যা বলেছেন আমি নীরবে শুনেছি। উনিও কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। তারপর আবার বললেন, 'আমার হাত-পা এখন আগের মত কর্মঠ নয়। নইলে তোমাকে কিছু একটা রান্না করে খাওয়াতাম। গোপী আসুক। তোমার জন্যে কিছু একটা বানিয়ে দেবে। তুমি না খেয়ে কিন্তু যাবে না....বুঝেছ ?'

আমি নরম গলায় বললাম, 'তাই, এসব নিয়ে একদম ভাববেন না তো। আজ দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে আছি তো শুধু আপনার দয়ায়। আমি তেজ পালের বিয়েতে এসেছি। রেল স্টেশন থেকে সোজা চলে এসেছি আপনার বাড়ি। কিন্তু এখন বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতেই হবে।'

'আচ্ছা,' বললেন তিনি। 'আমাকেও দাওয়াত দিয়েছে ওরা। কিন্তু গত দু'দিন ধরে শরীরে মোটেই জুত পাচ্ছি না। তাই যাব না ঠিক করেছি। ওদেরকে একটা উপহার পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি আমার তরফ থেকে তেজ পালের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ো। বোলো আমি তাকে আশীর্বাদ জানিয়েছি।'

'অবশ্যই, মাসী।' ঝুঁকে তাইকে প্রণাম করলাম।

উনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন। আমার মাথায় হাত রেখে অন্তত একশোবার আশীর্বাদ করলেন। 'বেটা,' আমি চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, এমন সময় ডাক দিলেন। 'আমার একটা কথা রাখবে ?'

'অবশ্যই। বলুন।'

'কাল সকালে একবার আমার কাছে আসবে ?'

'কেন, মাসী ?' হেসে উঠলাম আমি। 'ব্যাপার কী ? আজ তো দেখা করেই গেলাম।'

থেমে থেমে বললেন তাই, 'আমি চোখে ভাল দেখতে পাই না রে, বাপ। রাতের বেলা তো কিছুই দেখি না। কাল দিনের বেলা যদি একবার আসো তোমাকে একটু প্রাণ ভরে দেখতে পেতাম। তোমাকে তেরো বছর ধরে দেখি না, বেটা।'

আমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। 'আমি অবশ্যই আসব, মাসী।'

পরদিন সকালে বিয়ের আরও অতিথি আসার খবর পেয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে ক'জন মিলে গেলাম রেল স্টেশনে। ফেরার পথে তাইয়ের কথা মনে পড়ল। অতিথিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছুটলাম বৃদ্ধার বাড়িতে। যে গলিতে উনি থাকেন, তার কোণায় দেখতে পেলাম ক'জন লোক মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওদের পাশ কাটিয়ে দ্রুত কদমে এগোলাম। তাইয়ের বাড়ির নীচতলায় আরও অনেক মানুষের ভিড়, সবার চোখে জল। তাই ইশ্রী সকাল বেলা মারা গেছেন। ওই সময় আমি রেল স্টেশনে।

ওরা তাঁকে সাদা চাদরে জড়িয়ে তাঁর ঘরের মেঝেতে শুইয়ে রেখেছে। মুখখানা খোলা। ধূপ আর আগর বাতির গন্ধ ঘর জুড়ে। এক পন্ডিত বৈদিক মন্ত্র পড়ছেন।

তাই ইশ্রীর চোখ বোজা, শিশু সুলভ চেহারা ইতিমধ্যে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ও মুখে অসীম একাকীত্বের ছাপ। এ মুখ যেন আমি চিনি না। ও মুখ মুখ নয়, শান্তির প্রতীক, ওই মুখ অতল স্বপ্ন দেখত। ওই মুখ যেন স্বয়ং ধরিত্রী-যে পৃথিবীর চোখে প্রবাহিত হয় দুনিয়ার সকল নদী, যার কোলে শত, হাজার উপত্যকায়, হাসিতে উদ্ভাসিত পাহাড়ের ছায়ায় আবাস গড়ে তোলে মানুষ, যে মুখ থেকে স্বার্থহীন ভালবাসা আর সারল্যের দীপ্তির বিকিরণ ঘটে।

তাই ইশ্রীর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে ছিলাম আমি, চমক ভাঙল কাঁধের উপর কারও হাতের ছোঁয়ায়। ঘুরলাম। এক তরুণ। কাঁদতে কাঁদতে ফুলিয়ে ফেলেছে চোখ।

'আমি গোপী নাথ,' মৃদু গলায় বলল সে।

ও কে জানি আমি। তবে কোন মন্তব্য করলাম না। কী বলব বুঝতে পারছিলাম না।

'আপনার খোঁজে তেজ পালের বাড়ি গিয়েছিলাম; আপনি তখন রেল স্টেশনে।'

আমি চুপ করে রইলাম।

'তাই আজ সকালে বহুবার আপনার কথা বলেছেন। উনি জানতেন আপনি আসবেন। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগ পর্যন্ত উনি আপনার অপেক্ষা করেছেন। আর অপেক্ষার সময় নেই বুঝতে পেরে আমাকে বলছিলেন-'আমার বেটা রাধা কিষেণ এলে তাকে এ জিনিসটা দিয়ো।' গোপী নাথ হাত বাড়াল। আমার তালুতে একটি চার আনা রাখল।

আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

জানি না তাই ইশ্রী আজ কোথায় আছেন, তবে স্বর্গ থাকলে আমি নিশ্চিত তিনি তাঁর রঙিন পিড়িতে বসে, পায়ের কাছে ঝুড়ি নিয়ে দেবতাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করছেন, আর প্রত্যেককে বিলিয়ে দিচ্ছেন চার আনা পয়সা।

লেখক পরিচিতি

কৃষন চন্দ্রকে (১৯১৪-১৯৭৭) বলা হয় প্রেম চাঁদের পরে উর্দু ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ রূপকার। তিনি 'এক গাধে কি সরজুগান্ত' (গাধার আত্মকাহিনী) লিখে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করেন। এ বই ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হওয়ার পরে দুই লাখ কপিরও বেশি বিক্রি হয়েছে। তাঁর সাহিত্য কর্ম আশিটি ভল্যুমে প্রকাশিত হয়েছে। কৃষন চন্দ্রের লেখায় পরিস্কার ভাবে উঠে এসেছে মানুষের প্রতি মানুষের অবহেলা আর নির্যাতিতদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি। মানবতার প্রতি কৃষন চন্দ্রের অনুরাগের ছোঁয়া পাওয়া যায় হাম বৈশী হ্যায়, কালু ভাঙ্গি, মহালক্ষী ব্রিজ, ইসারি খালা, নয়ি গোলামী, যবখত জাগে ইত্যাদি গল্পে। তাঁর বই অনূদিত হয়েছে বিভিন্ন ভারতীয়, ইউরোপীয়, চীনা ও বাংলা ভাষাতেও।

উল্লেখ্য, 'তাই ইশ্রী' মূল উর্দু থেকে ইংরেজীতে রূপান্তর ঘটিয়েছেন প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও কলামিস্ট খুশবন্ত সিং।

সাদাত

যশপাল

গত ছ'বছর ধরে এটা ছিল আমার বৈঠকখানা। এর লাল রঙের মেঝেতে কত লোকের পায়ের ছাপ পড়েছে। তবে কারও ছাপ ফুটে নেই এতে। শুধু দরজার কাছে, মেঝেতে পরিস্কার ফুটে আছে বেড়ালের একজোড়া পায়ের ছাপ। মেঝে যতদিন অক্ষয় থাকবে, ছাপের চিহ্নও ম্লান হবে না। মেঝে তৈরির সময় বেড়ালটা কাঁচা সিমেন্টের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কারণে এ ছাপের সৃষ্টি। পায়ের ছাপজোড়ার দিকে তাকালে শৈশবের স্মৃতি মনে পড়ে যায় আমার– সেই বয়সটা যখন অনেক কিছুই মনের মাঝে এমনভাবে দাগ কেটে যায় যার কথা মানুষ কখনও বিস্মৃত হয় না। তখনও প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হইনি।

আমার বাবা বন বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ট্যুরে যেতেন। সঙ্গে আমাদেরকেও নিতেন।

একবার একটা পাহাড়ি এলাকায় আমাদের বেড়াতে নিয়ে গেলেন বাবা। রাস্তার পাশে, কুয়োর ধারে তাঁবু টাঙানো হলো। এ রাস্তা দিয়ে গাড়ি, ট্রাক, ঘোড়া, টাঙা আর পথচারী সবাই চলাচল করে। এ রাস্তায় এসে সবাই যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ফিতের মত চওড়া একটা পায়ে চলা পথ পাহাড় থেকে নেমে এসে নীচের উপত্যকায় মিলেছে। পাহাড়ি নারী-পুরুষরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে হেঁটে যাচ্ছে। মহিলাদের মাথায় বস্তা, পুরুষরা পিঠে বইছে ভারী বোঝা। আরেকটা ছবি পরিস্কার গেঁথে আছে মনে–এক লোক দু'তিনটে খচ্চর নিয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে। কাঁধে মোটা একটা লাঠি, এক হাত একটা কানে রেখে, আকাশের দিকে মুখ তুলে গলা ছেড়ে গাইছে সে।

কতদিন ওখানে ছিলাম ঠিক মনে নেই আমার। তবে রাস্তা আর কুয়োর ধারে বারবার শোনা বেশ কয়েকটা গান এখনও স্মৃতিতে গেঁথে রয়েছে। স্কুল এবং কলেজে পড়া ইতিহাস আর রসায়ন ভুলে গেছি আমি, তবে ওই গানগুলোর কথা মনে আছে পরিস্কার। গুনগুনিয়ে গাইও মাঝে মাঝে।

'গোরিয়ে দা মান লাগা চম্বে দি ঘাটি'
(চম্বল উপত্যকার প্রেমে পড়ে গিয়েছে যে মেয়েটি)
কুঞ্জা জায় পাইয়া নাদান
ঠাণ্ডে পানি তে বাঙ্কে নোহ্
পল ভার বহি লে, হো দায়ারা
(ক্রঞ্চ পাখিরা উড়ে এসে নামে নাদান নদীতে
ফুলবাবুরা সিনান করে ঠাণ্ডা জলে
ও দেবররে, আয় না একটু বসি এখানে)

কুয়োর ধারের ঢালে ঘন পাইন বন থেকে ভেসে আসত ঝিরঝির হাওয়া, যেন গান গাইছে, যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

একটা গাছের নীচে ছিল একটা কবর। কাছেই দুটো কুটির। কুটিরের বাসিন্দারা ভালুকের মত প্রকাণ্ড বড় বড়, কালো এক জোড়া কুকুর আর কয়েকটা মুরগি পুষত। আমি আর আমার ছোট বোন কুকুর এবং মুরগিগুলোর সঙ্গে খেলা করতাম। বেশিরভাগ সময় কেটে যেত ওই কুঁড়ে ঘরে।

আমার সমস্ত স্মৃতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয় সাদাত। এত বছর পর কত পরিবর্তন ঘটেছে আমার জীবনে, কিন্তু সাদাতকে একটুও ভুলতে পারিনি। সাদাত তার বুড়ো আঙুল আর অনামিকার মধ্যে চেপে ধরে থাকত দোপাট্টা, মাটি ছুঁয়ে সালাম করত আমার মাকে। মা'র সামনে সবসময় মাটিতে বসত সাদাত – তবে শহুরে মেয়েদের মত অভিজাত ঢঙে নয়। পা ছড়িয়ে বসত ও, হাঁটু নাচাত অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। তার নীলচে-ধূসর চোখ, চমৎকার অধর, সবসময় হাসি হাসি মুখ, সোনার মত চকচকে গায়ের রঙ, বাটালি দিয়ে খোদাই করা নিখুঁত নাক নিয়ে সাক্ষাৎ দেবী মূর্তি মনে হত সাদাতকে।

আমার ছোট বোন সীতাকে আদর করে মুন্নী বলে ডাকত সাদাত। সীতাও খুব ন্যাওটা ছিল সাদাতের। সাদাত আমাদের সঙ্গেই থাকত। মা'র সঙ্গে গল্প করত, ফাইফরমাশ খাটত। তবে ওর আসল কাজ ছিল বাচ্চা দেখাশোনা। সীতাকে দেখাশোনার জন্যই ও আমাদের সঙ্গে থাকত। সাদাতকে একবার পেলে আর কিছু চাইত না সে। এমনকী মাকেও ভুলে যেত।

আমি প্রায়ই শুনতাম মা তার বান্ধবী কিংবা প্রতিবেশীদেরকে বলছে, 'সুন্দরী কাকে বলে দেখেছিলাম একবার। ওহ্, সে যেন গোবরে এক পদ্মফুল।'

শুনেছি নারী নাকি নারীর সৌন্দর্য সহ্য করতে পারে না, ঈর্ষা করে। কিন্তু আমার মা সাদাতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতেন। 'সুন্দরী কাকে বলে দেখেছিলাম একবার,' বলতেন মা। 'কাঙরা থেকে নাদান যাওয়ার পথে, পীর চামোলার কবরের ধারে এক কেয়ারটেকার পরিবার বাস করত। কেয়ারটেকারের বউ সাদাত। রাজকন্যারাও অমন সুন্দরী হয় না। মেয়েটাকে এক নজর দেখলেই যে কেউ নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাবে, বন্ধ

হয়ে আসবে দম। আর এত হাসিখুশি মেয়ে। বাচ্চারা কিছুতেই ওর কাছছাড়া হতে চাইত না। হ্যাঁ, বাচ্চারাও সুন্দরের মর্যাদা দিতে জানে। তারা সুন্দর কী জিনিস বুঝতে পারে। তাই ওরাও সবসময় সাদাতকে কাছে চাইত... ছেলেবেলায় প্রায়ই শুনতাম মা বলতেন, 'ইস, সাদাতের মত সুন্দরী একটা মেয়ে যদি পেতাম আমার ছেলের জন্য। ধুলো থেকে হলেও তাকে কুড়িয়ে আনতাম ছেলেবউ করার জন্য।' আমি মা'র কথা শুনে হাসতাম।

এরপর যখনই গল্প কিংবা কবিতায় সুন্দরী নারীর বর্ণনা পড়েছি, তাকে শকুন্তলা অথবা জুলেখার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে সাদাতের অনিন্দ্য মুখখানা ভেসে উঠত মানস পটে। বাবা মা আমার বিয়ের কথা বললেও সাদাতের কথাই মনে পড়ত শুধু।

বাবা মা হয়তো এখন সাদাতের কথা ভুলে গেছেন কিন্তু সে আমার কাছে প্রতিদিন আরও বাস্তব হয়ে ফুটে ওঠে। আমার কাছে সুন্দর মানেই সাদাত। তবে ওর কথা ভেবে মনে মনে হাসিও। কারণ জানি সাদাতের রূপ এখন অতীত মাত্র। কুড়ি বছর দীর্ঘ সময়। সময় এতদিনে নিশ্চয় সাদাতের সৌন্দর্যে নিষ্ঠুর থাবা বসিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকল আমার, ডক্টরেট ডিগ্রী নেয়ার পর লেকচারারের পদে চাকরিও জুটে গেল। জীবনে প্রথমবারের মত উপার্জনক্ষম হয়ে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস অনুভব করলাম। এবার বিয়ের কথা ভাবতে লাগলাম। নিজের একটা বাড়ি, ভবিষ্যৎ বধূ ও সন্তানের স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম। সেই সঙ্গে খুব ইচ্ছে জাগল সেই পাহাড়ি উপত্যকায় একবার ঢুঁ মেরে আসতে। দেখতে ইচ্ছে করছে সৌন্দর্যের সেই দেবী এখন কেমন আছে। সেই সাদাত যাকে এতদিন ধরে সৌন্দর্যের একমাত্র প্রতীক বলেই জানি। কিন্তু সাদাত কি আর আগের মত আছে? কুড়ি বছর পরেও সে কি একই রকম থাকবে? তাকে আগের চেহারায় দেখতে পাবার আশা কি বোকার মত হয়ে যাচ্ছে না? এমন কোনও ফুল কি দুনিয়ায় আছে যা শুকিয়ে যায় না? সময়ের ভয়ঙ্কর চাকার নীচে দলিত হয়ে অপরিবর্তিত কেই বা থাকতে পারে? সবই বুঝতে পারছি আমি। তবু মন বলছে সাদাতকে একটিবার দেখে আসতে। সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে গরমের ছুটিতে রওনা হয়ে গেলাম আমার সৌন্দর্যের দেবীকে দেখার জন্য।

কাঙরায় পৌঁছে গেলাম। এখানে এতদিনে রাস্তা হয়েছে। কাঙরা থেকে সোজা চলে গেছে নাদান পর্যন্ত। বাস যাতায়াত করে। আমি বাসে চড়ে রানিতাল চলে এলাম। পাহাড়ের কাঁধে ছোট একটি হ্রদ, চারপাশে দেবদারু আর পাইনের সবুজ অরণ্য সব আগের মত আছে। স্বপ্নের মত।

সাদাতকে দেখার জন্য এসেছি বটে। তবে কুড়ি বছর পরে সে বেঁচে আছে কিনা জানি না। তাই তাকে দেখার আশা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। যদিও শৈশবের চেনা এই জায়গাটির সৌন্দর্য আগের মতই মুগ্ধ করল আমাকে। পীর চামোলার কেয়ারটেকারও বেঁচে আছে কিনা জানি না।

পীর চামোলার সমাধির দিকে পা বাড়ালাম। কানের কাছে ফিসফিস করছে পাইনের বন থেকে ভেসে আসা বাতাস, মাটিতে পাইনের শুকনো লাল পাতা গড়াগড়ি খাচ্ছে, উপত্যকার নীচে আমের বন – সব যেন স্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠার মত। কয়েক হাত দূরে, কতগুলো পাইন গাছের নীচে পীর চামোলার সাদা চুনকাম করা কবর চোখে পড়ল। সমাধির ঠিক পেছনেই কেয়ারটেকারের সেই কুটির। বাতাসের ফিসফিসানি যেন বেড়ে গেল আরও। আমার মন কেমন করতে লাগল।

কুয়োটাকে দেখেই চিনতে পারলাম। আসলে এটা মিষ্টি জলের একটা ঝর্ণা, টলটলে একটা নদী এর উৎস। ঝর্ণার চারপাশে সবুজ ঝোপের ঝাড় আগের চেয়ে ঘন লাগল। ছায়ায় গজিয়েছে বেগুনি রঙের ফুল। সবকিছু আগের মতই আছে, ভাবলাম আমি, শুধু আমি ছাড়া। আর আগের মত নেই এখানকার মানুষজন। সাদাতের এখানে এখন থাকার কথা নয় আর যদি থাকেও সে এতদিনে গোলাপের শুকনো পাপড়ির মত সুবাসহীন হয়ে গেছে। মানুষের রূপ এত ক্ষণস্থায়ী কেন?

নীচে ঝর্ণার ধারে লেংটি পরে বসে আছে এক বুড়ো। বগলে ছোট একটা হুক্কা, তার সামনে দুটো মাটির কলসি। হুক্কা টানতে টানতে ছোট একটা পাত্র থেকে কলসিতে জল ঢালল বুড়ো।

ফুটপাত থেকে নেমে এলাম আমি, পা বাড়ালাম কুয়োর দিকে। কেয়ারটেকারের সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু কিছু বলার আগেই নীরবতা ভাঙল সে।

চমকে উঠলাম দারুণ। নিজের কানকে বিশ্বাস হলো না। বুড়ো ডাক দিল আবার, 'সাদাত, ও সা-দা-ত।' শব্দটা প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়ে।

এবার সাদাতকে দেখতে পাব, ভাবলাম আমি। সাদাতও নিশ্চয় এ বুড়োর মত হয়ে গেছে, লোলচর্ম, শুকনো, বিধ্বস্ত। ওরা দু'জনে দুটো কলসি নিয়ে এখন বাড়ি যাবে।

সাদাত তা হলে এখনও বেঁচে আছে – সৌন্দর্যের দেবী। তাকে আবার দেখতে পাব, এ আবেগে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল আমার।

'আসছি, আব্বা,' এক মুহূর্ত পর জবাবটা প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়।

যেদিক থেকে কণ্ঠটা ভেসে এসেছে সেদিকে তাকালাম চোখ তুলে। সমাধিস্তম্ভের ওদিকে দেখতে পেলাম না কাউকে। অথচ তারুণ্যদীপ্ত, কলকলে কণ্ঠটা পরিস্কার শুনতে পেয়েছি আমি। গলাটা ঝর্ণার জলের মত মিষ্টি, কোয়েল পাখির মত সুরেলা। এ কি সত্যি সাদাতের গলা? নিজেকে প্রশ্ন করলাম। সাদাত কি মানেকা কিংবা উর্বশীর মত অনন্ত যৌবনা? সে কি চির যৌবনের অবিনশ্বর প্রতিমূর্তি?

তারপর এক তরুণী বেরিয়ে এল সমধিস্তম্ভের আড়াল থেকে, পাহাড়ি এক কন্যা, ঝলমল করছে যৌবনের আলোয়। পরনে গাঢ় নীল রঙের ঘাগরা, মাথায় একটা কলস, নেমে আসছে ঢাল বেয়ে। তার হাঁটার ছন্দে আশ্চর্য জাদু আর মাদকতা মেশানো।

আমার সামনে সকল সৌন্দর্য নিয়ে হাজির হলো রক্তমাংসের সাদাত। মুক্তোর মত ঝলমলে ত্বক, নীলচে-ধূসর বড় বড় চোখ, সেই নিটোল নাক, হাসি হাসি অধর, উদ্ধত এক জোড়া বক্ষ, হাঁটার তালে দারুণ ছন্দে ঝাঁকি খাচ্ছে। আমার দিকে তাকাল সে। দৃষ্টিতে পূর্ণ কৌতূহল। আমি তার দিকে প্রবল আগ্রহ নিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে আছি দেখে লজ্জা পেল সে। সংকুচিত হলো। ঘুরে দাঁড়াল।

কুয়োর চত্বরে হালকাভাবে কলসি নামিয়ে রাখল তরুণী। বুড়োকে ফিসফিস করে কী যেন বলল। তারপর উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো তার চেহারা, জল ভরা কলসিটা দু'হাতে তুলে নিল। আরেকবার তাকাল আমার দিকে। ভারী নিতম্বে ঢেউ তুলে পাহাড়ে উঠতে লাগল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে উত্তেজনা আর আনন্দে কাঁপতে লাগলাম।

শুকনা ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিলাম, বুড়ো কেয়ারটেকারকে সালাম দিয়ে বললাম, 'ঝর্ণায় তো জল তেমন নেই দেখছি।' ঝর্ণায় সত্যি জল কম। কলসি ডোবানো যায় না।

কপালে হাত রেখে বুড়ো বলল, 'জ্বী, সার। গরমের সময় আমাদের এখানে পানির খুব অভাব হয়।

আমি এবার বুড়োকে নিজের পরিচয় দিলাম। কুড়ি বছর আগের কথা মনে করিয়ে দিলাম তাকে। ঘোলাটে চোখে আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিল বুড়ো। তারপর বলল, 'জ্বী, সার। এক হিন্দু অফিসার বন বিভাগে কাজ করতেন। বছর কুড়ি আগে এখানে দু'মাসের জন্য এসেছিলেন। খুব ভাল মানুষ ছিলেন তিনি।'

'আমার মা এক সাদাত বিবির গল্প বলেন। এখানে থাকত সে। তাকে মা সালাম জানিয়েছেন।'

'জ্বী, সার,' বুড়ো বলল শান্ত গলায়। 'সে এই মেয়েটার মা। সাদাত এখন খুব বুড়ো হয়ে গেছে। হাঁটতে চলতে পারে না। ঢাল বেয়ে এক কলসি পানি আনার ক্ষমতা আমাদের দু'জনের কারোরই নেই। এই মেয়েটা না থাকলে যে কী দশা হত! ওর নামও আমরা সাদাত রেখেছি।' স্নেহভরা গলায় যোগ করল সে, 'মেয়েটা অবিকল তার মায়ের মত দেখতে হয়েছে। ওর মা তরুণ বয়সে এমনই সুন্দরী ছিল।'

তরুণী সাদাত আবার নেমে আসছে ঢাল বেয়ে। বাবার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখে লজ্জা কেটে গেল তার। দ্বিতীয় কলসিটা তুলে নিতে এল। আহ্, কলসিটা যখন কাঁধে তুলল ও, কী চমৎকার ছন্দে গোটা শরীর একটা ঝাঁকি খেল। আমার বুকে অদৃশ্য একটা তীর বিঁধল, আমি ওর অপরূপ সৌন্দর্যে বাকরুদ্ধ।

বুড়োর সঙ্গে তার কুটিরে চললাম প্রথম সাদাতকে দেখতে। আমার পরিচয় জেনে বৃদ্ধা আমাকে আদর করল। আমার মা'র কথা জিজ্ঞেস করল বারবার। কুড়ি বছর আগের গ্রীষ্মের সেই দিনগুলোর স্মৃতি চারণ করল। আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকল নতুন সাদাত। ওর চোখে চোখ পড়তে লাল হয়ে উঠল আমার গাল। তরুণী সাদাত আমাকে ডুমুর, স্ট্রবেরী আর দুধ খেতে দিল।

আমার সামনে বসল সে, যেভাবে তার মা আমার মা'র সামনে বসত। চঞ্চলা এক হরিণী। আমার মন চাইলেও ওর দিকে চোখ তুলে চাইতে সাহস পাচ্ছিলাম না। আমার বারবার মনে পড়ল মা এই সাদাতের মত মেয়েকে আমার বউ করে ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি জানি এ কখনোই সম্ভব নয়। আমার অসহায়ত্ব আমার হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে দিল।

সেদিন বিকেলের বাসে আমার কাঙরা ফেরার কথা। তাই ওদেরকে বিদায় জানিয়ে চলে এলাম। নিজেকে হতাশ এবং পরাজিত লাগছে। যে রূপের পূজা করে এসেছি তাকে দেখতে পাব না ভেবেই এখানে এসেছিলাম। এ সাদাতকে এতদিন মন্দিরের মত পবিত্র ভেবে বুকে স্থান দিয়ে এসেছি। তবে অপ্রত্যাশিত বাস্তবতা আমার মানসিক ভারসাম্য টলিয়ে দিয়েছে। সৌন্দর্য শুধু পূজা করাই যায় না; একে ধরা-ছোঁয়া যায়, এ হৃদয় ভেঙে দেয়।

আমি সাদাত এবং তার রূপের কথা ভুলতে পারিনি। যদিও তার জন্য কামনার মৃত্যু ঘটেছে অনেক আগেই। আমি এখন বুঝতে পারছি নারীর সৌন্দর্য তার শরীরের মত নশ্বর নয়। এ চির সত্যের মত চিরন্তন।

লেখক পরিচিতি

যশপাল (১৯০৩–১৯৭৬) বামপন্থী হিন্দিভাষী ঔপন্যাসিক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে দাদা কমরেড, দেশদ্রোহী, দো দুনিয়া, অমিতা, ঝুঠা সাচ, ছত্রিশ ঘন্টে এবং ফুলো কা কুর্তা। তিনি সব মিলে দুশো ছোট গল্প লিখেছেন। এসব গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাগ, আদমী কা বাচ্চা, পরলোক, পরিত্রাতা এবং কালা আদমী।

অচেনা পৃথিবী

কুলবন্ত সিং ভার্ক

হাজার সিং কোনও কাজ করে না। তবু খেয়ে পরে বেশ আছে। কীভাবে তার সংসার চলছে এটা গাঁয়ের অনেকের কাছে রীতিমত বিস্ময়। তবে হাজার সিংকে যারা ভাল করে চেনে, খোঁজ খবর রাখে তারা এ লোকের প্রশংসায় রীতিমত পঞ্চমুখ। তারা মুগ্ধ গলায় বলে গরু চুরি কিংবা বাড়িতে সিঁদ কাটতে জুড়ি নেই হাজার সিংয়ের। হাজার সিংয়ের রাত্রিকালীন অভিযানের গল্প তারা রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করে।

শিশুতোষ বইতে চোরদের পরিণতি জেলখানাতে হলেও হাজার সিংকে কখনও শ্রী ঘরে ঢুকতে হয়নি। চোর হিসেবে তেমন দুর্নামও নেই। পুলিশ ইন্সপেক্টর মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসেন। চোর ধরে আমাদের স্কুলের উঠোনে বেঁধে রেখে বেদম পেটান। তবে হাজার সিংকে কখনও পুলিশের মার খেতে দেখিনি।

পুলিশ ইন্সপেক্টর গাঁয়ে আসছেন শুনলে আনন্দের বন্যা বয়ে যায় আমাদের মাঝে। কারণ ওইদিন অবধারিত ভাবে ছুটি থাকবে স্কুল। তবে পুলিশের ভয়ে আমরা দরজা খুলে বেরুই না। আমরা শুধু শুনতে পাই স্কুলের উঠোন থেকে চোরদের 'বাবারে! মারে!' চিৎকার। বুঝতে পারি ইন্সপেক্টর ওদেরকে প্যাঁদাচ্ছেন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর এলে মাথায় সাদা পাগড়ি পরা হাজার সিং কনেস্টবলের সঙ্গে দড়ির খাটিয়ায় বসে গল্প করে। অথবা অফিসারের জন্য চা পানির ব্যবস্থা করতে মহা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

হাজার সিংয়ের অল্প কিছু জমি আছে। ওই জমি সে বর্গা খাটায়। নিজে দিব্যি খায় দায় ঘুরে বেড়ায়। কোনও কিছু নিয়ে তার উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা নেই। কৃষকরা বাড়িতে তৈরি মোটা কাপড়ের জামা গায়ে দেয়। মাঝে মধ্যে উৎসব থাকলে শহর থেকে কিনে আনা জামা পরে। এছাড়া হাজার সিংকে সবসময় দেখা যায় চমৎকার মসলিনের পাগড়ি আর সুতির ধবধবে সাদা জামা পরে ফুরফুরে মেজাজে চলে বেড়াচ্ছে। এ পোশাকে হাজার সিংকে দেখা যায় সে তার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে কিংবা পাশের গাঁয়ে আত্মীয়ের বাড়ি গেছে বেড়াতে। নিজের গাঁয়ে সে সবসময় আসরের মধ্যমণি হয়ে

থাকে। নানা বিষয় নিয়ে অফুরন্ত গল্প তার। শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে শোনে। মজা পায়।

হাজার সিংয়ের গল্প শুনতে ভাল লাগে আমার। বিশেষ করে ওর দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প। স্কুলে ছুটির দিনে হাজার সিংয়ের কাছে চলে যাই আমি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় তার মজার মজার গল্প শুনে। রসিয়ে, চমৎকার গল্প বলতে পারে লোকটা। গরু চুরি এবং সিঁদকাটার গল্প বলে সে সবচেয়ে মজা পায়, গর্বও অনুভব করে। সফলভাবে গরু চুরি কিংবা লোকের বাড়িতে সিঁদ কাটার ঘটনা বর্ণনা করার সময় উল্লাসে জ্বলজ্বল করে তার চোখ। যেন যুদ্ধ জয় করে এসেছে। আমরা ওকে ঘিরে বসি, আসরের মধ্যমণি হাজার সিং দারুণ ভাব নিয়ে গল্প করতে থাকে।

'একবার আমার ভাইস্তা এল আমার কাছে,' একদিন গল্প বলল হাজার সিং। গাছের একটা গুঁড়িতে বসেছে সে, কাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছে মাটি। বলল, 'এক জোড়া বলদ দরকার তার। নিনওয়ালার চাঠার এক জোড়া চমৎকার বলদ আছে। ও দুটো চাই তার। যেভাবেই হোক খামার থেকে বলদ জোড়া চুরি করে তার জন্য এনে দিতে হবে আমাকে! বললাম চাঠারা তার বাবার বন্ধু। তারা যদি জেনে যায় তাদের বলদ ভাইস্তা চুরি করে এনেছে, ও বলদ সে কিছুতেই রাখতে পারবে না। ফেরত দিতে হবে। আর বলদ যদি ফেরত দিতেই হয় তা হলে এমন কনকনে শীতের রাতে আমাকে গরু চুরি করার জন্য পাঠানোর কোনও মানে হয় না। কিন্তু সে গোঁ ধরে থাকল। বলল তার ওপর যেন ভরসা রাখি। একবার বলদ পেলে হয়। সে আর হাতছাড়া করছে না। কী আর করা। রাজি হয়ে গেলাম তার জন্য বলদ চুরি করতে।

'বলদের গলা থেকে ফাঁস খুলে ওদেরকে গোয়াল থেকে বের করে আনা মোটেই সহজ কাজ নয়। আর ওরকম চমৎকার এবং চতুর প্রাণী আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। ছায়া দেখলেই ওরা চমকে ওঠে। আর একবার ভয় পেলে ওদেরকে গোয়াল ঘর থেকে বের করে আনতে পারব না। বলদ দুটোর গলায় ঘণ্টা বাঁধা। লাফ ঝাঁপ শুরু করলেই আমি গেছি।

'আমি কিছু জাব নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে। আমাকে খাবার হাতে দেখে ওরা ভয় তো পেলই না, বরং গলা লম্বা করে দিল জাব খাওয়ার জন্য। হাত দিয়ে আদর করতে করতে ঝটপট ওদের গলা থেকে ঘণ্টাগুলো খুলে নিলাম তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম গোয়াল ঘর থেকে। আমি হাঁটতে লাগলাম সামনে, ওরা এল আমার পেছন পেছন। বলদ দুটোকে আশপাশের দু'দশ গাঁয়ের সবাই চেনে। আমাকে জানোয়ার দুটোর সঙ্গে দেখলেই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নেবে। আমি একটা ঘোড়া নিয়ে এসেছিলাম। কাছেই বেঁধে রেখেছিলাম ওটাকে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলাম আমি। জিনের সঙ্গে বেঁধে নিলাম বলদ দুটোর গলার রশি। ঘোড়া ছুটল। বলদও বাধ্য হলো পেছন পেছন ছুটে আসতে। পরদিন ভোরে, পুব দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে সূর্য, আমরা

ততক্ষণে কুড়ি মাইলেরও বেশি রাস্তা পাড়ি দিয়ে এসেছি। আমি আমার খালার গাঁয়ে ঢুকে পড়লাম। জানোয়ার দুটোকে একটা আখ খেতে বেঁধে রাখলাম। খালা আমাকে দেখে খুশিই হলেন। তবে তাকে বুঝতে দিলাম না কী কান্ড করে এসেছি। আমি চারপাইতে শুয়ে পড়লাম বিশ্রাম নিতে। রাতের বেলা বলদ নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম। সকাল হওয়ার আগেই পৌঁছে গেলাম ভাতিজার বাড়ি ।

'বলদের মালিক যে আমার পিছু নিয়েছিল, কে জানত ! দুই বলদ আর ঘোড়ার খুরের ছাপ অনুসরণ করে আসতে তাদের খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। ওরাও পরদিন পৌঁছে গেল গাঁয়ে। জানত তাদের বলদ কোথায় আছে। ভাতিজা ধরা পড়ে কিছুই বলতে পারল না। বলদ ফিরিয়ে দিতে হলো। কথাটা ভাবলে এখনও রাগে চিড়বিড় করে ওঠে গা। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বলদ যদি ভোগে না-ই লাগাতে পারল তা হলে এমন ঠান্ডার দিনে দুটো রাত এত কষ্ট কেন করতে গেলাম আমি। আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি ভাতিজা। মুখ নিচু করে থেকেছে।'

গরু চুরিতে ওস্তাদ লোক হাজার সিং। তবে লোকের বাড়িতে সিঁদ কাঁটতেও তার জুড়ি নেই। সিঁদ কাটার সময় তার প্রথম নিয়ম হলো 'কোনওরকম শব্দ করা চলবে না!' আর আওয়াজ যাতে না হয় সেজন্য নিজস্ব একটা ফর্মুলা আছে হাজার সিংয়ের। 'কাপড়,' বলে সে। 'শব্দের গলা টিপে ধরার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। যেসব জিনিস সরাতে গেলে শব্দ হতে পারে সেগুলোর গায়ে কাপড় জড়াতে হবে।'

আশপাশের গ্রামগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে হাজার সিং- 'তার নিজের গ্রাম' যেখানে সে কস্মিনকালেও চুরির ধান্ধার চিন্তা করে না। এবং 'বাকি সব গ্রাম'। এসব জায়গায় কোনওরকম দ্বিধা ছাড়াই সে চৌর্যবৃত্তির অভিযান চালায়। তবে এ কাজের জন্য কোন্ গাঁ তার সবচেয়ে পছন্দ বলা মুশকিল। প্রতিটি গ্রামই তার খুব ভালভাবে চেনা; এর রাস্তা-ঘাট, মাঠ, ঝোপঝাড়, খাল-বিল সবকিছু। এসব গ্রামকে নিজের গাঁ মনে করে হাজার সিং। চৌর্যবৃত্তি তার চোখে শিল্প এবং এ নিয়ে গর্বও করে। তবে সবার বাড়িতে সে চুরি করতে যায়ও না, বেছে বেছে যায়। 'মাঙ্গেওয়ালার সুদখোর মহাজনের বাড়িটি ছিল আধপাকা,' একবার গল্পটা বলল আমাদেরকে হাজার সিং। 'তার বাড়ির বাইরের দেয়াল সিমেন্টের। ভেতরে ঢোকা দুঃসাধ্য। একদিন শুনলাম মহাজন জমি বন্ধকীর অনেকগুলো টাকা পেয়েছে। ঠিক করলাম ওই লোকের পকেট খালি করব। এরকম সুযোগ বারবার আসে না।

'চারজনে মিলে কাজে লেগে গেলাম। খবর নিয়ে জানলাম চারজন ওই বাড়ির সামনের দিকের ঘরে ঘুমায়। পেছনের বা খিড়কির ঘরে কেউ থাকে না। দেয়াল ভেঙে ভেতরে ঢোকা সহজ নয়। তাই ঠিক করলাম দেয়ালের নীচের ভিত খুঁড়ে বাড়িতে ঢুকব। সেভাবে খুঁড়তে লাগলাম মাটি। দেয়ালের নীচে একটা বেশ লম্বা গর্ত করে ফেললাম। সুড়ঙ্গ বা গর্তটা গিয়ে ঠেকল বাড়ি পর্যন্ত। তারপর যা পেলাম সব হাতিয়ে

নিয়ে দে ছুট। তখন রাতের আঁধার মাত্র কাটতে শুরু করেছে। পরদিন পুলিশ ইন্সপেক্টর এলেন পরিদর্শনে। গর্তটা দেখে অবাক হলেন। প্রশংসার সুরে বললেন খুব দক্ষ হাতে সিঁদ কাটা হয়েছে। লোকটা ধরা পড়লে তাকে সামনাসামনি প্রশংসা করার কথাও বললেন তিনি।' মুচকি হাসল হাজার সিং।

ঘরে সিঁদ কাটা হাজার সিংয়ের কাছে খেলার মত - ঝুঁকি আছে বলে খেলাটা তার কাছে রীতিমত উত্তেজনাপূর্ণ। সে বলে, 'তুমি নিশ্চিত করে কিছুতেই বলতে পারবে না যে রাস্তা দিয়ে ঢুকেছ আবার সেখান থেকে বেরুতে পারবে কিনা। তিন/চারজনের সঙ্গে হাতাহাতি করে পেরে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না। তাই জান বাঁচানোর জন্য পালিয়ে যাওয়াই ফরজ মনে করি। যদিও ধরা পড়ার ঝুঁকি থেকে যায় সব সময়ই।

'একবার রাতের আঁধারে ঢুকলাম এক গাঁয়ে। দু'জন মিলে দেয়ালে গর্ত খুঁড়তে লাগলাম, অপরজন পাহারায় থাকল। ছাগলটা যে নজর রাখার বদলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছিল তা কে জানত। আমরা ওর ওপর ভরসা করে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম্। এমন সময় গাঁয়ের একজন দেখে ফেলল আমাদেরকে। সে গেল লোক ডাকতে। গর্ত খুঁড়ে একটা সুড়ঙ্গ মত তৈরি করে ফেলেছিলাম। সুড়ঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছি, কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম। সঙ্গীকে বললাম অপেক্ষা করতে। তারপর দেখলাম যেখান দিয়ে আমরা ঢুকেছি সেই রাস্তার মুখে জটলা পাকাচ্ছে লোকে। ওরা ভেবেছে ওখান থেকেই বেরুব আমরা। কিন্তু আমার হিসাব ভিন্ন। রাস্তার দিকে গেলামই না। বরং সুড়ঙ্গ ধরে ঢুকে পড়লাম বাড়িতে। দেয়াল টপকে ঢুকে পড়লাম আরেক বাড়িতে। সেখান থেকে আরেক বাড়ি। এভাবে জনতার ধোলাই থেকে রক্ষা পেলাম সেবারে।

'গাঁয়ের লোকে পরে অবশ্য জেনে গিয়েছিল ওই রাতে আমিই গিয়েছিলাম চুরি করতে। আমাকে ঠাট্টার সুরে বলল, "তুমিই তা হলে আমাদের শাহ্'র সর্বনাশ করতে গিয়েছিলে।" আমি বলেছি, "সর্বনাশ করার আর সুযোগ পেলাম কোথায়। বরং ধরা পড়লে তোমরাই আমার সর্বনাশ করে ছাড়তে। পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিতে।"

এরপর একদিন দেশ ভাগ হয়ে গেল। পাঁচ নদীর দেশ ভেঙে দু'টুকরো হলো। হাজার সিংকে তার অতি পরিচিত, অতি প্রিয় গাঁ ছেড়ে হাজারো উদ্বাস্তুর সঙ্গে যেতে হলো কারনালের সীমান্তে। তাকে বলা হলো এও পাঞ্জাব। এখানেও গাঁ আছে, আছে খামার, খাল-বিল। কিন্তু হাজার সিংয়ের কিছুই ভাল লাগল না। নতুন জায়গায় সবকিছু অচেনা ঠেকল। এই অদ্ভুত, অচেনা পরিবেশ কী করে তার নিজের বাড়ি হতে পারে ? ভাবল হাজার সিং।

কয়েক হপ্তা পর আমিও কারনালে পৌঁছুলাম। হাজার সিংকে খুঁজছিলাম। অপরিচিত কারনালে পরিচিত বলতে একমাত্র সে-ই। হাজার সিং আগের মতই আছে। তার দক্ষতা, মেধা, অভিযান-প্রিয়তা, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোনও কিছুর পরিবর্তন

ঘটেনি। তবে ধারণাটা ভুল ছিল। হাজার সিং আমাদের মতই শিকড় থেকে উৎপাটিত, অনেকের মত হারিয়ে গেছে। 'আপনাকে আগের মতই লাগছে, চাচা,' একদিন হাসতে হাসতে বললাম আমি। 'সরকারি কর্মকর্তাদের মত কোনও পরিবর্তন নেই আপনার। ঠিক বলেছি না ?'

'না, ঠিক বলোনি।' গম্ভীর মুখে বলল হাজার সিং। 'আমি আর আগের মত নেই রে, বেটা। আমি কী করে অন্যদের থেকে আলাদা হব ? আমি আমার ভাইদের দুঃখের সমব্যথী।'

'তা ঠিক আছে,' বললাম আমি। 'তবে আপনার মত কাজ জানে ক'জনে ? জানলে কত কিছুই তো করে ফেলত।'

'অঃ তুমি ওই কাজের কথা বলছ ? না, না, আমি এখন ওসব নিয়ে একদম ভাবি না,' চেহারা করুণ দেখাল হাজার সিংয়ের। 'এ জায়গার মাটিতে হাঁটার সময় আমার পা কাঁপে। এখানে কী করব আমি? এখানে বাড়ির সেই পরিবেশ আর কোলাহল কোথায়? কোথায় আমার বন্ধুবান্ধব আর কৃষকের দল? এখানে,' ডানে-বামে মাথা নাড়ল সে, 'আমি কিছুই করতে পারব না।'

বিপদ কিংবা আইনের রক্তচক্ষুও যে হাজার সিংকে তার পেশা থেকে একচুল সরাতে পারেনি, অচেনা নতুন এক পৃথিবী সেই তার মনোবল একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল।

লেখক পরিচিতি

কুলবন্ত সিং ভার্ক (১৯২০-) একজন সাংবাদিক এবং পাঞ্জাবী সৃজনশীল লেখক। তিনি লুধিয়ানায় পাঞ্জাব অ্যাগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি কম্যুনিকেশন সেন্টারের জয়েন্ট ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় ছয় খণ্ডের ছোট গল্প লিখেছেন। এগুলো হলো: চাহা ভেলা (১৯৫০): ধরতি পে আকাশ (১৯৫১): তুরি দি পাউর (১৯৫৪): দুধ দা ছাপ্পর (১৯৫৮): গোহ্লান (১৯৬১) এবং নবীন লোক (১৯৬৮)। নবীন লোক-এর জন্য তিনি ১৯৬৮ সালে সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন।

পরকীয়া

উষা মহাজন

বিকেলের এ সময়ে রেস্টুরেন্টের কোণার দিকের টেবিলগুলো প্রায় খালিই থাকে। সন্ধ্যার দিকে আসতে শুরু করে লোকজন। আজ সন্ধ্যায় গোটা কলকাতার মানুষের যেন চায়ের তেষ্টা পেয়েছে, ভেঙে পড়েছে তারা রেস্টুরেন্টটিতে। লিফট থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্টের প্রবেশ দ্বার পর্যন্ত লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকে কখন টেবিল খালি হবে সে আশায়। অনেকেই লোভাতুর চোখে তাকাচ্ছে ভেতরের দিকে।

'খুব বেশি দেরি করে ফেললাম বুঝি ?' সোফায় বসে পা টানটান করে দিল মধুকর, ট্রাউজারের বাম পকেট থেকে বের করল রুমাল। 'রাস্তায় যা জ্যাম! এই শীতেও ঘেমে নেয়ে গেছি একেবারে।'

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল মধুকর। নীরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মধুকরের কথা শুনে মনে হচ্ছে না মিথ্যা বলছে। ওর চেহারায় শিশুসুলভ একটা ভাব আছে। ইচ্ছে করল শাড়ির আঁচল দিয়ে মধুকরের শরীরের ঘাম মুছে দেয়।

'আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছ কেন?' আদর মাখা গলায় জানতে চাইল মধুকর। লক্ষ করেছে নীরা শাড়ির পাড় মোচড়াচ্ছে দু'আঙুলে ধরে। ওর হাত ধরল মধুকর। ভেতরের আবেগের বিস্ফোরণ ঘটার একটা রাস্তা যেন তৈরী হয়ে গেল নিমেষে। নিজেকে সামাল দিতে পারল না নীরা, মুখ ফস্কে বেরিয়ে এল কথাটা, 'মধুকর, তুমি আমাকে ভালবাস ?'

চমকে উঠল মধুকর, যেন ইলেকট্রিক তারে হাত দিয়ে শক্ খেয়েছে অথবা হিম শীতল বায়ুর একটা ঝাপ্টা বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে। নীরার হাতটা ছেড়ে দিল সে, সোফায় হেলান দিল। 'ওয়েটার আসছে অর্ডার নিতে,' বলে ব্যস্ততার ভান করল।

সরাসরি প্রশ্নে মধুকরের জবাব দিতে অনীহার ভাব অস্বস্তিতে ফেলে দিল নীরাকে। ও এভাবে নির্লজ্জের মত কথাটা কেন বলতে গেল? মনে হলো মোহ মায়ার একটা স্রোত হঠাৎ তার পায়ের নীচে থেকে সরে গিয়ে তাকে বাস্তবের কঠিন পাথরের বুকে ছুঁড়ে দিয়েছে। ভুল করে ফেলেছে, বুঝতে পারছে নীরা। এ জন্য খারাপ লাগছে। বহু বছর ধরে ঘর সংসার করা দম্পতিরাও তো এভাবে একে অপরকে প্রশ্ন করার সাহস

পায় না। আর মধুকরের সঙ্গে অল্প ক'দিনের ওঠাবসায় তার কী অধিকার আছে এভাবে প্রশ্ন করার?

ওদের সম্পর্কে ভালবাসার প্রশ্নটা নীরা উত্থাপনই বা করল কেন? মধুকর তার জন্য সাধ্যের অতীত করে চলেছে। নীরাকে নিয়ে সে শহরের দামী দামী হোটেল-রেস্টুরেন্টে যায় ডিনার এবং লাঞ্চ করতে। আর ছোটখাট কত যে কাজ সে নীরার জন্য করে দিচ্ছে তার হিসেব নেই। তবুও যতবার মধুকরের সঙ্গে তার দেখা হয়, সে মধুকরের চোখের দিকে তাকিয়ে একটা প্রশ্নের জবাবই শুধু খোঁজে।

ঘড়ি দেখল মধুকর। 'নীরা একটা কাজ আছে আমার। ভুলেই গেছিলাম। চারটার সময় বালিগঞ্জে এক রোগী দেখতে যাওয়ার কথা। চলো, ওঠা যাক, আবার একদিন আসব এখানে।' জবাবের অপেক্ষা না করেই সে সোফা ছাড়ল, ঘোষণার সুরে যোগ করল, 'তোমাকে আমি রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে যাব।'

মধুকরের পেছন পেছন রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল নীরা। নিজেকে ওর খুব ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে।

'আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না। আমি একাই ফিরতে পারব।' জোর করে মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল নীরা।

সে রাতে মধুকরের কথা না ভাবার চেষ্টা করল নীরা। জানে আর কখনও মধুকরের মুখোমুখি হতে পারবে না সে। কিন্তু এও জানে এ সম্পর্ক ভেঙে দেয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। মধুকরের কথা মনে আনতে না চাইলেও বারবার আরও বেশি করে মনের আয়নায় ফুটে উঠছে সুদর্শন, নিস্পাপ চেহারাটা। পরদিন সন্ধ্যায় মধুকর যখন তার অসুস্থ স্বামীকে দেখার নাম করে বাসায় এল, নতুন জীবন যেন ফিরে পেল নীরা। নীরার স্বামীর জন্য ফুল নিয়ে এসেছে। নীরা জানে আসলে ফুলগুলো তার জন্যই এনেছে মধুকর। কারণ গ্ল্যাডিওলি তার সবচেয়ে প্রিয় ফুল। সে জানে শেষ পাপড়িটা শুকিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ফুলগুলো ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখবে নীরা।

চলে যাচ্ছে নীরা, মধুকর হালকাভাবে স্পর্শ করল কাঁধ, বিড়বিড় করল, 'গত সন্ধ্যার ঘটনার জন্য দুঃখিত।'

নীরা বুঝতে পারল না মধুকর কেন ক্ষমা চাইছে – তার প্রশ্নের জবাব দেয়নি বলে নাকি নীরাকে চা না খাইয়েই বিদায় দেয়ার কারণে। তবে ও বুঝতে পারছে ওদের সম্পর্কের মধ্যে এমন অপ্রতিরোধ্য একটি ব্যাপার আছে যে মধুকর ওকে দেখতে না এসে পারেনি। হয়তো শীঘ্রি, সেই সময় চলে আসবে যখন নীরা প্রশ্নটা তাকে করবে এবং মধুকর জবাব দেবে, 'হ্যাঁ।'

আশা নিয়েই বেঁচে থাকে মানুষ। তার স্বামীও বেঁচে আছে আশা নিয়ে। বাস দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হয়ে প্যারালাইজড অবস্থায় ঘরে পড়ে আছে নীরার স্বামী। তবু আশা ছাড়েনি। ভাবছে একদিন সে সুস্থ হয়ে উঠবে, পারবে হাঁটা-চলা করতে।

নীরার মনে পড়ল হাসপাতালে শুয়ে তার স্বামী বলেছিল, 'নীরা, আমার মনে হয় না আমি তোমার আর কোন কাজে লাগব। তুমি আমার কাছ থেকে মুক্তি চাও?'

কান্নায় ভেঙে পড়েছিল নীরা। যে মানুষটা ছিল তার জীবনের সবকিছু সে আজ নিঃসাড় এবং অসহায় হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। নীরা তাকে অশ্রু সজল কণ্ঠে আশ্বস্ত করেছিল, 'আর কক্ষনো এমন কথা বলবে না। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। ঈশ্বর যদি তোমার বদলে আমাকে শারীরিক কষ্টটা দিত!'

সময় সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। ভুলিয়ে দেয় প্রতিশ্রুতি। বৃষ্টি হলে মরা গাছে সবুজ পাতা গজায়। গ্রীষ্মের খরতাপে দগ্ধ করা সূর্য ঊষর মরুর বুকে সবুজ তৃণভূমির সৃষ্টি করে। একটা সময় ছিল যখন নীরা উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করত কখন তার স্বামী বাড়ি ফিরবে। এখন তার স্বামী সারাক্ষণ বাড়ি থাকে। আর নীরার মনে হয় তার জীবনে শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই।

মধুকর তার জন্য যা করেছে কীভাবে ভুলবে নীরা? যখন তমসাচ্ছন্ন ছিল ওর জীবন, আশার বিন্দু দেখতে পায়নি কোথাও, মধুকরই তাকে নিয়ে এসেছে আলোয়। নিজেকে অত্যাচারে জর্জরিত করত নীরা। সে যাতনায় উপশমের মলম লাগিয়ে দিয়েছে মধুকর। জিন্দালাশ ছিল নীরা; তাকে জ্যান্ত মানুষ করে তুলেছে মধুকর।

'আমাকে বন্ধু হিসেবে দ্যাখো। তোমার মনের সব কথা আমাকে অকপটে খুলে বলতে পার। দুঃখকষ্টগুলো কারও সঙ্গে ভাগ করতে পারলে মনের বেদনা লাঘব হয়ে যায় অনেকটাই,' বলেছিল মধুকর।

হায়! যদি বুক চিরে দেখালেই বেদনা লাঘব হয়ে যেত! অন্তরের জ্বালার শেষ নেই। এ আগুন কেউ নেভাতে পারে না।

তবে নীরা টের পায় মধুকরের মত অন্য কেউ তাকে বুঝতে পারে না। ওকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনে চলে সে। নিজের মরুভূমিতে মরুদ্যানের ঝলকানি যেন মধুকর, জীবনদানকারী ঝর্নার জল। এর আগে আর কখনও কারও প্রতি এতটা আকর্ষণ অনুভব করেনি নীরা।

গত পাঁচটা বছর একত্রে অনেকটা রাস্তা হেঁটেছে ওরা। ওর চলার রাস্তা করে দিয়েছে মধুকর, শক্ত হাতে ধরে রেখেছে হাত। শহরের সবচেয়ে নামকরা ডাক্তারদের একজন মধুকর। প্রচুর টাকার মালিক সে। টাকা ওড়ায়ও তেমনভাবে। টালিগঞ্জে একটা ঘিঞ্জি বাড়িতে অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে নীরার জীবনযাপন সহ্য করতে পারেনি সে। কলকাতার দক্ষিণে অভিজাত এলাকায় সে নীরার জন্য দামী একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে দিয়েছে। নীরার স্বামীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। নীরা যেন মধুকরের হাতের পুতুল। যেভাবে নাচায়, নাচে। মধুকরের সুখের জন্য সে যে কোনও কিছু করতে প্রস্তুত।

তবে সমস্যা একটা আছে। নীরার সাত বছরের ছেলে অঞ্জল তার 'মধুকর আঙ্কেল'কে সহ্যই করতে পারে না। 'মা, বাবাকে একা বাসায় রেখে আঙ্কেলকে নিয়ে বাইরে যাওয়া তোমার মোটেই উচিত হচ্ছে না।' প্রায়ই এভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে সে। মধুকরের পরামর্শে ও ব্যবস্থায় অঞ্জলকে দার্জিলিংয়ের বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছে নীরা। মধুকরের ছেলেও একই স্কুলে পড়ে। মধুকর সবসময় তার সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে, ভাবতেই গর্বে বুক ভরে ওঠে নীরার। মধুকর নীরার সন্তানকে

নিজের ছেলের মত দেখে। নইলে নিজের ছেলের জন্য মধুকর যা যা করছে অঞ্জলের জন্য তা করতে যাবে কেন? অঞ্জল বোর্ডিং স্কুলে যওয়ার সময় নীরা যে কী কেঁদেছিল! মধুকরই তাকে বুঝিয়ে শান্ত করেছে, ছেলের ভালোর জন্যই তাকে দূরে পাঠানো দরকার।

নীরার স্বামী মধুকরের ব্যাপারটা জানে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ নিয়ে একটা কথাও বলেনি। মধুকর নীরার জন্য এত কিছু করছে!

নীরার মনে হয় ভারী একটা পাথর যেন চেপে বসে আছে তার কাঁধে। ইচ্ছে করে পাথরটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পাড়াপড়শী নীরা আর মধুকরের সম্পর্ক নিয়ে কানাঘুষা করে। পাত্তা দেয় না নীরা।

সেদিন ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটে গেল। মধুকর নীরাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। লিফট নষ্ট। উঁচু সিঁড়ি বাইতে গিয়ে নীরার নাভিশ্বাস উঠে গেল। দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকেছে , ভেসে এল একটা কণ্ঠ, 'নীরা, এদিকে এসো।' ছলাৎ করে উঠল বুকের রক্ত। বহুদিন ওর স্বামী ওর নাম ধরে ডাকে না। বেশিরভাগ সময় প্রয়োজন হলে বলে, 'কেউ আছে?' একটা অজানা ভয় চেপে ধরল ওকে। অসহায়, চলৎশক্তিহীন একটা মানুষ – সে কী করবে নীরার ? স্বামীর ঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল ও। লোকটার চোখে অদ্ভুত একটা আলো জ্বলজ্বল করছে। 'আমার কাছে এসো, নীরা,' ভরাট গলায় ডাকল সে। ভেতরে ঢুকল নীরা। বসল স্বামীর বিছানার কোণে। বিছানার পাশের টেবিল থেকে ছেলের বাঁধানো ছবিটি তুলে নিয়ে সেদিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মানুষটা। তারপর বলল, 'নীরা, একটা অনুরোধ করলে রাখবে?'

নীরা কিছু বলার আগেই যোগ করল, 'অঞ্জলকে বাড়ি নিয়ে এসো। ওকে তোমার সঙ্গে রাখো।' তারপর একটু বিরতি দিয়ে সাদামাঠা গলায় বলল, 'নীরা, তুমি মধুকরকে বিয়ে করছ না কেন? সে তোমাকে ভালবাসে। আমার কথা তোমার না ভাবলেও চলবে!'

পায়ের তলা থেকে যেন সরে গেল মাটি। চোখ তুলে মানুষটার দিকে তাকানোর সাহস হলো না নীরার। 'আমি তোমার খবরের কাগজ নিয়ে আসি।' বলে রান্না ঘরে ঢুকল সে।

বিয়ে? কেন? নারী-পুরুষের সম্পর্কের চূড়ান্ত পরিণতি কি বিয়ে? বিয়েই কি দু'জনকে বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারে? বিয়ের চেয়েও যদি বেশি কিছু থাকে তা হলে সেটা কী? বিবাহিত মধুকর নীরার কাছে আসে কিছু সুখের আশায়। কপালের সিঁথিতে জ্বলজ্বল সিঁদুরের চিহ্নের মানে কি নীরা তার চলৎশক্তিহীন স্বামীর সম্পত্তি? মধুকর তার জন্য কী করেনি? সে নীরার কাছে আসে, কারণ নীরার সঙ্গ সে পছন্দ করে। তার কাছে অন্য কিছু প্রত্যাশা কি খুব বেশি চাওয়া হয়ে যাবে না? এতে কি লোভ প্রকাশ পাবে না? নিজের জায়গা করে দেয়ার জন্য মধুকরকে তার স্ত্রী আর সন্তানকে তাড়িয়ে দেয়ার কথা বলতে পারবে নীরা? ধিক, নীরা ধিক!' এরকম কিছু করার চিন্তা মাথায় আসে কী করে? স্বীকার করতে দ্বিধা নেই সে প্রায়ই স্বপ্ন দেখে মধুকরের হাত ধরে প্রকাশ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সে তো কেবলই স্বপ্ন।

কাঁচ ভাঙার ঝনঝন শব্দে চমকে গেল নীরা। অঞ্জলের বাঁধানো ছবির ফ্রেম হয়তো টেবিল থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙেছে। সে খাবার সাজানো প্লেট নিয়ে দ্রুত চলে এল স্বামীর ঘরে। কাঁপতে লাগল হাত। অঞ্জলের ছবি পড়ে আছে মেঝেতে; তার স্বামীর বাঁ হাত ঝুলছে বিছানার পাশে; মুখে মৃত্যু যন্ত্রণার ছাপ সুস্পষ্ট। প্রাণশূন্য খোলা চোখ জোড়ায় রাগ ফুটে আছে। এ কারণেই কি নীরাকে বিছানার পাশে ডেকে নিয়েছিল ওর স্বামী? বুক ফাটা কান্না এল নীরার। তীব্র অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মনে হলো নিজের শরীরের একটা অঙ্গ কেটে ফেলে দিয়েছে।

পড়শীরা নীরার আর্তনাদ শুনে ছুটে এল। নীরা জানে না রাতটা কীভাবে কেটেছে। মধুকরকে খবর দেয়ার চেষ্টা করল। কেউ জানে না সে কোথায়। প্রতিবেশীরাই দাহ'র ব্যবস্থা করল।

জীবনে প্রথমবারের মত নীরা টের পেল অসহায়, প্যারালাইজড্ ওই মানুষটা তার কাছে কী ছিল, তার কাছে সে কতটা নিরাপদ ছিল। একা কী করে বাঁচবে নীরা? এখন যদি মধুকর আসত, তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলত, 'নীরা, নিজেকে একা ভাবছ কেন তুমি? আমি সবসময় তোমার সঙ্গে আছি। তুমি বিধবা নও। আমি তোমাকে সবকিছু থেকে রক্ষা করব। আমি এখন থেকে তোমার স্বামী।'

সিধে হলো নীরা। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কাঁদতে কাঁদতে ফুলে গেছে চোখ। আলুথালু কেশ; কপালের বিন্দি চিহ্নটা লেপ্টে গেছে। মুছতে ইচ্ছে করল না। গত কয়েক বছর ধরে মধুকরকে খুশি করার জন্য ওখানে বিন্দি লাগিয়েছে সে। বাক্স থেকে অল্প সিঁদুর বের করল নীরা। কাঁপা হাতে টিপ দিল কপালে।

নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলনা ও। ভয়ে ভয়ে ফোন করল মধুকরের বাড়িতে। আগে কোনওদিন এ কাজ করেনি। মধুকরের বউ ফোন ধরল।

'নীরা বলছি। মধুকর আছে? খুব দরকার তাকে।'

একটু বিরতির পর তীব্র বিষমাখা কণ্ঠটি জবাব দিল, 'সবকিছু দখল করেও তোমার তৃপ্তি হয়নি? নাকি এখন আমার সংসারটাও দখল করতে চাইছ? ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে একা থাকতে দাও।' খটাশ করে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনল নীরা।

রাগে গা জ্বলে গেল নীরার। মহিলার স্বামীর ওপর যদি এতই দরদ তা হলে মধুকরকে সে ভালবাসার বন্ধন দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে না কেন? মধুকরের স্ত্রীর উপস্থিতি যেন প্রথমবারের মত টের পেল নীরা। অসহায় লাগল নিজেকে।

পরদিন সকালে এল মধুকর। ওকে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে মন চাইল নীরার, ইচ্ছে করল প্রশস্ত বুকে মাথা রেখে বুক খালি করে কাঁদে। কিন্তু নিজের জায়গা থেকে কেন এক কদমও নড়তে পারল না জানে না নীরা। জানে না মধুকরের চোখে অনিশ্চিত দৃষ্টি ফুটে থাকার কারণ। যেন মধুকর কিছু বলতে চাইছে কিন্তু সঠিক শব্দগুলো খুঁজে পাচ্ছে না।

অবশেষে নীরাই ভাঙল নীরবতা। 'কোথায় ছিলে তুমি?'

'শহরের বাইরে গেছিলাম। হঠাৎ যেতে হলো। আমি আরও আগে তোমার বাসায় আসতাম। কিন্তু তুমি আমার বাড়িতে ফোন করে বসলে – জানি না কেন। আমার স্ত্রী খুব রাগ করেছে, কান্নাকাটি করে বিশ্রী অবস্থা। পরিস্থিতি সামাল দিতে গতকাল আর বেরুইনি।'

মধুকর আসতে পারেনি কারণ......

গত কয়েক বছর ধরে তিলতিল করে জমিয়ে রাখা ভালবাসা আর ধৈর্যের ঘরটা হঠাৎ যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। আশায় বোনা সুতোর জাল ছিঁড়ে গেল অকস্মাৎ। এই সত্যটা জানার জন্যই কি সে মধুকরকে দেহমন উজাড় করে দিয়েছিল?

প্রচণ্ড ভারী নিরবতার একটা পাথর নেমে এল ঘরে। স্বামীর মৃত্যুর পরে যে অন্ধকার পর্দাটা ঘিরে ধরেছে নীরাকে, তারচেয়েও নিকষ কালো কিছু একটা যেন গ্রাস করল ওকে। চোখ ফেটে বেরিয়ে এল জল, ফোটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ল হাতে। মুখ ঘুরিয়ে জানালায় তাকাল নীরা। সূর্য পাটে বসছে। ভারী পর্দা ফেলা আবছা আঁধার ঘরে বসে মধুকর দেখতে পেল না নীরার অশ্রুসজল চোখে আরেকটি সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আরেকটি শবযান চলে যাচ্ছে ওই দুই চোখে।

শাড়ির আঁচলের খুঁট দিয়ে কপাল থেকে ঘষে বিন্দি মুছে ফেলল নীরা। চেয়ারে বাড়ি মেরে ভাঙল হাতের চুড়ি। বাঁধ ভাঙা কান্নার জোয়ার ভাসিয়ে দিল তাকে। মধুকর বুঝতে পারল না নীরার কী হয়েছে। চুড়ির ভাঙা কাঁচে হাত কেটে গেছে নীরার, রক্ত ঝরছে। মধুকর এগিয়ে এল তাকে সান্ত্বনা দিতে। 'নীরা, শান্ত হও। শীঘ্রি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়াও, তোমার হাতে ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি।' সে ফার্স্ট-এইড কিট আনতে ছুটল।

কাঁদল নীরা। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে চলল। শেষে হাঁপিয়ে উঠল। মধুকর অনেকক্ষণ বসে থাকল ওর পাশে। বুঝতে চেষ্টা করছে হঠাৎ কী হলো নীরার। যাওয়ার সময় বলল, 'নীরা, একটু বিশ্রাম নাও। তুমি আজ আর নিজের মধ্যে নেই। আমি কাল আবার আসব।'

শূন্য দৃষ্টি নীরার চোখে। মধুকর চলে যাচ্ছে, ফিরেও দেখল না।

পরদিন এল মধুকর। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ল দরজায়। শুধু কান্নার শব্দ শুনতে পেল। খুলল না দোর। ফিরে গেল মধুকর গজরাতে গজরাতে, 'মেয়েটা এখনও মৃত স্বামীর জন্য শোক করছে। বোধহয় তাকে ভালবাসে সে।

লেখক পরিচিতি

১৯৪৮-সালে জন্ম উষা মহাজনের। তিনি পেশায় একজন সাংবাদিক এবং হিন্দি ভাষায় বেশ কিছু ছোট গল্পও রচনা করেছেন। এ সব গল্প ছাপা হয়েছে সারিকা, ধর্মযুগ, রবিবার, হংস, নবভারত টাইমস, জনসত্য ইত্যাদি পত্রিকায়। তিনি খুশবন্ত সিংয়ের বহুল আলোচিত উপন্যাস 'ট্রেন টু পাকিস্তান' হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করেন।

দৌড়

বলবন্ত গার্গি

নিচু ছাদের একটি মাটির ঘরে বসে কৃষকরা আলোচনা করছিল কীভাবে তাদের জরুরী বৈঠকের কথা সবগুলো গাঁয়ে পৌছে দেয়া যায়। আমার কাছে পরামর্শ চাইল কী করবে। আমি কোনও বুদ্ধি দিতে পারলাম না।

এমন সময় নিচু, ভীরু একটি কণ্ঠ আমাদের চমকে দিল। 'আমাকে বার্তাটা দিন। আমি পৌছে দেব।' ছেঁড়া একটা জামা আর তাপ্পি মারা গাজর রঙা হাফপ্যান্ট পরা বছর কুড়ির বলিষ্ঠ গড়নের এক তরুণ কথাটা বলেছে।

'কোন্ গ্রামে দিয়ে আসবে ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সবগুলো গাঁয়ে।' জবাব এল।

'সবগুলো গাঁয়ে ! তুমি কি জানো বৈঠক কালই ?'

'আজ্ঞে। জানি।' বলল সে। সব মিলে দশ-বারোটা গাঁ... ষাট মাইলের বেশি হবে না দূরত্ব। ও আমি কয়েক ঘণ্টায় চক্কর দিয়ে ফেলব।'

একি ঠাট্টা করছে, নাকি সত্যি পারবে বলছে ? আমি ভাল করে তাকালাম ছেলেটার দিকে। ওর মোটা ঠোঁট জোড়া যেন সদ্য চাষ করা জমির হাল, তার ওপরে নীলচে গোঁফের রেখা মিশেছে গালের খোঁচা দাড়ির সঙ্গে। লম্বা ঘাড়, চিতা-বাঘের মত সরু পেট এবং ব্রোঞ্জের ঢালের মত গোল হাঁটু। পায়ের ডিম বা গুলে কোনও লোম নেই, শুধু একজোড়া ময়ূরের ছবি উল্কি করা। চোখ জোড়া নিস্প্রভ। এ ছেলে কী করে কয়েক ঘণ্টায় ষাট মাইল রাস্তা পাড়ি দেবে ? আমাদের কথার মাজেজা কি বুঝতে পেরেছে আদৌ ? বাদামি দাড়িঅলা ইন্দর সিং শক্ত হাতে আমার কাঁধ খামচে ধরে বলল, 'এ হলো বুটা সিং... ভাগু গ্রামের। ওকে চেনেন না ? ও এক দৌড়ে একশো মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে পারে।'

'একশো মাইল ?'

'হ্যাঁ। একশো মাইল। ও যখন ছোটে মনে হয় পেছনে ঝোড়ো বাতাস রেখে যাচ্ছে...'

'একশো মাইল !' বিস্ময় কাটছে না আমার।

'বুটা সিংয়ের নাম শোনেননি কখনও ?' জিজ্ঞেস করল ইন্দর সিং।

'না। শুনিনি।'

'বুটা হলো রাখুর ছেলে,' শুরু করল ইন্দর সিং। 'আমার গাঁয়ের লোক। বুটার জন্মের পর তার মা তাকে একটা ঝুড়িতে রেখে মাঠে যেত লাঙল দিতে। মাঠের কোণে একটা ভাঙা খড়ের ঘরে থাকত ওরা। বুটার বাবা শেয়াল, খরগোশ আর ফেজান্টের হাত থেকে শস্যের খেত রক্ষার জন্য সবসময় পাহারা দিত। শীতের এক রাতে নিউমোনিয়া বাধিয়ে টেঁসে যায় বাপ। রাখু তার ছোট ছেলেকে নিয়ে মাঠের ধারেই থাকত। এক বেদে দলের কাছ থেকে পাহাড়ি একটা কুত্তার বাচ্চা কিনে নিয়েছিল রাখু। বাচ্চাটা শীঘ্রি জোয়ান মর্দে পরিণত হয়। তার সঙ্গে বেড়ে ওঠে বুটাও। সে কুত্তাটার লেজ মুচড়ে দিত, জানোয়ারটা কেঁউ কেঁউ করে উঠত, লাফাত-ঝাঁপাত, খেলা করত বুটার সঙ্গে।

'বুটার ছেলেবেলা কেটেছে উট, ঘোড়ার বাচ্চা, খেঁকশিয়াল আর কাঠবিড়ালী তাড়া করে। ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে সে খরগোশ তাড়া করত। সঙ্গে ছুটত কুত্তাটা। এতই ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে বুটার গতি, দৌড়ে ধরে ফেলতে পারত খরগোশ, ছেড়ে দিয়ে আবার তাড়া করত ওটাকে। একটা খরগোশ এক টানা চার মাইল দৌড়াতে পারে, শেয়াল পারে আট মাইল, ঘোড়া চল্লিশ মাইল আর উট পঞ্চাশ মাইলের বেশি পারে না। তবে বুটা একশো মাইল রাস্তা পার হতে পারে....'

'একশো মাইল পার হতে তার কত সময় লাগে ?' জানতে চাইলাম আমি।

'বারো ঘণ্টা। ঘোড়া বুটার চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারে সন্দেহ নেই তবে একটানা একশো মাইল পথ পাড়ি দেয়া তার পক্ষেও সম্ভব নয়।'

আমার দিকে তাকাল ইন্দর সিং। বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কাগজপত্র ওর হাতে দিয়ে দিন। কাল সকালের মধ্যে সে যথাস্থানে পৌঁছে দেবে ওগুলো।' বুটার দিকে ফিরল সে। 'বুটা, বেটা ! এই কাগজগুলো নাও। সবগুলো গাঁয়ে পৌঁছে দিয়ো। যাও, আমার সিংহ।'

বুটার হাতে কাগজ দিয়ে কোন্ কোন্ গ্রামে যেতে হবে তার নাম বলল ইন্দর সিং। কার কাছে পৌঁছে দিতে হবে বার্তা তাও খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিল।

পরদিন কৃষকদের সংঘের নেতারা বৈঠকের জন্য নির্ধারিত সময়ে হাজির হয়ে গেল। আমি আলাদা ভাবে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলাম তাকে মেসেজ কে পৌঁছে দিয়েছে। সবাই একই জবাব দিল, 'বুটা।'

বৈঠক শেষে উকিল কুমার সাইন, অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার যুগল কিশোর, বিচারপতি আজমির সিং-সহ কয়েকজন বসলাম বুটাকে ঘিরে। কথা বললাম ওর সঙ্গে। আমাদের আফসোস লাগল ভেবে এরকম একটি প্রতিভার কথা গাঁয়ের বাইরের কেউ

জানে না। 'বুটা লন্ডন গিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতায় যদি অংশ নিতে পারত, আমি নিশ্চিত পৃথিবীর মানচিত্রে ভাগু গ্রামের নামটা সে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখত।' ঘোষণা করলেন হেডমাস্টার।

'আমাদের দেশে প্রতিভার অভাব নেই,' যোগ করলেন কুমার সাইন। 'আমাদের বড় বড় সাঁতারু, কুস্তিগীর এবং শিকারী আছে। অথচ এদের কথা কেউ জানে না। এদের প্রতিভার বেহুদা অপচয় হচ্ছে।'

'বুটা টানা একশো মাইল দৌড়াতে পারলে বিশ্বখ্যাত হওয়া থেকে তাকে ঠেকায় কে?' সায় দিলেন বিচারক।

সামরিক বাহিনীর এক হাবিলদার বলল, 'পাতিয়ালার মহামান্য রাজা খেলাধুলা খুব পছন্দ করেন। আমরা কোনওভাবে খবরটা তাঁর কানে পৌছে দিতে পারলে মহারাজা বুটাকে নির্ঘাত আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক টুর্নামেন্টে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।'

এক চোখো, ধূর্ত এক দলিল লেখক বলল, 'কেউ কি পরীক্ষা করে দেখেছে বুটা সত্যি একশো মাইল দৌড়াতে পারে কিনা?

টাক মাথা এক দোকানদার বুটাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সন্দেহের সুরে বলল, 'চাষারা দূরত্বের মাত্রা ঠিকমত মাপতে জানে না। কেউ ত্রিশ মাইল দৌড়ালে মনে করে একশো মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে।'

'আমাদের গাঁয়েই একটা দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করি না কেন,' প্রস্তাব দিলেন হেডমাস্টার। 'বড় ফসলের মাঠটা প্রায় ৪৪০ গজ লম্বা। বুটা এ মাঠে চারশোবার চক্কর দিলেই তার একশো মাইল দৌড়ানো হয়ে যাবে। ওর দৌড় দেখে আমরাও মজা পাব। তারপর ওর ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।'এ প্রস্তাবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সবাই।

আমি বুটাকে জিজ্ঞেস করলাম সে মাঠে দৌড়াতে রাজি কিনা। চোখ পিটপিট করে নিরাসক্ত গলায় জবাব দিল, 'আপনারা যা বলেন।'

ঢোলক মারু ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করল খবরটা, 'ভায়েরা শোনো! রবিবার সকাল সাতটায় বিখ্যাত দৌড়বিদ বুটা সিং একশো মাইল দৌড়ে নামবে। গাঁয়ের সবাইকে বড় মাঠে হাজির হয়ে এই আশ্চর্য দৌড় দেখার আমন্ত্রণ রইল।' দ্রিম! দ্রিম! দ্রিম!

রোববার খুব সকালে মাঠে ভিড় জমে গেল। সবাই বুটার আশ্চর্য দৌড় দেখতে এসেছে। বুটার পরনে খদ্দরের একটা হাফপ্যান্ট, আগুনরঙা রুমালে বেঁধে নিয়েছে লম্বা চুল। খুলির ওপর খোপার মত দেখাচ্ছে। কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় রেফারীর ভূমিকায় হাজির হয়ে গেলেন অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার। বাঁশিতে ফুঁ দিলেন তিনি। শুরু হয়ে গেল বুটার একক দৌড় প্রতিযোগিতা।

সকাল আটটা পর্যন্ত লোক সমাগম হতে থাকল। হেডমাস্টার বসে বসে দেখছেন বুটা একই গতিতে বড় মাঠ একের পর এক চক্কর দিয়ে চলেছে। মহিলারা মাঠের এক কোণে বসে মাথায় আঁচল দিয়ে সংসারের গালগল্প করছে আর দেখছে বুটার দৌড়।

দুপুরের দিকে বিরতি দিল বুটা। ঢোলক বুটার জন্য এক জগ দুধ নিয়ে এসেছিল। দুধ পান করল সে, বদলে ফেলল ঘামে শরীরের সঙ্গে এঁটে যাওয়া হাফপ্যান্ট। চুল আঁচড়ে নিয়ে মাথায় চুড়ো করল, তারপর রুমাল দিয়ে বেঁধে নিয়ে আবার শুরু করল দৌড়। সন্ধ্যা পর্যন্ত দৌড়াল সে। সাড়ে ছ'টায় শেষ হলো তার চারশো রাউন্ডের চক্কর। নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা আগেই দৌড় শেষ করেছে সে। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। বুটার চুল আর আগুন রঙা রুমালে সূর্যের বিদায়ী আবির, পালকের মত জ্বলছে। বুটার বুক ঘনঘন ওঠানামা করছে, তামাটে শরীরে ঘামের বন্যা।

জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল। হাততালি দিচ্ছে। দু'জন ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে এগোল বাজারের দিকে। খবরটা বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে। বুটা বলল, 'সবই ওপরঅলার ইচ্ছা। তার শক্তি আমার হাড়ের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এ কারণেই একশো মাইল দৌড়াতে পেরেছি।'

স্থানীয় একটি পত্রিকায় খবরটা ছাপতে দিলাম আমরা। পরিকল্পনা করলাম মহামান্য রাজার সঙ্গে বুটার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

তিন দিনের দিন বুটার মা এল গাঁ থেকে। বয়স ষাটের কোঠায়, শক্তপোক্ত গড়নের কৃষক নারী। ছেলের মতই মোটা ঠোঁট, ছোট ছোট ঝাপসা চোখ। সে ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছে। আমরা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম বুটার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমাদের কথায় আমল দিতে চাইল না বৃদ্ধা। বলল, 'আমি একা খামারের দিকে নজর দিতে পারি না, বাপু। ক্ষেত থেকে কে শেয়াল আর খরগোশ তাড়াবে? বুড়ো কুকুরটা মরে গেছে। আমার ছেলে ছাড়া কেউ নাই। আমি ওকে ছাড়া থাকতে পারব না।'

'বুড়ি মা, তোমার ছেলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে আর তুমি তাকে আঁচলের তলায় লুকিয়ে রাখতে চাইছ ! ওর থাকা উচিত শহরে, অজপাড়াগাঁয়ে নয়। পৃথিবীর মানুষ ওকে চিনবে। তুমি ওর জীবনের উন্নতির জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছ। এমন স্বার্থপর আর বোকার মত আচরণ কোরো না। ওকে আমাদের কাছে ছেড়ে দাও।' অনুনয় করলাম আমরা।

আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল সে। তবে চেহারা দেখে মনে হলো না বিশ্বাস করেছে। ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল বুড়ি, 'আমি আমার ছেলেকে ছাড়া থাকতে পারব না। ওকে নিয়ে যেতে এসেছি। নিয়ে যাবই।'

বিচারক যখন বললেন মহামান্য রাজার সঙ্গে বুটার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, রাজি হলো বৃদ্ধা। 'দুশ্চিন্তা কোরো না, মা,' বলল বুটা। 'আমি কিছুদিনের মধ্যেই সাত সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশে যাব। লন্ডনে একশো মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতব। সারা পৃথিবীর মানুষ আমাকে চিনবে। আমি ধনী হয়ে ফিরে আসব গাঁয়ে। শুধু লন্ডন যাওয়ার একটা সুযোগ পেলেই হলো।'

পরদিন নিজের বাড়ি ফিরে গেল বুড়ি ছেলেকে রেখে।

শহরের প্রান্তে বিচারকের বাড়ি। বুটাকে তাঁর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হলো। বিচারক তাঁর বন্ধুদের নিয়ে বিকেলে তাস খেলেন আর বুটা বারান্দায় বসে থাকে একা নিজের ভাবনায় মগ্ন হয়ে। আমরা দুটো চিঠি পাঠিয়েছি। একটা পাতিওয়ালার স্পোর্টস কর্মকর্তার কাছে, অন্যটি মহারাজাকে। তাঁদের জবাবের অপেক্ষা করছি। সকাল বেলা বুটা লম্বা লম্বা পা ফেলে ডাকঘরে যায় বিচারকের চিঠিপত্র নিয়ে আসতে। মাঝে মাঝে বিকেলে সে বাজারে যায় পান, সিগারেট কিংবা লেবু কিনতে, বিচারকের তাসখেলার সঙ্গীদের জন্য। যারা বিচারকের বাড়ি আসে বেড়াতে তারা বুটাকে দেখে কেমন ঝিম মেরে আছে ছেলেটা। আগের সেই তেজ যেন নেই শরীরে। এভাবে তিন হপ্তা গেল। বুটার মনে হলো তিন মাস।

একদিন সে আমাকে বলল, 'স্যার, আমি এক লোককে চিনি। সে এক সময় পাতিয়ালার মহারাজার দরবারে কাজ করত। এখন ফরিদকোটে আছে। মহারাজার সঙ্গে তার ভাল খাতির। তার কাছে গেলে সে মহারাজার সঙ্গে আমাকে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। তারপর আমি বিদেশ যেতে পারব।'

এক হপ্তা পর ফরিদকোটে গেল বুটা।

এর কিছুদিন পর শুনলাম পাতিয়ালা গেছে বুটা। নানাজনকে ধরে সে নাকি মহারাজার ব্যক্তিগত কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করেছে। লোকটা তাকে মহামান্যের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে।

এ ঘটনার কিছুদিন পর দেশ ভাগ হয়ে গেল। আমি চলে এলাম দিল্লি। বুটার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রইল না।

১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়। উপ প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল তখন দেশ ভ্রমণ করছেন, বৈঠকে বসছেন যুবরাজদের সঙ্গে।

আমি ওইদিন পাতিয়ালায় ছিলাম। বিরাট শোভা যাত্রা। সর্দার প্যাটেল এবং মহারাজা খোলা একটি গাড়িতে পাশাপাশি বসেছেন। নানা রঙের পাগড়ি মাথায় লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। ভিড়ের মধ্যে বুটাকে দেখতে পেলাম। সামরিক বাদকরা ঝকমকে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে আগে আগে চলেছে, পেছনে মহারাজার গাড়ি এগোচ্ছে ধীর গতিতে। দৃশ্যটা দেখছে বুটা।

বুটার কাছে এগিয়ে গেলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম সাক্ষাৎকারের কী হলো। বলল, 'এ মুহূর্তে রাজা রাজ্য সংক্রান্ত জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ততা একটু কমলেই ওঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

দিল্লী ফিরে এলাম আমি। তারপর দু'বছর আর বুটার সঙ্গে দেখা নেই। যদিও ওর খবরাখবর পাচ্ছিলাম। সে সাক্ষাতের জন্য এখনও অপেক্ষা করছে পাতিয়ালায়। কিন্তু মহারাজার ব্যস্ততা কমছে না কিছুতেই। মহারাজার ব্যক্তিগত কর্মচারী বুটাকে

পাতিয়ালায় একটা চাকরি দেয়ার কথা বলেছে। বুটা বলেছিল সে গাঁয়ে ফিরে যাবে। কর্মচারী বলেছে গাঁয়ে গিয়ে অলস সময় না কাটিয়ে বুটা ইচ্ছা করলে পাতিয়ালার চাকরিটা নিতে পারে, এতে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হবে এবং অলিম্পিকে যেতে পারবে বুটা। বুটা এ সুযোগ হারাতে চাইল না। রাজকীয় রান্নাঘরের দরোয়ানের চাকরিটা নিল। বেতন যদিও খুবই কম। অবশ্য ওর করার মত কাজও নেই তেমন। সারাদিন একটা টুলে বসে থাকা আর হাই তোলা। মাঝে মাঝে বাগানে ঘুরে বেড়ায় বুটা।

বুটার মা আবার এল ছেলেকে গাঁয়ে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য। কিন্তু শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়া বুটা ফিরিয়ে দিল তার মাকে। বলল নানা কারণে মহারাজার সাক্ষাৎ পেতে দেরি হচ্ছে বটে, তবে তাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে একবার লন্ডন যেতে পারলেই। বুড়িকে সে গত তিন মাসের বেতন দিয়ে দিল। আঁচলে টাকাটা বেঁধে গাঁয়ে ফিরল মা।

বুটা তার চাকরি নিয়েই থাকল। বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। কাঁহাতক আর পাথর হয়ে বসে থাকা যায়? তার ইচ্ছে করে বাজারে যেতে, ঘুরে বেড়াতে। একদিন সারাদিন সে ডিউটি করল না। সাথে সাথে নালিশ চলে গেল ম্যানেজারের কাছে, সেখান থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে, ডেকে পাঠানো হলো বুটাকে। তীব্র ভৎর্সনা করা হলো। হুমকি এল আবার এ রকম কান্ড করলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে তাকে। তা হলে আর কোনওদিন অলিম্পিকের খেলায় অংশ নিতে পারবে না বুটা।

ভয় পেল বুটা। চোখ পিটপিট করে জানাল এমন কাজ সে আর জীবনেও করবে না। তারপর থেকে সে সর্তক এবং নিয়মানুবর্তি হয়ে গেল।

বছরখানেক পরে আমি আবার পাতিয়ালায় গেলাম বিচার বিভাগের একটি মামলার সাক্ষী হতে। ক্লান্ত একটি দিন শেষে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, অপেক্ষা করছি, গাড়ির জন্য, একটা সাইকেল-রিকশা দেখতে পেলাম। ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে এদিকেই।

রিকশার পাশে লাঠি হাতে হাঁটছে এক বৃদ্ধা। রিকশার কাছে আসতে লক্ষ করলাম ভেতরে বসে আছে বুটা। পরনে খাকি হাফপ্যান্ট, পায়ে চকচকে একজোড়া চামড়ার জুতো। শার্ট এবং পাগড়িটা নতুন। আমাকে দেখে হাসল সে। চালক রিকশা থামাল।

'কেমন আছ, বুটা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে আর আপনাদের আশীর্বাদে ভালই আছি। ধন্যবাদ।' জবাব ছিল সে। 'মহামান্য রাজা এখন চাইলে, তাঁর গরমের ছুটি কাটানোর প্রাসাদে আছেন। উনি ওখান থেকে ফিরে এলেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার নাম তালিকায় সবার উপরে... শুনেছি আসছে শরতে লন্ডনে খেলার একটা দল যাচ্ছে। আশা করি দলটার সঙ্গে আমিও যেতে পারব...'

ওর দিকে তাকালাম আমি। জানতে চাইলাম রিকশা করে কোথায় যাচ্ছে।

বুড়ি মানে বুটার মা বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গুঙিয়ে উঠল, 'কী বলবরে বাপ! আমার বুটা ছিল পাখির মত মুক্ত। দারোয়ানের টুলে সারাক্ষণ বসে থাকা কী ওর পক্ষে সম্ভব? সারাদিন টুলে বসে থাকতে থাকতে ওর উরু আর হাঁটুতে রক্ত জমে গেছে। দ্যাখো, কেমন ফুলে গেছে পা জোড়া! হা ভগবান, আমার বুটার এখন কী হবে!'

বুকে চাপড় দিয়ে কেঁদে উঠল বৃদ্ধা, 'পা সারাতে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।'

বুটার হাঁটু দেখলাম আমি। ঢালের মত হাঁটু ফুলে ঢোল হয়ে আছে।

বুনো চোখের দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকাল বুটা। বলল, 'ডাক্তার বলেছেন ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি দিয়ে আমার চিকিৎসা করবেন। এক সপ্তাহর মধ্যে আমার হাঁটু সেরে যাবে। আমি আবার দৌড়াতে পারব। তারপর, স্যার, আমি লণ্ডন যাব। একশো মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেব...'

রিকশাটা ধীর গতিতে আবার চলতে লাগল। আমি মা আর ছেলে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকলাম।

লেখক পরিচিতি

বলবন্ত গার্গির জন্ম ১৯১৬ সালে। তাঁর অনেক পরিচয়- তিনি একজন চিত্রনাট্যকার, নাট্য নির্দেশক এবং চিত্র নির্মাতা। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভারতীয় নাট্যকলা বিভাগ খোলেন। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত প্রথম নাটক 'লোহাকূট' গার্গিকে নাট্যকার হিসেবে জনপ্রিয় করে তোলে। তাঁর শক্তিশালি নাটকের মধ্যে রয়েছে কোয়ারি তিসি, ধুনি দি আগ, সুলতানা রাজিয়া এবং নিম দে পার্ট্রে। বিতর্কিত আত্মজীবনী 'ন্যাকেড ট্রায়াঙ্গল' তাঁকে ভারতীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পরিচিতি এনে দেয়। ১৯৬২ সালে তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন আর ১৯৭৩ সালে অর্জন করেছেন পদ্মশ্রী।

পাগল বিনিময়

সাদাত হাসান মান্টো

ভারত উপমহাদেশ ভাগ হওয়ার কয়েক বছর পরে পাকিস্তান এবং ভারত সরকারের মাথায় এল যেহেতু তারা দু'দেশের মধ্যে কুখ্যাত অপরাধীদের বিনিময় করেছেন, কাজেই এবার দু' দেশের পাগলদেরও বিনিময় করা উচিত। এর মানে হল, ভারতের পাগলা গারদে যেসব মুসলমান পাগল আছে তাদেরকে পাঠানো হবে পাকিস্তানে এবং পাকিস্তানের উন্মাদ হিন্দু এবং শিখদেরকে হস্তান্তর করা হবে ভারতের কাছে।

এটা সুস্থ সিদ্ধান্ত ছিল কিনা তা আমরা জানি না। তবে জ্ঞানী গুনীরা বলেন পাগল বিনিময়ের চূড়ান্ত চুক্তি এবং তাতে দস্তখতের আগে দু' দেশের সর্বোচ্চ মহলের আমলাদের মধ্যে নাকি বেশ কয়েকবার বৈঠক হয়।

পাগল বিনিময়ের সংবাদ লাহোরের পাগলা গারদে পৌছার পরে সেখানে বেশ একটা হুলস্থূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। জমিন্দার পত্রিকার নিয়মিত পাঠক এক মুসলিম রোগীকে একজন জিজ্ঞেস করল,' মৌলভী সাব, এই পাকিস্তানটা কি জিনিস ?' সে অনেক ভেবে চিন্তে জবাব দিল,'এটা ভারতের একটা জায়গা যেখানে ওরা দাড়ি কামানোর ব্লেড তৈরি করে। এক শিখ পাগল অপরজনকে জিজ্ঞেস করল,' সর্দারজী, আমাদেরকে কেন ভারত পাঠানো হচ্ছে, আমরা তো ওদের ভাষা বলতে পারি না।' সর্দারজী হেসে জবাব দিল, 'আমি হিন্দুস্তানিদের ভাষা বুঝি।' সে ভাষার পান্ডিত্য বোঝাতে একটা কবিতা আউড়ে ফেলল :

হিন্দুস্তানিদের মনে খালি শয়তানি
তারা গৃহপালিত মুরগীর মত গটগট করে হাঁটে

একদিন সকালে এক পাগল মুসলমান 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে এত জোরে স্লোগান দিল যে চিৎকারের জোশে সে মেঝেতে পা পিছলে আলুর দম হয়ে গেল। অজ্ঞান।

পাগলা গারদের কিছু বাসিন্দা কিন্তু সত্যিকারের পাগল ছিল না। এরা ছিল খুনে। তাদের আত্মীয়স্বজন ওদেরকে পাগল সাজিয়ে ফাঁসির দড়ি থেকে রক্ষা করে। ওদের ধারণা ঠিক পরিষ্কার নয় কেন ভারত ভাগ করা হলো আর পাকিস্তান কি জিনিস। এরা আসল সত্য খুব কমই জানত। খবরের কাগজে খুব কমই তথ্যবহুল প্রতিবেদন ছাপা হতো আর কারারক্ষীগুলো এত গর্দভ যে কি বলে তা বোঝা দায়। এদের কথা শুনে

একজন যেটুকু সার সংক্ষেপ উদ্ধার করতে পারল তা হলো মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নামে এক লোক আছে যাকে কায়েদে আযম নামেও সবাই চেনে। আর এই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ওরফে কায়েদে আযম মুসলমানদের জন্য আলাদা একটা দেশ বানিয়েছেন যার নাম পাকিস্তান।

কেউ জানে না এই পাকিস্তান কোথায় কিংবা এর বিস্তৃতি কতদূর। এ কারণে যারা পুরো পাগল ছিল না তারাও সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেল ভাবতে গিয়ে যে তারা পাকিস্তানে রয়েছে নাকি ভারতে। আর তারা যদি পাকিস্তানেই থাকে তাহলে ভারত বলে পরিচিত দেশটির সাথে এর পার্থক্য কতটুকু?

এক বেচারা মুসলমান পাগল ভারত-পাকিস্তান আর পাকিস্তান-ভারত নিয়ে কথা শুনতে শুনতে এমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল যে তার দশা আগের চেয়ে শোচনীয় হয়ে উঠল। একদিন ঝাড়ু দিয়ে ঝাট দেয়ার সময় পাগলামিতে পেয়ে বসল তাকে। সে ঝাড়ু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তরতর করে উঠে পড়ল একটা গাছে। গাছের ডালে বসে পরবর্তী দু' ঘন্টা সে ভারত-পাকিস্তানের সমস্যা নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে গেল। রক্ষীরা এসে তাকে গাছ থেকে নামানোর চেষ্টা করতে গেলে সে মগডালে উঠে বসল। রক্ষীরা তাকে হুমকি দিলে সে বলল.'আমি ভারত কিংবা পাকিস্তান কোথাও যেতে চাই না। আমি যেখানে আছি সেখানে অর্থাৎ এই গাছের মগডালেই থাকতে চাই ।'

কিছুক্ষণ পরে তার পাগলামির মাত্রা কমে এলে লোকটাকে নিচে নামিয়ে আনা হলো। সে নিচে নামা মাত্র তার হিন্দু এবং শিখ বন্ধুদের জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ কান্না জুড়ে দিল। তার মনে চিন্তা এসেছে তার বন্ধুরা তাকে ছেড়ে ভারতে চলে যাবে।

পাগলা গারদের আরেক বাসিন্দা, রেডিও ইঞ্জিনিয়ার-এ মাস্টার্স করা। সে অন্যদের চেয়ে নিজেকে আলাদা ভাবত। বাগানের এক কোনায় হাঁটাহাঁটি করে কাটিয়ে দিত দিন। হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল তার । পরনের সমস্ত জামা কাপড় খুলে ধরিয়ে দিল হেড-কনেস্টবলের হাতে। তারপর পুরো আদম হয়ে হাঁটতে লাগল বাগানে।

আরেক মোটাসোটা পাগল ছিল এখানে, মুসলিম লীগের নেতা ছিল একসময়। দিনে পনের/ষোলবার গোসল করে সে। হঠাৎ গোসল করা একেবারেই বাদ দিয়ে দিল সে।

এক মোটু মুসলমানের নাম মোহাম্মদ আলী, একদিন নিজের সেল থেকে সে ঘোষণা করল আজ থেকে তার নাম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। আর তার সেলের অপর বাসিন্দা এক শিখ নিজেকে দাবি করল মাস্টার তারা সিং বলে। এরপর দু'জনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। তাদেরকে 'বিপদজনক' ঘোষণা করে আলাদা সেলে রাখা ব্যবস্থা করা হলো।

লাহোরের এক হিন্দু আইনজীবী ছিল। প্রেমিকার কাছ থেকে ছ্যাঁকা খেয়ে সে পাগল হয়ে যায়। সে যখন শুনল অমৃতসর ভারতের মধ্যে চলে গেছে, খুবই হতাশ হয়ে পড়ল । কারণ তার হৃদয়েশ্বরী অমৃতসর থাকে। মেয়েটি তার সঙ্গে প্রতারণা করলেও পাগল হওয়া সত্বেও প্রেমিকাকে ভুলতে পারেনি । সে সারাদিন হিন্দু আর মুসলমানদের গালাগালি করতে লাগল কারণ তারা ভারত ভেঙ্গে দু' টুকরো করেছে এবং তার প্রেমিকা হয়ে গেছে ভারতীয় আর সে পাকিস্তানী।

পাগল বিনিময়ের কথা বাতাসে ছড়িয়ে পড়লে পাগলা গারদের অন্যান্য বাসিন্দারা হিন্দু আইনজীবীকে সান্তনা দিল এই আশায় যে তাকে শীঘ্রি ভারতে পাঠানো হবে---- যে দেশে তার প্রেমিকা বাস করে। তবে নিশ্চিন্ত হতে পারল না আইনজীবী। সে লাহোর ছেড়ে যেতে চায় না কারণ তার আশঙ্কা অমৃতসরে সে বৈধ আইন ব্যবসা করতে পারবে না।

ইউরোপীয় ওয়ার্ডে দু'জন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পাগল আছে। ইংরেজরা ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে ঘরে ফিরে গেছে শুনে তারা খুবই মুষড়ে পড়ল। পাগলা গারদে ভবিষ্যতে তাদের অবস্থান বা মর্যাদা কতটুকু থাকবে তা নিয়ে দু'জনে গোপনে শলা-পরামর্শ করলঃ পাগলা গারদে ইউরোপীয়দের জন্য আলাদা ওয়ার্ডের ব্যবস্থা কি থাকবে? তাদেরকে কি আগের মত সকালের নাস্তা পরিবেশন করা হবে ? নাকি তাদেরকে টোস্ট খাওয়া থেকে বঞ্চিত করে চাপাতি খেতে বাধ্য করা হবে ?

এক শিখ পনের বছর ধরে পাগলা গারদে আছে। এই পনের বছরে তাকে লোকে খুব কম কথাই বলতে শুনেছে। সে শুধু মাঝে মাঝে গুনগুন করে: ও,পরদি, গুড়গুড়দি,আনেকাদি, বেদিহানা দি, মুংদি ডান অব দি ল্যান্টার্ন।'

এই শিখকে কেউ দিনে বা রাতে ঘুমাতে দেখে নি। ওয়ার্ডাররা বলে গত পনের বছরে কেউ তাকে সামান্য চোখ পিটপিট করতেও দেখে নি। মেঝেতে শুতোও না সে, মাঝে মাঝে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে বিশ্রাম নেয়। তার পায়ের গোড়ালি ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল।

পাকিস্তান এবং ভারত নিয়ে কথা বলার সময় কিংবা পাগল বিনিময় নিয়ে আলোচনার সময় এই শিখ খুব মনোযোগী শ্রোতা বনে যায়। কেউ তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে বললে সে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বলে:' ও, পরদি, গুড়গুড়দি, আনেকাদি, বেদিহানা দি, মুংদি ডান অব দি পাকিস্তান গভর্নমেন্ট।'

কিছুক্ষন পর সে 'অব দি পাকিস্তান গভর্নমেন্ট' এর বদলে বলে. 'অব দি টোবাটেক সিং গভর্নমেন্ট।'

সে তার পাগল সঙ্গীদের প্রশ্ন শুরু করল টোবাটেক সিং এর গাঁ ভারতে নাকি পাকিস্তানে? কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। কেউ চেষ্টা করলে ফেঁসে যেত যখন ব্যাখ্যা করা হত কিভাবে শিয়ালকোট আগে ভারতে ছিল, এখন পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। কেউ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে না একই ভাগ্য লাহোরকেও বরণ করে নিতে হবে কিনা এবং আজকে যারা পাকিস্তানী কাল তারা ভারতীয় হয়ে যাবে কিনা। তাছাড়া কেই বা নিশ্চিত করে বলতে পারে যে গোটা ভারত পাকিস্তানের অংশ হয়ে যাবে কিনা।

ওই শিখের লম্বা চুল বেশিরভাগ ঝরে গেছে। খুব কমই গোসল করত বলে মাথার চুল দাড়ির সাথে কেমন জট পাকিয়ে থেকে তাকে ভয়ঙ্কর দেখাত। তবে লোকটা ছিল সহজ সরল। পনের বছর হল পাগলা গারদে আছে সে, কারও সঙ্গে মারামারি দূরে থাক কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয় নি। বুড়ো পাগলরা জানে তার বাড়ি টোবাটেক সিংয়ের গাঁয়ে এবং তার বাবা একজন সমৃদ্ধ কৃষক। মাথায় গোলমাল দেখা দিলে তার আত্মীয়

স্বজন তাকে গায়ে শিকল জড়িয়ে পাগলা গারদে নিয়ে আসে। মাসে একবার তার দু'একজন আত্মীয় এসে কেমন আছে দেখে যায়। ভারত-পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাওয়ার পরে তাদের আসাও কমে গেল।

এই শিখের নাম বিষেন সিং। তবে সবাই তাকে টোবাটেক সিং নামে ডাকত। বিষেন সিং দিন-রাত, সপ্তাহ,মাস কোন কিছুর হিসেব রাখতে পারে না। জানে না কতদিন ধরে পাগলা গারদে আছে। তবে তার বন্ধু বান্ধব কিংবা আত্মীয় স্বজন তাকে দেখতে এলে বুঝতে পারে এক মাস পার হয়েছে। তাকে হেড ওয়ার্ডার জানায় তার সাথে দেখা করতে 'মিস ইন্টারভিউ' এসেছে। সে তখন সারা গায়ে সাবান এবং চুল ও দাড়িতে তেল মাখে। গোসল সেরে দর্শনার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। কোন প্রশ্ন করলে সে চুপ করে থাকে নতুবা জবাব দেয়,' ও,পরদি, গুড়গুড়দি,আনেকাদি, বেদিহানা দি, মুংদি ডান অব দি লণ্ঠন।'

বিষেন সিংয়ের পনের বছর বয়সী একটা মেয়ে আছে। তবে সন্তানকে নিয়ে তার কোন অনুভূতি নেই। বাপকে দেখতে এলে মেয়ে অঝোরে কাঁদে।

ভারত পাকিস্তান নিয়ে কথা বলার সময় বিষেন সিং অন্য পাগলদের কাছে জানতে চাইল টোবাটেক সিং কোথায় থাকে। কেউ তাকে সন্তুষ্ট করার মত জবাব দিতে পারল না। তার বিরক্তি দিন দিন বেড়ে চলল।

ইদানিং মিস ইন্টারভিউও আসে না তার সাথে দেখা করতে। এখন সে তার আত্মীয় স্বজনের জন্য মুখিয়ে আছে। তাদের সাথে দেখা হলে জিজ্ঞেস করবে টোবাটেক সিং ভারতে আছে নাকি পাকিস্তানে। কিন্তু কেউ আসে না। বিষেন সিং তথ্য পাবার জন্য আরেকজনের দ্বারস্থ হল।

পাগলা গারদে এক পাগল আছে, নিজেকে সে ঈশ্বর বলে দাবি করে।বিষেন সিং তাকে প্রশ্ন করল টোবাটেক সিং ভারতে আছে নাকি পাকিস্তানে। চেহারা গম্ভীর করে 'ঈশ্বর' জবাব দিল.' এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার হুকুম আমরা এখনও পাই নি।'

বিষেন সিং একই জবাব বহুবার পেল। সে ঈশ্বরকে আর্তি জানাল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য যাতে সে সঠিক তথ্য পেতে পারে। কিন্তু তার আবেদন বিফলে গেল। ঈশ্বরের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে আলোচনা করার হুকুম পাবার জন্য। বিষেন সিংয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। একদিন সে ঈশ্বরকে গালাগাল দিয়ে যা বলল তার সারমর্ম হল ঈশ্বর শুধু মুসলমানদের, ঈশ্বর শিখদের হলে অবশ্যই একজন শিখের আবেদন শুনতে পেতেন।

পাগল বিনিময়ের তারিখ নির্ধারিত হওয়ার দিন কয়েক আগে টোবাটেক সিংয়ের গাঁ থেকে এক মুসলমান এল বিষেন সিংয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে। এ লোক আগে কখনও পাগলা গারদে আসে নি। বিষেন সিং তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। ওয়ার্ডাররা তাকে বাধা দিল, 'এ তোমাকে দেখতে এসেছে। এ তোমার বন্ধু ফজলদীন।'

বিষেন সিং কটমট করে তাকাল ফজলদীনের দিকে, বিড়বিড় করতে লাগল। ফজলদীন বিষেন সিংয়ের কাঁধে হাত রাখল। 'অনেকদিন ধরেই তোমার সঙ্গে দেখা

করতে আসব ভাবছিলাম। কিন্তু কিছুতেই সময় কুলোতে পারিনি। তোমার পরিবার নিবাপদে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে গেছে। আমি ওদের জন্য যতদূর সম্ভব করেছি। তোমার মেয়ে রুপকাউর... ফজলদীন এখানে এসে একটু থেমে গেল। তারপর ইতস্ততঃ ভঙ্গিতে বলল,'ও ভাল আছে। অন্যদের সাথে সে-ও গেছে।'

বিষেন সিং চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। একটি কথাও বলছে না। ফজলদীন শুরু করল আবার, ' ওরা তোমার সাথে যোগাযোগ করতে বলেছে আমাকে। শুনলাম তুমি ভারতে যাবে। তোমার ভাই বলরাম সিং এবং বুধোয়া সিং কে আমার সালাম দিও...বোন অমৃতা কাউরকেও... ভাই বলরাম সিংকে বলো ফজলদীন ভালো আছে। ওরা যে বাদামী রঙের মোষ জোড়া রেখে গেছে ওগুলো বাচ্চা দিয়েছে একটা ছেলে, অন্যটা মেয়ে... মেয়েটা ছয়দিন পরে মারা গেছে। ওদের জন্য কিছু করার থাকলে আমি সবসময় তা করব। আমি তোমার জন্য কিছু মিষ্টি ভুট্টা নিয়ে এসেছি।'

বিষেন সিং ভুট্টার ব্যাগ নিয়ে ওয়ার্ডারের হাতে দিল। ফজলদীনকে জিজ্ঞেস করল, 'টোবাটেক সিং কোথায় ?' ফজলদীনকে বোকা বোকা লাগল, জবাব দিল,'কোথায় আবার থাকবে? যেখানে সবসময় ছিল সেখানেই আছে।'

আবার জানতে চাইল বিষেন সিং,' পাকিস্তানে নাকি ভারতে?'

'না, ভারতে নয়,পাকিস্তানে,' জবাব দিল ফজলদীন।

বিষেন সিং বিড়বিড় করতে করতে ঘুরে দাঁড়াল, 'ও,পরদি, গুড়গুড়দি,আনেকাদি, বেদিহানা দি, মুংদি ডান অব দি পাকিস্তান অ্যান্ড হিন্দুস্তান অব দূর ফিট্রি মুহ।'

পাগল বিনিময় করার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হল। দু'পক্ষের পাগলদেরকে যে যার জায়গায় পাঠিয়ে দেয়ার তালিকা করে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের খবর দেয়া হল। বিনিময়ের দিনও নির্ধারিত হয়ে গেল।

প্রচন্ড ঠান্ডা এক সকালে শিখ আর হিন্দু পাগলরা লাহোর পাগলা গারদ ছাড়ল কড়া পুলিশ প্রহরায়।ওয়াগা সীমান্তে দু'দেশের সুপারিডটেন্ডেন্টরা মিলিত হলেন। বাস থেকে পাগলদের নামিয়ে দু' দেশের কাস্টডি অফিসারদের হাতে তুলে দেয়ার সময় বেজায় ঝক্কি পোহাতে হল। কেউ কেউ বাস থেকে নামবেই না; যারা নামল তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন হয়ে পড়ল। কেউ বা ভেগে পড়ার চেষ্টা করল ওদেরকে আবার ধরে আনা হল। ন্যাংটা পাগলদের জামা কাপড় পরানো হল। কিন্তু জামা পরানো মাত্র তারা সে কাপড় ছিঁড়ে শতটুকরো করল। কেউ কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিতে দিতে বাস থেকে নামল। কেউ গলার রগ ফুলিয়ে গান গাইছে, কেউ জবুথবু হয়ে বসে থাকল, আবার কেউ গলা ফাটিয়ে কাঁদল,গর্জন ছাড়ল। এমন একটা হট্টগোল শুরু করে দিল তারা যে কেউ কারো কথা বুঝতে পারছে না। মহিলা পাগলরাও যোগ দিল ওদের সাথে। আর এরকম অবস্থা চলতে লাগল দাঁতকপাটি লেগে যাওয়ার মত ভয়াবহ ঠান্ডার মধ্যে।

বেশিরভাগ পাগল এই বিনিময়ের প্রবল প্রতিবাদ জানাল। কারণ তারা বুঝতে পারছিল না কেন তাদেরকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় জোর করে পাঠানো হচ্ছে। কেউ চিৎকার করে শ্লোগান দিচ্ছে 'পাকিস্তান দীর্ঘজীবী হোক' কেউ বা বলছে

'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' কেউ কেউ এমন উন্মাদ হয়ে উঠল যে মারামারি শুরু করে দিল। তাদেরকে বহু কষ্টে থামানো হলো।

অবশেষে এল বিষেন সিংয়ের পালা। ভারতীয় কর্মকর্তা তার নাম লিখছে রেজিষ্টারে, বিষেন সিং জিজ্ঞেস করল, 'টোবাটেক সিং কোথায় ভারতে নাকি পাকিস্তানে?'

'পাকিস্তানে।

এটাই বিষেন সিংয়ের জানা দরকার ছিল। সে ঘুরেই পাকিস্তানের দিকে দৌড় দিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে ধরে ফেলল এবং ভারতের মধ্যে ঠেলে ঢোকাবার চেষ্টা করল। বিষেন সিং কিছুতেই মানে না। 'টোবাটেক সিং এই পাশে আছে,' সে চিৎকার করে উঠল তারপর গলার স্বর সপ্তমে তুলে চেঁচাতে লাগল,' ও,পরদি, গুড়গুড়দি,আনেকাদি, বেদিহানা দি, মুংদি ডান অব টোবাটেক সিং অ্যান্ড পাকিস্তান' ওরা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। ব্যাখ্যা করল টোবাটেক সিং নিশ্চয়ই ভারতে চলে গেছে। এ নামে কাউকে পাকিস্তানে পাওয়া গেলে অবশ্যই তাকে তৎক্ষনাৎ ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু বিষেন সিং কোন কথা শুনতে রাজি নয়। সে ভারতে যাবেই না। ওরা শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করল। বিষেন সিং ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত রেখার মাঝখানে অটল পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে কিছুতেই তাকে সরানো গেল না। মাটির মধ্যে আঙ্গুল গেড়ে দাঁড়িয়ে থাকল বিষেন সিং।

জোর খাটিয়ে লাভ হবে না বুঝতে পেরে ক্ষান্ত দিল ওরা। নিজের ইচ্ছে হলে আসবে বিষেন সিং। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তাকে ওখানেই রেখে বিনিময়ের কাজ শুরু হয়ে গেল।

সূর্য ওঠার খানিক আগে বিষেন সিংয়ের গলা দিয়ে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল। যে লোক গত পনের বছর পাগলা গারদে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকেছে, এবার সে মাটির উপর দড়াম করে পড়ে গেল। কাঁটাতারের বেড়ার এপাশে ভারতের সীমান্ত চিহ্নিত করা, অপর পাশে পাকিস্তানের সীমানা । দুই কাটাতারের মাঝখানে, নো ম্যানসল্যান্ডের মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল টোবাটেক সিংয়ের গাঁয়ের বাসিন্দা বিষেন সিং।

লেখক পরিচিতি

সাদাত হাসান মান্টো (১৯১২-১৯৫৫) সেরা উর্দু সাহিত্যিকদের অন্যতম। তিনি একজন সাংবাদিক এবং চিত্রনাট্যকারও ছিলেন। মান্টো দুই দশকে দুই শতাধিক গল্প লিখেছেন। পাশাপাশি রচনা করেছেন নাটক,ছায়াছবির চিত্রনাট্য, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ। তার সেরা গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে টোবাটেক সিং, মোজেল এবং মাম্মি। জীবদ্দশা তিনি কাটিয়েছেন অমৃতসর,বোম্বে এবং লাহোরে। খুশবন্ত সিংয়ের সবচেয়ে প্রিয় গল্পের একটি হলো টোবাটেক সিং যা তিনি 'দ্য এক্সচেঞ্জ অব লুনাটিকস' শিরোনামে উর্দু থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। 'দ্য এক্সচেঞ্জ অব লুনাটিকস' বাংলায় অনুবাদ করা হলো 'পাগল বিনিময়' শিরোনামে---- অনুবাদক।

অন্ধ গলি

গুরমুখ সিং জিৎ

গতকালের ঘটনা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না ইন্দর। জীবনে কম দুঃখকষ্ট পায়নি সে, কিন্তু এ ঘটনা তাকে অপমানের সাগরে ঠেলে দিয়েছে। যত ভুলতে চেষ্টা করছে ততই মনের মধ্যে গেড়ে বসছে ওটা।

সিনেমা টিনেমায় তেমন যায় না ইন্দর, আজ রাতে একটি ছবি দেখবে ঠিক করল। হয়তো অশান্ত হৃদয় খানিকটা শান্ত হবে এতে। রাতে খাওয়া সেরে ছোট মেয়েটিকে বলল সে, 'নির্মল, তোর মাকে বলিস ফিরতে দেরি হবে আমার।' বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়ল ইন্দর। কানের মধ্যে এখনও দমাদম বাড়ি খাচ্ছে সুপারিনটেনডেন্টের কথাগুলো; 'ইন্দর, চাকরি করার ইচ্ছে থাকলে আরও সাবধানে কাজ করতে হবে। আমি তোমার মত অকম্মার ধাড়িকে কিন্তু রাখব না, বলে দিচ্ছি!'

'*অকম্মার ধাড়ি!*' '*অকম্মার ধাড়ি!*' আমি কি সত্যি তাই? ভাবে ইন্দর।

মাত্র ক'দিন আগে কোম্পানির হিসাব-পত্তর অডিট হওয়ার পরে এই সুপারিনটেন্ডেন্টই ইন্দরের পিঠ চাপড়ে কত প্রংশসা করেছিলেন। আর গতকাল তিনি কী বললেন? কী অদ্ভুত এই লোকগুলো! এখন একটা কথা বলছে তো পরের মুহূর্তে পাল্টে ফেলছে সুর। মত বদলাতে তাদের একদণ্ড সময় লাগে না। আমার মত 'জ্বী হুজুর' টাইপের লোক, যে আট ঘন্টা অফিস ডিউটির বদলে দশঘন্টা কাজ করে, ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে চাকরের মত প্রাণপণে খেটে চলেছে, তার প্রতিও এদের বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা নেই, ভাবছে ইন্দর। কোনওদিন বেতন বাড়ানোর কথা বলেনি সে, ঘরে অভুক্ত সন্তান রেখে, নিজে প্রায়ই না খেয়ে অফিস করছে ইন্দর। কিন্তু এই লোকগুলোর কাছ থেকে একটুও সহানুভূতি মেলে না।

ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রেক্ষাগৃহে পৌছে গেল ইন্দর, আজ সোনালী পাড়ের শাড়ি আর রঙিন ব্লাউজ পরা সুন্দরীরা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না। নিজের ভাবনায় সম্পূর্ণ ডুবে রয়েছে ইন্দর।

প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। পর্দায় চোখ থাকলেও মন ওখানে নেই ইন্দরের। দর্শক মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখছে, একমাত্র ইন্দরের মনই বোধহয় পড়ে আছে অন্য কোথাও। রঙিন দৃশ্য, জনপ্রিয় গান, তরুণী নায়িকা, কিছুই তার মাঝে আবেগের সৃষ্টি করতে পারল না। নিজের ভাবনায় এমন নিমগ্ন সে, ছবি কখন শেষ হয়ে গেছে টেরও পেল না। সকল দর্শক চলে যাওয়ার পর যেন চমক ভাঙল তার। গভীর রাতে ক্লান্ত পা তাকে টেনে নিয়ে এল বাড়িতে। বুকটা আগের মতই ভার।

প্রদীপটা টিপ টিপ জ্বলছে। ওর স্ত্রী অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত, চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছে। চোখের পাতা ভারী হয়ে এলেও কান জোড়া সতর্ক। দরজা খোলার শব্দ পেলেই উঠে পড়বে। আলুথালু কালো চুল বউয়ের সৌন্দর্য এতটুকু ম্লান করতে পারেনি। জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকল ইন্দর। শকুন্তলা সেই আদর্শ স্ত্রীদের একজন যে স্বামী অন্তপ্রাণ, যে কোনও মূল্যে স্বামীকে সুখে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যায় সে। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনে ঝিমুনি কেটে গেল শকুন্তলার, দ্রুত এগোল দরজা খুলতে। ভিতরে ঢুকল ইন্দর, কোনও কথা না বলে শুয়ে পড়ল বিছানায়। কিন্তু ঘুম এল না।

গতকালের ঘটনার জন্য নিজেকে কোনভাবেই দায়ী করে না ইন্দর। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান মানুষও, সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্যন্ত যদি প্রচণ্ড এই গরমে কাজ করে, ভুল হতে তার বাধ্য। আর ইন্দরের মত রোগা, শুকনো, প্যাঁকাটি ধরনের মানুষ, যার ভাগ্যে খুব কমই এক কাপ দুধ জোটে, যে মাখন খাওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারে না, এমন গাধার খাটুনির পরে তার ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

ইন্দর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে। গতকাল সন্ধ্যায়, হিসাবে যোগ দেওয়ার সময়, ৭ এর জায়গায় ভুল করে ৯ লিখে ফেলেছিল। এটা স্রেফ 'স্লিপ অভ দা পেন' বলা চলে। বিরাট কিছু ভুল নয়, পরদিন সকালেই ঠিক করা যেত, ডাবল-চেকিং-এর সময়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে সুযোগটা পায়নি ইন্দর। সুপারিনটেনডেন্ট ওই কাগজগুলোর জন্য ডেকে পাঠালেন এবং যথারীতি ভুলটা তাঁর চোখেও পড়ে গেল। ভুলটা ইন্দরের হতো না, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হয়েছে। গত সন্ধ্যায় অসুস্থ ছেলেটার জন্য ওষুধ কিনে বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল।

ইন্দর এসব কথা ভাবছে। ক্লান্ত, অবসন্ন সে। কিন্তু বুকের ভিতর একটা ঝড়ও উঠছে। যেন অগ্নিগিরি ফুঁসছে, বিস্ফোরণ ঘটবে। সুপারিনটেনডেন্ট ওই সামান্য ভুলটুকুর জন্য সবার সামনে এভাবে অপমান করলেন তাকে!

উথাল পাথাল মন নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা গেল না। উঠে পড়ল ইন্দর। তারপর আবার শুয়ে পড়ল। আবার উঠল। বুকের ভিতর যন্ত্রণা হচ্ছে খুব। সুপারিনটেনডেন্টের কথাগুলো হুলের মত বিঁধে আছে গায়ে। মালিকপক্ষ সব সময়ই নিজেদের স্বার্থ বড় করে দেখে। লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে তারা ইন্দরের মত লোকজনকে ব্যবহার করে।

অথচ ইন্দরদের প্রতি তাদের কোনও সহানুভূতি নেই। ইন্দরের বাচ্চাটা অসুস্থ জানার পরেও ওকে এক ঘন্টা আগে ছুটি দেননি সুপারিনটেনডেন্ট। তাঁকে কি মানুষ বলা যায়? অবশ্যই না। লোকটা একটা মানুষখেকো। বাড়ির বাইরে কেউ ঠান্ডায় যখন থরথর করে কাঁপছে, সুপারিনটেনডেন্টের মত লোকেরা তখন গরম কাপড়ে শরীর মুড়ে গরম গরম খাবার আর পানীয় গিলছে। কী অমানবিক!

এসব কথা ভাবতে গিয়ে বুকের তোলপাড়টা বেড়ে গেল ইন্দরের, কাঁপতে লাগল রাগে।

এখনও পচে যায়নি সে, নিজেকে শোনাল ইন্দর, বিসর্জন দেয়নি আত্মসম্মান যে এই অনাচার মেনে নিতে হবে। মাংসপেশীতে এখনও তারুণ্যের শক্তি আছে।

প্রদীপের আলো নিভে যাওয়ার আগে দপ করে জ্বলে ওঠার মত ইন্দরের অপুষ্ট শরীর আর মনে যেন নতুন আত্মবিশ্বাসের বান ডাকল। এ অন্যায় সে কিছুতেই মেনে নেবে না। প্রতিবাদ করতে হবে। কয়েক মুহূর্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল ইন্দর। অনাহার আর চাকরির বেতন কোনটাকে বেছে নেবে সে? শেষে আত্মসম্মানের জয় হলো। না খেয়ে মরতে রাজি ইন্দর তবু অপমান সহ্য করে থাকবে না। হ্যাঁ, কালকেই সে চাকরি ছেড়ে দেবে।

সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারল না ইন্দর। এখুনি পদত্যাগপত্র লিখবে। অন্ধকারে দেশলাইর বাক্স হাতড়ে বেড়াল। দেশলাই দিয়ে প্রদীপ জ্বালাল। কিন্তু প্রদীপের শিখা দপদপ করে জ্বলেই নিভে গেল। তেল নেই! হতাশ হয়ে বিছানায় আবার শুয়ে পড়ল ইন্দর। পাশের ঘর থেকে ভেসে এল বাচ্চার খকখক কাশি। সাথে সাথে ওর চিন্তাধারা নতুন ধারায় প্রবহিত হতে লাগল। একটু আগে নেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। চাকরি ছেড়ে দিলে বাচ্চাটাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হবে না? ওর স্ত্রী সংসার যুদ্ধে এমনিতেই ক্লান্ত, ঘরে টাকা না থাকলে সে দিশেহারা হয়ে পড়বে না? ইন্দর কি সেধে পিচ্ছিল পথে এগোচ্ছে না, যে রাস্তায় হড়কে গিয়ে একেবারে পাতালে ঢুকতে হবে? চাকরি থেকে পদত্যাগ করা আর নিজের মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষণা একই কথা নয় কি? ঈশ্বর! ভাবল ইন্দর, কী ভুল একটা পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছিল সে। পরিবারের প্রতি তার একটা দায়িত্ব আছে, আর সেই দায়িত্ব সে অবহেলা করতে চেয়েছে। নিজে হয়তো না খেয়ে থাকা যায়, কিন্তু স্ত্রী-পুত্র-কন্যা? তারা কী দোষ করেছে? এই নিষ্ঠুর উদাসীন সমাজে কেউ তাদেরকে এক মুঠো খাবার দিতে এগিয়ে আসবে না, খবরও নেবে না। না খেয়ে মরতে হবে তার পরিবারকে! ভাবতেই শিউরে উঠল ইন্দর।

'বাবা! বাবা! ওঠো! সকাল হয়ে গেছে। অফিসে যাবে না?' মেয়ে নির্মলের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল ইন্দরের। মেয়েটার গলা অবিকল তার মায়ের মত।

ভোরের আলোয় কচি মুখটাকে দেখছে ইন্দর। কোঁকড়ানো কালো চুল গোল হয়ে আছে ফর্সা, ছোট্ট কপালের উপর। কী সুন্দর লাগছে দেখতে!

তবে মেয়ের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকার সুযোগ পেল না। হাতের তালু দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। অফিসের দেরি না হয়ে যায়, সেই ভয়ে ভীত। আয়নার সামনে দাঁড়াল ইন্দর। চেহারায় শুধু হতাশা আর না পাওয়ার বেদনার ছাপ, গত রাতের বিদ্রোহী চিন্তা চেতনার চিহ্নমাত্র নেই। 'তুমি পরিবারের কর্তা, ইন্দর,' মনে মনে বলল সে। 'সন্তান ও স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে তুমি বাধ্য।' বুকের গভীরে হতাশার চিৎকার শুনল ইন্দর, কিন্তু চিৎকারটাকে গলা টিপে ধরল সে, গলা টিপে ধরল আত্মসম্মানবোধ ও অহঙ্কারের।

দ্রুত মুখ ধুয়ে নিল ইন্দর। জামাকাপড় পরল। কোনওমতে নাস্তা সারল। তারপর সাইকেলের ক্যারিয়ারে ফাইলপত্র বেঁধে দু'চাকার বাহনটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সামনে লম্বা একটা দিন পড়ে আছে, আর মনের ভিতরে সেই দিনের দৈর্ঘ্য ক্রমে বেড়েই চলেছে। সামনে লম্বা একটা রাস্তা পড়ে আছে। অন্ধ একটা গলি। যেখান থেকে বেরুবার পথ নেই।

লেখক পরিচিতি

গুরমুখ সিং জিৎ-এর জন্ম ১৯২২ সালে। তিনি পাঞ্জাবী সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা সমালোচক, পাশাপাশি পাঞ্জাবী ও হিন্দি ভাষায় সাহিত্য রচনাও করেছেন। তাঁর বিখ্যাত সাহিত্য কর্মের মধ্যে রয়েছে পাঞ্জাবী ভাষায় লেখা কালা আদমী, ধত্রী সন সুনেহারি, মৃগ তৃষ্ণা, ভেখো কওন আয়ে ইত্যাদি। তিনি পাঞ্জাবী সাহিত্য একাডেমীর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

মহাভারতের গল্প

সতীন্দ্র সিংহ

১৯৪৭ সালের আগষ্টে, ভারত উপমহাদেশ ভাগ হওয়ার আগ পর্যন্ত গুরুদাসপুর ছিল ছোট একটি শহর। সেখানে কোনও পরিবর্তন ছাড়া ঢিমেতালে চলত জীবন। কোনও উত্তেজনা নেই। এ শহরের মানুষ জীবনের চাকচিক্য সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অসচেতন।

তবে মাঝে মধ্যে জীবনে যে রঙ লাগত তা নয়। এটা ঘটত ধর্মীয় উৎসব-টুৎসব এলে। দূর্গাপূজার দশহরার দিন বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হত। দেবী দূর্গাকে বিদায় জানাতে রাক্ষস রাজা রাবণের প্রতিমূর্তি পোড়ানো হত, সেই সঙ্গে কান ফাটানো শব্দে পুড়ত পটকা আর আতশবাজি। দিওয়ালি বা কালি পূজার সময় মাটির প্রদীপ জ্বালানোর মধ্যেও মিলত উত্তেজনার খোরাক। হোলির দিনে রং গোলা জল ছিটিয়েও বেশ মজা হত। বৈশাখী এলে কৃষকরা ভাংরা নাচত। তখন মাঠ বোঝাই সোনালী ধান বসন্তের মৃদু বাতাসে দুলছে।

জীবনের একঘেয়েমি রুটিনের মসৃণতা কেটে যেত গুরু নানকদেব এবং গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্মবার্ষিকীতে। এই বিশেষ দিনে শক্তসমর্থ, দাড়িঅলা শিখরা হাতে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে মিছিল করত। কাঁধ সমান উঁচু পালকিতে বয়ে নিয়ে যাওয়া পবিত্র গ্রন্থসাহিবে তারা বারবার মাথা ঠেকাত।

অলস, বর্ণহীন জীবনে ঈদ এবং শবেবরাত খানিকটা পরিবর্তনের আভাস নিয়ে আসত। মুসলমানরা তখন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠত।

এ সব বিশেষ দিনগুলোতে মাঝে মাঝে বাচ্চারা নতুন জামা-কাপড় পরে দূরে কোথাও খেলতে যাওয়ার সুযোগ পেত। এসব ধর্মীয় পার্বন ছাড়াও কখনও কখনও দু'একটি ঘটনা ঘটত যার আশায় বাচ্চারা হাঁ করে অপেক্ষা করে থাকত।

এর মধ্যে একটি হলো গরমের সময় রোড-রোলারের আগমন। এ দিন আমরা স্কুলে যেতাম না, দুপুরে বাসায় ভাত খেতে আসতাম না কিংবা ঘুমাতেও যেতাম না। অবশ্য এ জন্য বাসা এবং স্কুল দু'জায়গাতেই পিটুনি খেতে হত। কিন্তু কে গ্রাহ্য করে? আমরা রোড রোলারের পেছন পেছন ছুটতাম। দেখতাম রাস্তা সমান করতে করতে ঘড়ঘড় শব্দে এগিয়ে চলেছে বিরাট চাকার যন্ত্রটা। রোড-রোলারের হুইশলের শব্দে

উল্লাসে ফেটে পড়তাম আমরা। কানের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিতাম, বুজে থাকতাম চোখ। মনে হত আকাশে উঠে পড়েছি, ভেসে বেড়াচ্ছি বাতাসে।

রোড-রোলারের প্রতি আকর্ষণ কমে যেত শহরে সার্কাস, যাত্রা কিংবা ভ্রাম্যমাণ সিনেমাঅলারা এলে। এগুলো ছিল আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন জগৎ। এর যে কোন একটি জিনিসের আবির্ভাব গুরুদাসপুরকে রঙিন করে তুলত। নাথুর দোকানে তাল-মিছরির গায়ে মাছি যেমন ভনভন করে, আমরা তেমনই এগুলোর সঙ্গে লেগে থাকতাম।

এগুলোর ভেতরে কী হচ্ছে তা আমাদের জন্য সবসময় রহস্যের বিষয় ছিল। বড়রা আমাদেরকে এসব প্রদর্শনীতে নিয়ে যেতেন না। আমরা ঘ্যানঘ্যান শুরু করলে তাঁরা রাগী গলায় মনে করিয়ে দিতেন ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা কখনও এসব অশ্লীল প্রদর্শনী দেখতে যায় না। মাঝে মাঝে উপদেশ বিলোতেন, বড় হও। বড় হয়ে যখন জীবনের মানে বুঝতে পারবে তখন এসব দেখতে যেতে পারবে। কিন্তু এখন এসব দেখা তোমাদের জন্য নিষেধ।

গোঁ ধরে থাকলে ধমক খেতাম, চড়চাপড় জুটত। বাবা-মাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কখনও সিনেমা কিংবা যাত্রা-থিয়েটার দেখতে গেলে আমরা উচ্ছন্নে যাব। আমাদেরকে আর সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

স্কুলে শিক্ষকরা উপদেশ দিতেন বাবা-মা'র কথার কখনও অবাধ্য হবে না। মা-বাবাকে না জেনে মনে কষ্ট দেয়াও পাপ।

শুধু দশহরার দিন প্রদর্শনীতে যাবার অনুমতি মিলত। রাম, সীতা এবং রাবণের নাটক দেখতে পেতাম।

আমি তখন ক্লাস সিক্স কিংবা সেভেনে পড়ি, আমাদের শহরে যাত্রার একটি দল এল। ছোট ভাই দুটোকে নিয়ে মীটিংয়ে বসলাম। ওদেরকে বললাম বাবাকে বলতে যে উনি যেন আমাদেরকে যাত্রা দেখাতে নিয়ে যান। অবশ্য এ ধরনের অনুরোধ করতে গেলে যে কয়েকটা চড়-থাপ্পড় খেতে হবে এবং বকা শুনতে হবে তা আমরা জানি। এজন্য প্রস্তুতও আছি।

দিন ঘনিয়ে এল। উত্তেজনায় ছটফট করছি। সন্ধ্যার দিকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাবার জন্য অপেক্ষা। অবশেষে বাবা এলেন। হাতে ছড়ি, চেহারা গম্ভীর। বাবাকে দেখে শশব্যস্তে দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়ালাম। আমাদের অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করে তাঁর মুখে হালকা একটা হাসি ফুটল।

বাবার মুখের হাসি বুকে বল জোগাল। তাঁর পেছন পেছন ঘরে ঢুকলাম। ছোট ভাইটাকে চোখ টিপলাম। এখন কথাটা বলার উপযুক্ত সময়। বাবা ভাল মুডেই আছেন মনে হচ্ছে। আমার ভাই ইশারায় বলল, 'ভেব না আমি ভয় পেয়েছি কিংবা ভুলে গেছি। বাবা আগে জামা-কাপড় ছাড়ুক, তারপর কথাটা বলছি।'

বাবা বরাবরের মত ঘরের কোণে ছড়ি রেখে একটা খাটিয়ায় বসলেন, ডাকলেন আমাদের ছোটভাই বিল্লুকে। ওকে আদর করতে লাগলেন। সুযোগটা হারাল না বিল্লু। ফটাশ করে বলে ফেলল, 'বাবা, আমাদেরকে আজ রাতে যাত্রা দেখাতে নিয়ে যাবে?'

মেজ ভাই হরিও বিল্লু কে সমর্থন জোগাল, রিহার্সাল দেয়া মুখস্থ করা কথাগুলো বলে গেল গড়গড় করে।

বাবা ব্যাপারটাকে আমলই দিলেন না। কিন্তু আমরা গোঁ ধরে আছি দেখে রেগে গিয়ে বললেন, 'আঁখ কা জাদু (চোখের জাদু) তোমাদের জন্য নয়। তোমরা ছোট।'

'কিন্তু আমরা দেখব,' আমি প্রবল জেদের গলায় বললাম। কথাটা শেষ করতেও পারিনি, ঠাস করে থাপ্পর পড়ল গালে। কাঁদতে কাঁদতে ছুটলাম দরজার দিকে। দুই ভাই পরাজিত বদনে আমার পিছু নিল।

এ ঘটনা আমাদের তেজ এবং শক্তি ভেঙে দিল। বেশ কয়েকদিন ভয়ে বাবার সামনেই গেলাম না। তবে সবসময়ই শিক্ষকের বলা বাণী প্রতিধ্বনি তুলে চলল কানে: 'পরাজয় এবং বাধার মুখেও মানুষ তার প্রচেষ্টা বাদ দেয় না। ব্যর্থতাই সাফল্যের চাবিকাঠি।'

এক সপ্তাহ পরে যাত্রার দল ঘোষণা করল তাদের পরবর্তী প্রদর্শনী 'মহাভারত'। ভাইদেরকে নিয়ে আবার বৈঠকে বসলাম। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো আমাদের দাবি আবার উত্থাপন করা হবে। তবে এবার আগে মায়ের কাছে।

পা টিপে টিপে ঢুকলাম মা'র ঘরে। মা হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কীরে, তোদের মতলব কী?'

বললাম কেন এসেছি। মা গম্ভীর মুখে বাবার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু আমাদেরকে গোঁ ধরে থাকতে দেখে রেগে গেলেন, হুমকি দিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর হুমকি পাত্তা না দিয়ে বলে চললাম, 'মা, মহাভারত থেকে গল্প বলেছ। নাটকটা দেখাতে আমাদের নিয়ে যাবে না কেন?'

মা ফাঁদে পড়ে গেলেন। শেষে বললেন, 'তোদের বাবাকে বলগে যা। সে এ বাড়ির কর্তা, আমি নই।'

বাবা সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পরে তাঁকে আমাদের দাবির কথা জানালাম। তিনি রেগে গিয়ে বকাঝকা করলেন। কিন্তু যাত্রাটা ধর্মীয় গল্পের। এ জিনিস দেখলে আমাদের উচ্ছন্নে যাওয়ার আশঙ্কা নেই ভেবেই হয়তো গররাজি হলেন।

সে রাতে বাবা আমাদেরকে যাত্রা দেখাতে নিয়ে গেলেন। খুশিতে আমাদের ফেটে পড়ার দশা। কখন যাত্রা শুরু হবে সে উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পটকা ফাটার বিকট শব্দের সঙ্গে মঞ্চের পর্দা গোটানো শুরু হলো। আমাদের মনে হলো অসম্ভব ধীরে করা হচ্ছে কাজটা।

মঞ্চে কিছুই দেখা যাচ্ছে না: মঞ্চ আর আমাদের মাঝখানে ধোঁয়ার ঘন দেয়াল। ধোঁয়া সরে যেতে দেখলাম কয়েকজন নারী-পুরুষ প্রার্থনা করছে। প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর জোকাররা নানা অঙ্গভঙ্গি করে দর্শকদের হাসাতে চেষ্টা করল। তবে আমার মোটেই হাসি পেল না। হাই উঠতে লাগল। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, জেগে গেলাম বাবার গাট্টা খেয়ে। দাঁতে দাঁত ঘষে তিনি বললেন, 'হারামজাদা! শুয়ারের বাচ্চা! আমার রক্তজল করা পয়সা খরচ করে তোদেরকে যাত্রা দেখাতে এনেছি

হল-এ ঘুমানোর জন্য? আর কখনও যদি বলেছিস কোথাও নিয়ে যেতে স্রেফ হাড্ডি গুঁড়ো করে ফেলব।'

আমি চোখ ঘষতে ঘষতে মঞ্চের দিকে তাকালাম। পাণ্ডবরা কৌরবদের সঙ্গে পাশা খেলছে। একেকটা দান ফেলছে, উত্তেজিত হয়ে উঠছে দর্শক। সহায়-সম্পত্তি সব হারানোর পর পাণ্ডবরা তাদের পাঁচ ভাইয়ের একমাত্র স্ত্রী দ্রৌপদীকে বাজি ধরল। সবাই মজে গেল এ দৃশ্যে। দ্রৌপদীর জন্য খুব মায়া লাগল আমার। মনে মনে বললাম: 'আমি যদি পাণ্ডব হতাম নিজের জীবন বাঁচাতে কোনদিন দ্রৌপদীকে বাজি ধরতাম না।'

শীঘ্রি বাজিতে দ্রৌপদীকে হারাল পাণ্ডবপক্ষ। কৌরবপ্রধান দুর্যোধন দ্রৌপদীকে নিয়ে আসার আদেশ দিল। তাকে ক্রীতদাসীর মত টানতে টানতে নিয়ে আসা হলো মঞ্চে। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে যেতে তাকে চুলের মুঠি ধরে আবার মঞ্চে ফিরিয়ে আনল দুর্যোধনের ভাই দুঃশাসন। জোর করে বসিয়ে দেয়া হলো দুর্যোধনের কোলে।

এহেন অপমান করার পর দুর্যোধন দুঃশাসনকে হুকুম দিল দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের জন্য।

হলঘরের সবাই বকের মত গলা বাড়াল মঞ্চের দিকে। ঈশ্বর ভীরু কয়েকজন দর্শক রাম নাম জপতে লাগল।

দুঃশাসন শাড়ি খুলে ফেলছে, দ্রৌপদী চোখ বুজে দু'হাত জড়ো করে প্রভু কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করল: ' আমাকে দয়া করো। আমাকে বাঁচাও। রক্ষা করো এই অসম্মান থেকে। তুমি লাখো নারীর সম্মান বাঁচিয়েছ। আমার সম্মানও বাঁচাও।'

দ্রৌপদীর প্রার্থনা এমন যে হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তার অর্ধেক শাড়ি খুলে ফেলার পর দর্শক মহলে উত্তেজনা চেঁচামেচিতে পরিণত হল। কারণ দ্রৌপদীর লজ্জা ঢাকার জন্য আকাশ থেকে প্রভু কৃষ্ণ এখনও কাপড় ছুঁড়ে দেননি।

দর্শক চিল্লাতে লাগল, ' দ্রৌপদীকে কাপড় দিয়ে ঢাকো! কাপড় দিয়ে ঢাকো!'

অতি উৎসাহী কিছু দর্শক বসে থাকতে পারল না। তারা উঠে দাঁড়িয়ে দ্রৌপদীর লজ্জা ঢাকার ব্যবস্থা করার জন্য গলা ফাটাতে লাগল। কিশোর আর তরুণরা উঠে পড়ল চেয়ারে, শিস দিচ্ছে , কুকুর বেড়ালের গলায় ডাক ছাড়ছে, সোৎসাহে বেঞ্চির গায়ে লাথি মারছে।

হঠাৎ বিকট শব্দে একটা বেঞ্চি ভেঙে পড়ল, চেঁচামেচি থেমে গেল মুহূর্তের জন্য। পর্দার আড়াল থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ, 'প্রভু কৃষ্ণ আজ দ্রৌপদীকে রক্ষা করতে আসবে না। কারণ গত চার মাস ধরে তার বেতন বকেয়া পড়ে আছে।'

লেখক পরিচিতি

সতীন্দ্র সিংহের জন্ম ১৯২৪ সালে। পেশায় রাজনৈতিক সাংবাদিক এবং গল্প লেখক। 'মুক দিল গাল' নামে তাঁর ছোট গল্পের একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

হ্যাপি নিউ ইয়ার

অজিত কাউর

দীর্ঘদিন টাইপ রাইটার নিয়ে মুখ বুঁজে কাজ করার পর কাপুরের ভাগ্য হঠাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে গেল। রাতারাতি সাধারণ ও সাদামাটা কাপুর থেকে তার উন্নতি ঘটল কাপুর সাহেব-এ। মাননীয় মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে। গর্বে কাপুরের বুক কয়েক ইঞ্চি ফুলে উঠল। সে অফিসের করিডরে বনমোরগের মত বুক চিতিয়ে হাঁটতে লাগল। তার মনে হলো করিডরটা বড্ড সরু, বুক চিতিয়ে হাঁটা যাচ্ছে না। যেসব পিয়ন টুলে বসে পান চিবোচ্ছিল কিংবা ঘুমে ঢুলছিল, তারা কাপুরকে দেখে লাফ মেরে খাড়া হলো।

নতুন বছর আসার অল্প ক'দিন আগে এ ঘটনা ঘটল। এতদিন কেরানি কাপুরের কাছে 'নিউ ইয়ার্স ডে' বিশেষ কোনও তাৎপর্য বহন করত না। বছরটা বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে যাচ্ছে কিংবা ক'দিন বাদে নতুন একটা বছরের আগমন ঘটছে, এসব নিয়ে কাপুর কখনোই মাথা ঘামায় নি। তার কাছে একত্রিশে ডিসেম্বর ত্রিশ ডিসেম্বর থেকে আলাদা কিছু ছিল না। জানুয়ারির প্রথম হপ্তা তার কাছে মাসের অন্যান্য দিনগুলোর মতই মনে হয়। কারণ মাসের প্রথম হপ্তায় বেতন পেয়ে তার অর্ধেকের বেশি শেষ হয়ে যায় দেনা শোধ, বাচ্চাদের স্কুলের নতুন বই, ইউনিফর্ম, পেন্সিল আর ছেঁড়া মোজার বদলে নতুন মোজা কিনে।

তবে কাপুর থেকে কাপুর সাহেবে উত্তরণ ঘটতে তার জীবন যাত্রার পদ্ধতি অনেকটাই বদলে গেল। অবশ্য পরিবর্তনটা ঘটল খুব সাধারণভাবে।

এক ব্যবসায়ী, অবশ্য শিল্পপতি বললেই ভালো শোনায়, মন্ত্রীর বাড়িতে এলেন নিউ ইয়ারের উপহার নিয়ে। তিনি এলেন ৩১ ডিসেম্বর, সকাল আটটায়। মি. কাপুরকে বাইরের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মন্ত্রী মহোদয় শিল্পপতির আনা পার্সেলের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'দু:খিত, মদপান আমি ছেড়ে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী মদপানকে কীরকম চোখে দেখেন জানেনই তো। প্রধানমন্ত্রী হুকুম দিয়েছেন....'

শিল্পপতি মন্ত্রীর মাকে নিয়ে মনে মনে একটা গালি দিলেন মন্ত্রীকে। তার আশঙ্কা হলো হারামজাদা মন্ত্রীটা তার হাত পিছলে চলে যাচ্ছে। তিনি বত্রিশ পাটি দাঁত বের

করে হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, স্যার। আমি আপনার জন্য কাল বা পরশু অন্য কিছু নিয়ে আসব। তবে নিউ ইয়ার চলে এসেছে কিনা। আপনাকে কিছু না দিয়ে চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে।' তিনি ব্রিফকেস খুললেন। মন্ত্রীর সামনে, টেবিলের উপর একটা ডাইরি রাখলেন। সরকারি ছাপাখানায় ছাপা সস্তা ডাইরি। ভেতরে মোটা সোটা একটা খাম। মন্ত্রী ডাইরি খুললেন, আঙুল দিয়ে টিপে পরখ করলেন খামের ঘনত্ব। তার চেহারা উজ্জ্বল দেখাল। বললেন, 'এত কষ্ট করার সত্যি কোনও দরকার ছিল না।'

'না, না, স্যার, কষ্ট কীসের,' এবার মাড়িসুদ্ধ দেখিয়ে দিলেন শিল্পপতি। 'এটা আপনার ছেলেমেয়ের মিষ্টি খাওয়ার জন্য।

এবার মন্ত্রীর দন্ত প্রদর্শনের পালা। তিনি আড়াই ভাগ দাঁত শিল্পপতিকে দেখিয়ে টেবিলের ড্রয়ারে আলগোছে রেখে দিলেন খাম।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন শিল্পপতি। খুশি মনে বেরিয়ে এলেন মন্ত্রীর ঘর থেকে। মন্ত্রীর জন্য আনা পার্সেলটা দিয়ে দিলেন কাপুরকে। মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবকেও খুশি রাখতে হয়। ঘটনা এত দ্রুত ঘটে গেল যে কাপুর না পারল না বলতে না পারল ধন্যবাদ দিতে। জীবনে এই প্রথম কেউ তাকে কিছু উপহার দিল।

শিল্পপতি মৃদু হেসে বললেন, 'এটা নিউইয়ারের ছোট একটি উপহার।' তিনি কাপুরকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেলেন। মদের বোতলটা ড্রয়ারে রাখার সময় হাত কাঁপল কাপুরের। শরীর গরম হয়ে উঠেছে।

টাইপিস্ট বশিষ্ঠ কাপুরের সঙ্গে একই ঘরে বসে। সে মন্ত্রীর টাইপিস্ট। বহুদিন ধরে একই জায়গায় বসে কাজ করে আসছে। কাপুর যেদিন তার নতুন চেয়ারে বসতে গেল, বশিষ্ঠ নিজের পরিচয় দিয়ে হেসে বলেছিল, 'কিস্যু ভাববেন না, স্যার। আপনাকে গেরোর সব ফাঁক ফোকর শিখিয়ে দেব। মন্ত্রীরা আসে যায়; তাদের চাকরি স্থায়ী নয়। তবে আপনার অনুগত এই ভৃত্যটি নিজের পদে রয়েছে বহুদিন ধরে এবং সে এ ঘরের আসা-যাওয়ায় সম্পূর্ণ অভ্যস্ত। আপনার কাছে কোনও ঝামেলাই ঘেষতে দেব না।'

বশিষ্ঠ কাপুরের অস্বস্তির কারণ বুঝতে পারছিল। কাগজে মোড়া একটা পান খুলে টপ করে মুখে পুরল সে, হেলেদুলে এগিয়ে গেল কাপুরের কাছে। 'অভিনন্দন, কাপুর সাহেব। প্রথম উপহার নববধূর নাকফুল সরানোর উৎসবের মত। আপনার অনুগত ভৃত্যদের দিকে একটু খেয়াল টেয়াল করুন। আমরা আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করব।'

এসব খেলায় কাপুর একদম নতুন। সে জানে পুরো বোতল হুইস্কি একা সাবাড় করা তার পক্ষে একদমই সম্ভব নয়। কাউকে সঙ্গী করতে হবে। আর টাইপিস্টের ইঙ্গিতও পরিষ্কার। সে বলে উঠল, 'অবশ্যই ! অবশ্যই !'

'বেশ ! বড় সাহেবরা বড় বড় হোটেলে মাঝরাতে পরস্ত্রীর সঙ্গে নাচানাচি করে নিউইয়ারকে স্বাগত জানাবে। আর আমরা আপনার বাড়িতে সন্ধ্যায় যাব নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে। আমি কী গুপ্তাকে নিয়ে যাব সঙ্গে ?' গুপ্তা অফিসের দ্বিতীয় টাইপিস্ট। সে আরেক ঘরে বসে দু'জন কেরানীর সঙ্গে। গুপ্তা ডাকে আসা চিঠিপত্র বাছাই করে। অন্যরা ডেসপ্যাচের কাজ করে।

'অবশ্যই !' সরল গলায় বলল কাপুর।

ওই দিন অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরল কাপুর। অ্যাটাচি কেসে স্কচের বোতল। তবে স্ত্রীর শানিত জিভের ধারালো ফলার শব্দ হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। 'তুমি এসব ছাইপাঁশ এনেছ বাড়িতে বসে খাওয়ার জন্য ? বাচ্চাদের সামনে বসে খাবে ! নিউ ইয়ার ? কীসের নিউ ইয়ার ? আজ মাসের একত্রিশ তারিখ অথচ বাড়িতে দানাপানি কিছু নেই। মুদি দোকানে আমি আর বাকি চাইতে পারব না। গতকালই ওকে বলেছি এ মাসে আর বাকিটাকি নেব না। বলেছি হিসেবটা করে রাখতে। এক/দুই তারিখ শোধ করে দেব টাকা। দোকানে ইতিমধ্যে একশ তিরাশি টাকা বাকি পড়েছে। আবার বাকি আনতে গেলে সবতো তোমার মেহমানদের পেটে যাবে। তারা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বাড়ি ফিরবে আর আমাদের কী হবে ? আমরা কী খাব ? সামনের মাসে গুরুদোয়ারার লঙরখানায় ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে যাই তাই চাও তুমি ? নিউ ইয়ার বটে! এসব বড়লোকদের ব্যাপার। পাঁচতারা হোটেল ছাড়া যাদের খাওয়ার রুচি হয় না। আমাদের মত গরীবদের একটা পয়সা বাড়তি খরচ করার উপায় নেই। মাসের ত্রিশটা দিন কত কষ্ট করে চালাতে হয় সে শুধু আমি জানি !'

বেচারী কাপুর এখন কী করে ? কুমিরের মুখে মাথা ঢুকিয়ে দিলে কামড় তো খেতে হবেই। সে তেলানো গলায় ব্যাখ্যা করতে গেল, 'আমার সোনা বউ ! নিউ ইয়ার হলো ইংরেজী উৎসব, আমাদের বৈশাখী কিংবা দিওয়ালির মত।' কিন্তু সোনা বউ তার স্বামীর কথা কানে তুলল না। রাগে গজগজ করতে লাগল।

ঠিক রাত পোনে আটটার সময় অফিসের দুই কেরানি তাদের স্ত্রী আর বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে হাজির হয়ে গেল কাপুরের বাড়িতে। বউ আর বাচ্চারা চলে গেল অন্দর মহলে। কেরানির সন্তান বলেই বাচ্চাগুলো তাদের মায়েদের আঁচল ধরে থাকল শক্ত করে এবং কুকুর ছানার মত মাঝে মাঝে দু'একটা কাঁইকুই শব্দ করল। বাইরে খুব ঠান্ডা। তাই মায়েরা তাদের বাচ্চাদের বাইরে খেলতে যেতে দিল না।

বৈঠক খানায় স্কচের বোতল নিয়ে বসেছে পুরুষরা। প্লেটে কাজু বাদাম। ভেতরের ঘরে মহিলারা বাজারে আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে কথা বলছে।

'প্রমোশন হওয়ার জন্য কাপুর সাহেবের কাছে আমাদের একটা খাওয়া পাওনা রইল,' বলল বশিষ্ঠ। বেলুনের মত ফুলে উঠল কাপুর। তবে মুখ ব্যাজার একটা ভাব ফুটিয়ে বলল, 'কীসের প্রমোশন রে, ভাই ! বেতন বাড়লে না তাকে প্রমোশন বলে। আমার শুধু কাজের চাপই বেড়েছে। আগে সকাল সাড়ে দশটায় অফিসে যেতাম, বিকেল সাড়ে চারটায় চলে আসতাম। আর এখন মন্ত্রীর বাড়িতে সকালে পোনে আটটায় হাজিরা দিতে হয়, থাকতে হয় রাত পোনে আটটা ন'টা পর্যন্ত। আপনারা তো সবই জানেন। নতুন করে আর কী বলব।'

'কাজের গুল্লি মারেন, কাপুর সাহেব। আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি কত বেড়ে গেছে, স্টাটাস বেড়েছে তা ভাবুন,' মন্তব্য করল গুপ্তা। 'আপনার চেয়ারে যারা বসার সুযোগ

পায় তাদের জীবনে অনেক কিছুই ঘটে। সুদের কথা মনে আছে ? পুরো নাম নরিন্দর সুদ। আপনার চেয়ারেই বসত সে। বছর আস্টেক আগে বোম্বের একটা ফার্মের লাইসেন্স আটকে গিয়েছিল মন্ত্রণালয়ে। ফার্মের লোকজন মন্ত্রীর পেছনে অনেকদিন ধরে ঘোরাঘুরি করছিল। কিন্তু মন্ত্রী যেন হাঁসের মত। এক ফোঁটা জলের ছিটাও রাখতে চান না গায়ে। মন্ত্রীর নাগাল কিছুতেই না পেয়ে হতোদ্যম বোম্বাইয়া পার্টি শেষে সুদের বাড়ি আসে। তাকে প্রায় পায়ে ধরার মত অবস্থা। সুদ এমন করিৎকর্মা লোক, কীভাবে কীভাবে এক মাসের মধ্যে বোম্বের ফার্মের লাইসেন্স খালাস করে দেয়। বোম্বাইয়া পার্টির প্রতিবার দিল্লি আসতে পাঁচ/ছয় হাজার রূপী খরচ হতো। কাজেই সুদকে তাদের ফার্মে ভিড়িয়ে নিলেই হয় ? তারা সুদকে চাকরি ছাড়তে বলে। দিল্লিতে সুদকে তারা রেসিডেন্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বানিয়ে দেয়। সুদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসের ব্যবস্থা করা হয়, সে বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট পেয়ে যায়। এখন সুদ সাহেব তার সুন্দরী সেক্রেটারিকে নিয়ে শোফার চালিত গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন অফিসের দাওয়াতে ডিনারে যায়। প্রতিরাতে কর্মকর্তাদের সঙ্গে ওবেরয়, তাজ বা মৌর্য'র মত দামী হোটেলে তাকে ডিনারে দেখা যায়। প্রতি মাসে তার হাত দিয়ে লাখ লাখ টাকা লেনদেন হচ্ছে। প্রতিদিন সে আমদানী করা কাপড় দিয়ে বানানো সুট পরে অফিসে যায়।' বশিষ্ঠ এমনভাবে সুদের গল্প বলল যেন সুদ তার রক্তের ভাই।

'বন্ধু,' বলল বশিষ্ঠ। 'কেরানীরা পরের জন্মে কুকুর, বেড়াল, বিছা, কাছিম, শূয়োর ইত্যাদি রূপে পুনর্জন্ম নেয়। চুরাশি লাখ মানুষের এ দেশে মাত্র একজনের পূনর্জন্ম ঘটে দেশ শাসন করার জন্য। আর একজন কেরানির মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী হওয়ার সৌভাগ্য লাখে একজনেরও হয় কিনা সন্দেহ। আপনি নিঃসন্দেহে সেই সৌভাগ্যবানদের একজন।'

'হতে পারে,' হাসল কাপুর। 'কিন্তু কাজের যে চাপ তা থেকে রক্ষা পাবার কোনও উপায় নেই। কাজের চাপ দিনদিন বেড়েই চলেছে। আপনাদের বৌদি তো গত দশদিন ধরে আমার উপর রেগে আগুন হয়ে আছে।

'উনি আসলে আপনাকে ঠিকমত মূল্যায়ন করতে পারছেন না,' বলল গুপ্তা।

'বৌদিকে বোঝান না কেন ? বলেন না কেন যে চেয়ারে আপনি বসেছেন তার দাম কতখানি ? তাহলে উনি আপনাকে হালুয়া রুটি বানিয়ে খাওয়াবেন,' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিতে ফেটে পড়ল বশিষ্ঠ।

'বউকে কী বোঝাব ?' অসহায় একটা ভঙ্গি করল কাপুর। 'সে পারলে আজ এই বোতল আমার মাথায় ভাঙত।'

বশিষ্ঠ বলল, 'তবু বৌদিকে বোঝাতে হবে।'

তাকে সমর্থন করল গুপ্তা। বলল কাপুরের বৌকে বোঝানো দরকার কত মানুষ কত তেল মেখেও কাপুর সাহেবের মত পদ পায় না। আর পদ যত বড় কাজের চাপও তত বেশি। এটা উপলব্ধি করতে হবে কাপুরের বৌকে।

'প্রধানমন্ত্রীর কথাই ধরুন,' বলল বশিষ্ঠ। 'বেচারাকে প্রতিদিন আঠের / উনিশ ঘন্টা খাটতে হয়। নির্বাচনের সময় তাকে একের পর এক গ্রামে যেতে হয়। এর বদলে প্রধানমন্ত্রী যা পান তার মূল্য বিশাল।'

'ঠিক বলেছেন ! মন্ত্রী আর রাজনীতিবিদরা খামোকা দৌড়ঝাপ করেন না। সময় আসুক আপনার স্ত্রী খুশিতে নাচবেন আর গাইবেন। আপনার মাথাটা তিনি কোলে নিয়ে চুমুও খাবেন,' হাসছে বশিষ্ঠ।

বোতল প্রায় খালি হয়ে এসেছে। কাজু বাদামের দু'একটা টুকরো পড়ে আছে প্লেটে। গুপ্তা ঘড়ি দেখল। 'বন্ধুগন, সাড়ে ন'টা প্রায় বাজে। খাওয়া দাওয়ার পাট সেরে ফেলা দরকার। সাড়ে দশটার পরে আর বাস পাব না। আমরা তো আর মন্ত্রী না যে হুকুম দিলেই গাড়ি চলে আসবে.....। উঠে পড়ল কাপুর। গেল ভেতরের ঘরে। একটু পর তার বাচ্চারা বাটি ভর্তি মসুর ডাল আর আলুর তরকারি নিয়ে এল। পুরুষরা বাইরের ঘরে বসে খেল; স্ত্রী আর বাচ্চারা ভেতরের ঘরে। কাপুরের বউ ব্যস্ত থাকল রুটি বানাতে; তার বাচ্চারা ছুটোছুটি করে দুই ঘরে অতিথিদের গরম রুটি পরিবেশন করল। রাত সোয়া দশটার দিকে বিদায় হলো মেহমান।

নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে কাপুরের। সে ঘরে ঢুকে বিছানা করতে লাগল। শুনল বাসনকোসন ধুতে ধুতে গজগজ করছে তার স্ত্রী। 'নিউ ইয়ার ! এমন শীতের রাতের নিউ ইয়ারের খ্যাতা পুড়ি। এসব নিউ ইয়ার ফিয়ার মানায় সাদা চামড়ার সাহেবদের। জাহান্নামে যাক নিউ ইয়ার।'

অনেকক্ষণ পরে নিভল ঘরের বাতি। দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ল বাচ্চারা। কিন্তু কাপুরের বউ ঘোঁত ঘোঁত করেই চলেছে। বলল, 'এই নিউ ইয়ার দিয়ে হবেটা কী ! জানুয়ারির ২ তারিখ নিউ ইয়ার হয় না কেন ? তাহলে তুমি বেতনটা পেতে।'

চুপ হয়ে রইল কাপুর।

তার স্ত্রী অন্ধকারে আরও খানিকক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করল। মাঝ রাতে পাঁচতারা হোটেলে যখন নিভু নিভু হয়ে এল আলো যাতে বড়লোকরা পরস্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে হ্যাপি নিউ ইয়ারের গান গাইতে পারে, ওই সময় কাপুর দম্পতি পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

লেখক পরিচিতি

অজিত কাউর (১৯৩৪-) বিশিষ্ট পাঞ্জাবী লেখিকা। তাঁর লেখা ছোট গল্পের সংকলনের মধ্যে অন্যতম হলো গুলবানো, মাহিক দি মউত, বাট শিকান, সভিয়ান ও চুবিয়ান। জনপ্রিয় উপন্যাসিকার মধ্যে রয়েছে পোস্টমর্টেম, ধুপ ওয়ালা শেহের, খানা বাদোশ ও কাচ্চে রঙ্গা শেহের। তিনি ১৯৮৪ সালে পাঞ্জাবী একাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। ১৯৮৬ সালে তাকে খানা বাদোশ উপন্যাসের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়।

পূর্ণিমার রাতে

কার্তার সিং দুগাল

পরিচয় না জানা পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করতে চায় না মালা এবং মিনি মা মেয়ে; দেখলে মনে হয় দুই বোন, মিনি তার মায়ের চেয়ে সামান্য লম্বা। লোকে বলে, 'মালা, তোমার মেয়েটি খুব সুন্দরী।' তারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। মিনি যেন মুক্তো, সবসময় ঝলমল করছে। ও যেমন রূপবতী তেমনই আচরণে সংযত।

মেয়ের দিকে তাকালে মালার মনে হয় নিজেকেই দেখছে। তরুণী বয়সে মেয়ের মতই অসম্ভব রূপবতী ছিল সে। তবে মালার বয়স এমন কিছু বেশি নয়। এখনও কেউ কেউ আছে যে মালার জন্য পাতালে যেতেও দ্বিধা করবে না।

মাঝে মাঝে মালা ভাবে এই লোকটির কথা তার এমন মনে পড়ে কেন? লোকটা নিশ্চয় মুক্তো ব্যবসায়ী নইলে তার কথা ভাবলেই মালার চোখ দিয়ে মুক্তো ঝরে কেন? মেয়ে বড় হয়েছে: তার এখন পরপুরুষের চিন্তা করা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। এতগুলো দিন তো সে এসব থেকে দূরেই ছিল; মন কেন আবার উচাটন হতে লাগল? নিজেকে সংযত করতেই হবে। সামনের হপ্তায় মেয়ের বিয়ে; তার এখন এসব খারাপ চিন্তা করা মোটেই উচিত হচ্ছে না- মোটেই না।

'প্রিয়তমা আমার,' গতকালই লোকটার চিঠি পেয়েছে মালা। 'ভুলো না আমায়।'

তবে সে যতবার গাঁয়ে এসেছে প্রতিবারই তাকে নিরুৎসাহিত করেছে মালা। দরজা বন্ধ করে রেখেছে, বুজে থেকেছে চোখ। কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা। মালা তার জীবন; মালাকে ছাড়া তার শান্তি নেই। বহুদিন ধরে মালার জন্য অপেক্ষা করছে সে, আকুতি জানিয়ে আসছে, প্রেম আর আবেগের জ্বালা সইছে।

মালা জানে আজ রাতে লোকটা আসবে। প্রতি পূর্ণিমা রাতে সে আসে। মালার দরজায় আঙুলের গাঁট দিয়ে ঠকঠক শব্দ করে। আজ পূর্ণিমা রাত। আজ রাতটা হবে ঠান্ডা, কুয়াশায় ঢাকা এবং স্থির। মালা কখনও লোকটার জন্য দরজা খুলে দেয়নি। আজ রাতে কি খুলবে? কয়েক বছর আগের ঠান্ডা এক পূর্ণিমা রাতের কথা মনে পড়ে যায় মালার। ও নাচছিল আম বাগানে। তার দোপাট্টা উড়ে চলে গিয়েছিল লোকটার

হাতে। সে খালি মাথায়, মুখে চাঁদের আলো মেখে লোকটার কাছে গিয়েছিল। তার কাঁধে দোপাট্টা জড়িয়ে দিয়েছিল সে- ঠিক এখন যেভাবে ওটা জড়িয়ে আছে। শিরশির একটা ঢেউ ওঠে মালার শিরদাঁড়ায়।

মিনি রাস্তা ধরে হেঁটে আসছে। দেবদারুর মত লম্বা, সুঠাম তনু। এত ফর্সা ত্বক, কেউ হাত দিলে যেন দাগ পড়ে যাবে। ওর মাথায় দোপাট্টা জড়ানো, চোখ মাটিতে রেখে হাঁটছে মিনি।

মন্দির থেকে ফিরছে মেয়েটি। সবার মঙ্গল চেয়ে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেছে। মাকেও বলেছে প্রার্থনা করতে। মিনির বিশ্বাস, প্রার্থনা করলে ঈশ্বর তা মঞ্জুর করেন। মালা হেসেছে। তার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলে কী চাইবে সে?

'বাবা এখনও ফিরল না!' অনুযোগ মিনির কণ্ঠে।

'আজ তার ফেরার কথাও না। কাল যদি বাড়ি আসতে পারে তো ভালই। তাকে অনেক কিছু কিনতে হবে। বিয়ে আর লোক খাওয়ানোয় অনেক হ্যাপা। কিছু যেন কম পড়ে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়।' ব্যাখ্যা করল মালা।

রূপাখচিত দোপাট্টা খুলে মার কাঁধে রাখল মিনি। মা'র সাধারণ দোপাট্টাটি নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল।

পূর্ণিমার চাঁদের আলো গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে, থইথই করছে মালার মুখ। পূর্ণিমা চাঁদ কেমন নেশা ধরায় মালার বুকে, মনে হয় যেন মাতাল হয়ে গেছে। আর চারদিন বাদে মহিলারা এসে ওর উঠোনে বসে বিয়ের গীত গাইবে। তারা তার মেয়ের হাতের তালুতে আর পায়ে মাখিয়ে দেবে মেহেদী। পরিয়ে দেবে বিয়ের পোশাক, গহনায় সাজিয়ে দেবে গা। লাল টকটকে সিল্কে কেমন দেখাবে তার মেয়েকে? বর আসবে ঘোড়ায় চড়ে, মেয়েকে নিয়ে যাবে নিজের বাড়ি। প্রেম করবে তার সঙ্গে। চুমু খাবে মেহেদী পরা হাত আর পায়ে।

খুব বেশি দিন হয়নি এসব ঘটেছে মালার জীবনে। কিন্তু মিনির বাবা কখনও তার পায়ে চুমু খায়নি কিংবা কোনদিন মেহেদী পরা হাতের তালু নিজের চোখের ওপর চেপে ধরেনি। সে সবসময় ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। খেয়ে বিছানায় শুয়েই নাক ডাকতে শুরু করে। মাঝে মাঝে পুত্র সন্তানের কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠলে মাঝরাতে মালার ওপর চড়াও হয়। আর এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে যায় যে অতৃপ্ত মালাকে শান্ত হতে রাতের আকাশের তারা গুনতে হয়। মাঝরাতের এই কাণ্ডে প্রতি বছর একটি করে মেয়ে উপহার দিয়েছে মালা। অনাকাঙ্খিতভাবে তারা ভূমিষ্ঠ হয়েছে, অনাদরে বিদায় নিয়েছে। শুধু টিকে গেছে মিনি। অবিকল মায়ের চেহারা পেয়েছে সে। মায়ের মত মেয়ের বড় বড় হরিণী চোখ, তার লম্বা, কালো চুল সরু কোমর ছাপিয়ে যায়। মায়ের মতই ভরাট একজোড়া বক্ষের অধিকারিণী সে।

মিনি রান্নাঘরের বাসন কোসন ধুয়ে রাখল, উঠোনের দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে ঢুকল ঘুমাতে। একা হয়ে গেল মালা।

রাত অনেক হয়েছে। চাঁদ উঠে এসেছে মাঝ আকাশে। এমন ঝলমল করছে যেন সমস্ত আলো ঢেলে দিয়েছে মালাদের বাড়ির উঠোনে। শীত পড়েছে। তবে তেমন ঠাণ্ডা লাগছে না মালার। নিজেকে প্রশ্ন করল, উঠোনে কেন একা বসে আছে সে? কাউকে কি আশা করছে? মিনি বিছানায় গেছে, তার বাপ শহরে। এমন চাঁদনী রাতে তার বাড়ির বাইরে থাকার দরকার কী? পূর্ণিমা রাতে মালা নিজেকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখে, যাতে প্রলোভনের কবলে পড়ে না যায়। কিন্তু আজ রাতে সে মেয়ের রূপোখচিত দোপাট্টা জড়িয়ে রেখেছে মাথায়। রূপালি চাঁদের আলোয় দোপাট্টার রূপোর কাজগুলো ঝকমক করছে, যেন আকাশের তারারা আশ্রয় নিয়েছে মালার মাথায়। ঝিলমিল করছে তার চোখের পাতায়, মুখে এবং কাঁধে। একটা রাতজাগা পাখি ডেকে উঠল আম বাগানে–অক্, অক, অক।

মেয়ের কথা ভাবছে মালা। তার মেয়ের আর এক হপ্তার মধ্যে বিয়ে হয়ে যাবে। তারপর সে একা হয়ে যাবে- এ বাড়ির প্রকান্ড উঠোনে একদম একা। শিরশির করে উঠল গা। খালি উঠোন তাকে আতঙ্কিত করে তোলে। তবে একা থাকার অভ্যাস করতে হবে তাকে। তার স্বামী টাকা রোজগারের ধান্ধায় খুব বেশি ব্যস্ত। সে লোককে সুদে টাকা ধার দেয়। অনেক রাতে বাড়ি ফেরে শুধু খাটিয়ায় শরীরটাকে ফেলে দেয়ার জন্য। সে টাকার পেছনে এত দৌড়াচ্ছে কেন একদিন জিজ্ঞেস করছিল মালা। জবাব পায়নি।

ঘরে গেল মালা। মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মরার মত ঘুমাচ্ছে। লাল চুড়িগুলো খুলে রেখেছে বালিশের পাশে। বোকা মেয়ে ! ঘুমের মধ্যে একবার পাশ ফিরলেই মটমট করে ভেঙে যাবে কাঁচের চুড়িগুলো। মালা ওগুলো তুলে নিয়ে আলমারির ওপর রাখল। তারপর কী মনে করে নিজেই পরে ফেলল। এক হাতে ছ'টা, অন্য হাতে ছ'টা। অন্ধকারেও ঝিলিক দিচ্ছে চুড়িগুলো। চুড়িঅলার কাছ থেকে নতুন কিনেছে মিনি।

মালা চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া উঠোনে ফিরে এল, মাথায় জড়ানো মেয়ের ঝলমলে দোপাট্টা, দু'হাতে উজ্জ্বল লাল রঙের চুড়ির রিনিঠিনি। নিজেকে নববধূর মত লাগছে- উষ্ণ, লাস্যময়ী। শিরায় গরম রক্ত বইতে লাগল মালার।

দরজায় মৃদু টোকার শব্দ হলো। এসেছে সে। সেই একই রকম টোকা-ভীরু, ইতস্ত ত ভঙ্গি। চিঠিতে লিখেছিল সে আসবে; 'ডিসেম্বরের পূর্ণিমা রাতে তোমার দরজায় টোকা দেব আমি। যদি মন চায় তো খোলা রেখো দরজা। আর মন না চাইলে খুলো না। কিন্তু আমি যেভাবে সবসময় করে আসছি, দরজায় টোকা দিয়েই যাব।'

টুক, টুক, টুক- খুব নরম, খুব মিষ্টি, আমন্ত্রণের আহ্বান জানানো টোকা। সে ছাড়া আর কে ! পূর্ণিমা রাতের নিশাচর। হঠাৎ একখন্ড কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ল চাঁদ, আঁধারে ঢেকে দিল বিশ্ব চরাচর। মালার পা ওকে টেনে নিয়ে চলল অন্ধকার

উঠোন দিয়ে। কাঁপা হাতে দরজার খিল খুলল। পরমুহূর্তে বাঁধা পড়ল শক্ত হাতের আলিঙ্গনে। ঠোঁটে মিশে গেল ঠোঁট; দাঁত ঘষা খেল দাঁতে। গত বিশ বছর ধরে চেপে রাখা আবেগের বন্যার বিস্ফোরণ ঘটল, ভাসিয়ে নিয়ে গেল দু'জনকে।

মালা জানে না কীভাবে সে গাঁয়ের বাইরের বো গাছটার নীচে চলে এসেছে। মনে নেই কীভাবে বো গাছের পাশের মাঠে ওরা শুয়ে পড়েছে- জানে না কতক্ষণ ওরা সেখানে ছিল। ভোর বেলা গাঁয়ের পাশ দিয়ে যাওয়া রেলগাড়ির শব্দে সজাগ হয়ে উঠল ও। প্রেমিকের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, মাথায় জড়াল দোপাট্টা, তারপর দ্রুত পায়ে ফিরে চলল বাড়িতে।

হাত থেকে চুড়ি খুলে মেয়ের বালিশের পাশে রেখে দিল মালা। রুপোখচিত দোপাট্টায় আদর করে হাত বোলাল। নিজের দোপাট্টাটা নিয়ে শুয়ে পড়ল খাটিয়ায়। সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল। এমন তৃপ্তির ঘুম জীবনে ঘুমায়নি। যেন সারাজীবন না ঘুমিয়ে কেটেছে তার। যখন জাগল মালা, সূর্য উঠোনে রোদ ছড়াচ্ছে।

'তুমি একদম বাচ্চাদের মত ঘুমাচ্ছিলে !' ঠাট্টা করল মিনি।

মিনি ঘরদোর এবং উঠোন ঝাঁট দিয়ে রান্নাও করে ফেলেছে। স্নান সেরে নিয়েছে। এখন মন্দিরে যাবে। দোপাট্টায় জেসমিন ফুল বেঁধে নিয়েছে তার দেবতাকে উৎসর্গ করার জন্য।

মিনি যাওয়ার পরে খাটিয়ায় শোয়া মালা অলসভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙল। এখনও ঘুমের রেশ কাটেনি, স্বপ্নগুলো মাথার মধ্যে রয়ে গেছে।

মৃদু ঠান্ডা হাওয়া বইছে। উঠোনে রোদ। মালার কানায় কানায় ভরা এক বাটি দুধ খেতে খুব ইচ্ছে করছে। তাতে জেসমিন ফুলের কয়েকটি পাপড়ি ভাসবে। মাথা ঘোরা দূর করার মহৌষধ। মালার চোখ বুজে এল, খুলল, আবার বুজল।

'ও মালা ! মাগীটা গেল কই ?' চেঁচিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ। মুখে ঠাস করে যেন একটা চড় খেল মালা।

'এমন কথা জীবনেও শুনিনি বাপু !' বলল আরেকটি কণ্ঠ।

'অথচ বিয়ের বাকি আর মোটে চার দিন !'

'আমার মেয়ে কী করেছে ?' রাগে গরগর করতে করতে উঠে বসল মালা। 'তোমরা ওকে গাল দিচ্ছ কেন ? সবাই জানে ও কত ভাল মেয়ে। বাছুরের মত নিষ্পাপ।'

খিক খিক হাসির শব্দ শোনা গেল। একজন মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'তোমার নিষ্পাপ বাছুর কাল সারারাত গোবর ঘেঁটেছে।'

গা ঠান্ডা হয়ে এল মালার। শরীর থেকে যেন রক্ত শুষে নিল কেউ, ফেকাসে হয়ে গেল চেহারা।

লাজো, তার প্রতিবেশী বলল, 'অন্ধকারে মাগী পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়েছে, আমি প্রশ্রাব করতে বাইরে যেতে দেখি দু'জনে মাঠের মধ্যে জড়াজড়ি করছে। আমি সারারাত

দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। আমাদের ঘরেও তো মেয়ে আছে বাপু। তারা তো জীবনেও এভাবে বাবা মা'র মুখে চুন কালি মাখাবে না।'

মালা পাথর হয়ে বসে রইল খাটিয়ায়। চেহারা দেখে মনে হলো না কানে কিছু ঢুকছে।

গাঁয়ের চৌকিদার লাজোর গল্পের যোগানদার হয়ে এল।

'মালা বৌদি,' ডাকল সে।

'কী, জুম্মা ?' গভীর কুয়ো থেকে যেন ভেসে এল মালার কণ্ঠ।

'বৌদি, কাল রাতে যা দেখেছি তা সত্যি বড় লজ্জার। গাঁয়ের চৌকিদারী করতে করতে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললাম, কিন্তু এমন নোংরা ঘটনা জীবনে দেখিনি। তোমার মেয়ে তো তার মুখে চুনকালি মাখাল। কাল রাতে বো গাছটার নীচে এক লোকের সঙ্গে দেখলাম তাকে। আমি ওদের কাছ থেকে বড় জোর হাত দশেক দূরে ছিলাম। দু'জনে মিলে সে কি জড়াজড়ি আর চুমোচুমি ! নিজেদেরকে ছাড়া বাকি দুনিয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল তারা। আমি তোমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম আর চারদিন পরে এ বাড়িতে বিয়ে হবে, কত আমোদ ফুর্তি হবে। এমন সময় উঠোনের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে তোমার মেয়ে। আমি ভোর হওয়ার আগেই মাঠ থেকে ফিরেছি। তোমার মেয়ে ছিনালি শেষ করে কখন বাড়ি ফিরেছে জানি না। আমার মেয়ে হলে ওকে এতক্ষণে দু'টুকরো করে গাঙে ভাসিয়ে দিতাম।'

মালা বিস্ফোরিত চোখে চৌকিদারের দিকে তাকিয়ে রইল, মুখে রা সরছে না।

জুম্মার পরে এল পাহারাদার রতন। রাগে ফেটে পড়ছে।

'কোথায় ছিনাল মাগী ?' গাঁক গাঁক করতে লাগল সে।

'ছিনালি করার জন্য আর মাঠ ছিল না ?' কথা বলার সময় লাফাতে লাগল সে। তার চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ভিড় করে এল প্রতিবেশীরা। 'আমি কুয়োর ধারে গেছি, এমন সময় দেখি দোপাট্টা দিয়ে মুখ ঢেকে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসছে সে। ভেবেছি প্রস্রাব করতে গেছে। একটু পর তার প্রেমিককেও দেখলাম ওই মাঠ দিয়ে বেরিয়ে যেতে। নিজের চোখে দেখেছি দু'জনকে।'

এমন সময় মিনিকে দেখা গেল ভিড় ঠেলে আসতে। তাকে নিয়ে যা আলোচনা হয়েছে সবই শুনেছে। তীক্ষ্ণ গলায় প্রতিবাদ করল সে, 'আপনি মিথ্যা বলছেন, কাকা !'

'আমাকে মিথ্যাবাদী বলিস এত সাহস তোর ছুকরি ? বেশ্যা কোথাকার ! আমার মাঠে তুই না গেলে এই চুড়ি কোত্থেকে এল ?' গায়ের চাঁদরের খুঁট খুলে ভাঙা লাল চুড়ি বের করে মিনির হাতের তালুতে ঠাস করে ফেলল সে। মিনি হাতে পরা চুড়ি গুণল। এগারোটা। চোখের সামনে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল দুনিয়া।

মহিলারা পরস্পর চোখাচোখি করল। তারা মিনিকে চুড়ি কিনতে দেখেছে। মোট বারোটি চুড়ি কিনেছিল মিনি। লাল চুড়িগুলোর প্রতি তার আকর্ষণ ছিল বেশি।

নারী-পুরুষের ফিসফিসানিতে ভরে গেল উঠোন। মিনির হবু শ্বশুর এবং শাশুড়ি ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। রাগের চোটে মালার সামনে বিয়ের উপহার সামগ্রী ফেলতে লাগল-জামা কাপড়, টাকা, আংটি। বরপক্ষকে এগুলো দেওয়া হয়েছিল। আঁতকে উঠল জনতা। মহিলারা তাদের কান স্পর্শ করল, তরুণীরা দাঁতে নখ কাটতে লাগল। তাদের সমাজে বিয়ে ভেঙে যাওয়া মানে জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাওয়া। মিনি যে কাণ্ড করেছে, সবকথা জানাজানি হওয়ার পর ওকে কেউ বিয়ে করবে না। এখন কী করবে সে ? সবাই বলাবলি করল এটাই ঠিক হয়েছে। ছিনালি মাগীর ঠিক সাজা হয়েছে।

লোকের কঠোর সমালোচনা আর গালিগালাজের আওয়াজ ছাপিয়ে ঝপাস করে একটা শব্দ শোনা গেল। একমুহূর্তের জন্য অসাড় হয়ে গেল জনতা। তারপর কেউ একজন চিৎকার করে উঠল 'কুয়ো' ! কুয়োয় কী ঘটেছে ব্যাখ্যা করতে হলো না কাউকে। কী ঘটেছে বুঝতে পেরেছে সবাই।

মিনিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নম্র আর ভদ্র মিনি, যে জীবনে গলা চড়িয়ে কথা বলেনি কারো সঙ্গে, যে জেসমিন ফুলের মত পবিত্র আর খাঁটি, যে মিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করত কখনো ক্লান্তি বোধ করত না, সেই মিনির জন্য হঠাৎ সবাই শান্ত হয়ে গেল, ছুটল কুয়োর দিকে। আর মালা আতঙ্কে জমে গিয়ে বসে রইল নিজের জায়গায়। তার উঠোনে কেউ নেই। খালি। তার উঠোন এত খালি কখনও লাগে নি- আর এই শূন্যতা কোনদিন পূরণ হবে না।

লেখক পরিচিতি

কার্তার সিং দুগালের জন্ম ১৯১৭ সালে। তিনি উর্দু এবং পাঞ্জাবী উভয় ভাষায় লেখেন। তাঁর লেখা ২১টি ছোট গল্পের বই প্রকাশ হয়েছে, লিখেছেন আটটি উপন্যাস, সাতটি নাটক এবং দুটি কবিতার বই সংকলন করেছেন। ১৯৬৫ সালে পেয়েছেন সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার এবং ১৯৮১তে সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহেরু অ্যাওয়ার্ড। ১৯৭৩ সালে তাঁকে দিল্লি প্রশাসন পাঞ্জাবী বিশিষ্ট লেখক হিসেবে সম্মানিত করে। ১৯৮৮তে তাঁকে পদ্মভূষণ পদক দেয়া হয়। লেখালেখির পাশাপাশি কার্তার সিং দুগাল অল ইন্ডিয়া রেডিও'র স্টেশন ডিরেক্টর এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

সোহনি শাহ্ যখন রেগে যায়

জি ডি খোসলা

সোহনি শাহ্ শহরের অন্যতম ধনাঢ্য বস্ত্র ব্যবসায়ীই শুধু নয়, সর্বদা হাসিখুশি একজন মানুষও বটে। তার সঙ্গে স্রেফ গল্প করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়া যায়। বিরাট দোকানের চারপাশে সূতি, সিল্ক আর উলের স্তূপের মাঝখানে পা মুড়ে বসে সোহনি শাহ্, গোলালু মার্কা গোলাপি মুখখানা বেঁচে থাকার আনন্দে জ্বলজ্বল করে। সে একসঙ্গে দশজন খদ্দের সামলানোর ক্ষমতা রাখে, সহকারীদেরকে জোর গলায় জানিয়ে দেয় কাস্টমার কী ধরনের কাপড় দেখতে চাইছে। কর্মচারীরা নির্দেশ মাফিক স্যাটিন, জর্জেট, শিফন, সার্জ, মসলিন, ফ্ল্যানেল, ছিট কিংবা টুকরো কাপড় ছুঁড়ে দেয়। দক্ষতার সাথে ওগুলো ক্যাচ ধরে সোহনি, বছরের পর বছর প্র্যাকটিসের কুশলী হাতে কাস্টমারের সামনে ওগুলো মেলে দেয়।

আপনি যা চাইছেন ঠিক সে জিনিসটি আপনার সামনে হাজির করবে সোহনি শাহ্। তিন হাজার রকম কাপড়ের সম্ভারের প্রতিটির দাম তার জানা। আমার অবাক লাগে ভেবে সে এত নিখুঁতভাবে কাজ করে কীভাবে। কাপড় বিক্রির হিসাবটা রাখে তার পিছনে বসা এক অ্যাকাউনটেন্ট। হাঁটুর উপর রাখা লম্বা খেরো খাতায় মনিবের দ্রুত, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখে রাখে সে।

'ছয় গজ সাংহাই, এক রূপী আট আনা; স্যাটিন ছাপা গজ, প্রতি গজ সাড়ে তিন রূপী; লতা ছবি মার্কা, এক পিস, চল্লিশ রূপী, মসলিন ছাব্বিশ, এক পিস, দশ রূপী'।

মাঝে মাঝে দোকানে ভিড় এমন বেড়ে যায় আর সোহনি শাহ্ তার খদ্দেরকে এমন দ্রুততার সঙ্গে কাপড় বিক্রি করে যে অ্যাকউনটেন্ট হিসেব লিখে রাখতে রীতিমত হিমশিম খেয়ে যায়। কিন্তু সোহনি শাহ্ মুখে দিব্যি সুখী মানুষের হাসি ধরে রেখে কাজ করে যাচ্ছে। আর এ হাসি সার্বক্ষণিক ধরে রাখে সে। তার ব্যবসা করার প্রক্রিয়া দেখেও শেখার অনেক কিছু আছে।

সোহনি শাহ্কে শহরের সবাই সম্মান করে, ভালবাসে। কাপড়ের ব্যবসায় প্রচুর কামালেও সে অত্যন্ত সৎ। কখনও জোচ্চুরি করে না। হৃষ্টপুষ্ট গড়নের সোহনি শাহ্

সাদা শার্ট আর ধুতি পরে দোকানে আসে। মাথায় গান্ধি ক্যাপ, মোটাসোটা হাসিখুশি মুখখানা। সে যখন ভুঁড়ি বাগিয়ে হেলেদুলে রাস্তা দিয়ে হাঁটে, যার সঙ্গেই দেখা হয়, তাকে সম্বোধন করে 'শাহি মহারাজ' কিংবা 'নমস্তে শাহজি', ঘনিষ্ঠ দু'একজনের সঙ্গে ঠাট্টা মশকরাও করে।

কেউ কেউ ঈর্ষা করে সোহনি শাহ্‌কে। বলে পঞ্চাশ বছর বয়সে দ্বিতীয় বিয়েই সোহনি শাহ্‌কে এমন হাসিখুশি রেখেছে। দশ বছর আগে এক তরুণীকে বিয়ে করেছে সে। প্রথম স্ত্রী বিয়োগের পর। তার প্রথম স্ত্রী ছিল স্বামী আর সংসার অন্তপ্রাণ। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে হঠাৎ করেই দ্বিতীয় বিয়ের চিন্তা মাথায় আসে সোহনি শাহ্'র। সে লোহা ব্যবসায়ী শান্তা রামের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করার পরেই নাকি যৌবন ফিরে পায়। 'জানেন না,' ঈর্ষাকাতর লোকগুলো মাথা দুলিয়ে বলে, 'বুড়ো বয়সে যৌবন ফিরে পেতে তরুণীদের সাহচর্যের তুলনা নেই ?' তবে অন্যরা (এদের মধ্যে বেশিরভাগ স্থানীয় বাসিন্দা) সোহনি শাহ্'র প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল। তারা সোহনি শাহ্‌কে কুড়ি বছর ধরে চেনে। আগে তার নাম ছিল সোহন লাল। ব্যবসা করে লাল হয়ে ওঠার বহু আগে থেকেই সে এরকম হাসিখুশি স্বভাবের। লোকে বলে 'সোহনি সুখী কারণ নীতিবোধের প্রশ্নে সে অটল। সে জানে সে কখনও অন্যায় করে না, মানুষ ঠকায় না। সব কাজ সে করে ঈশ্বরের নামে। আর ঈশ্বরও তার প্রতি খুব সদয়।'

বছর আটেক আগে সোহনি শাহ্'র সঙ্গে আমার পরিচয়। তখনই বুঝতে পারি সে কত হৃদয়বান এবং বড় মাপের মানুষ। সে আমার কাছে এক পাইকারি বিক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য এসেছিল। দাম পড়ে যাওয়ায় লোকটা বড় ধরনের একটা চালান নিতে অস্বীকার করছিল। সোহনি শাহ্ ক্ষতিপূরণের দাবি করছিল কিন্তু ডিলার তা দেবে না। আমি অবশ্য সোহনি শাহ্‌কে বলেছিলাম সে ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে।

'ব্যারিস্টার সাহেব,' বলেছিল সোহনি, 'আমি ওদেরকে দেখিয়ে দিতে চাই সোহনি শাহ্‌কে কেউ বোকা বানাতে পারবে না। আমার পাওনা আমি আদায় করবই।'

সরকারের হুকুমে সোহনি শাহ্‌র দাবি পূরণ করা হয় এবং পাইকারি ডিলারের ফার্ম পুরো টাকা দিতে বাধ্য হয়। তারপর থেকে সোহনি শাহ্'র সঙ্গে পেশাদারী কাজে নানা সময় দেখা হয়েছে আমার। আমরা ক্রমে বন্ধু হয়ে যাই। ব্যবসায় কঠোর নীতিপরায়ন, সোজাসাপ্টা লোকটি প্রায়ই ঝামেলায় পড়ে। যেতে হয় আদালতে। তখন ছুটে আসে আমার কাছে। ধুতির কোঁচা দিয়ে ঘামে ভেজা মুখ মুছতে মুছতে বসে পড়ে টেবিলের সামনে ক্লায়েন্টদের জন্য রাখা উঁচু, হাতলহীন চেয়ারে। তারপর হাসিমুখে, সংক্ষেপে এবং পরিষ্কারভাবে তার কেস নিয়ে কথা বলে। তবে প্রতিপক্ষের প্রতি কখনও বিষোদগার করতে দেখিনি তাকে। 'আমি কেন ওদের মন্দ চাইব ?' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলে সে। 'ঈশ্বরই ওদের শাস্তি দেবেন। কর্মফল ওরা এই জীবনে নতুবা পরের জীবনে ভোগ করবে।'

মাঝে মাঝে দু'একটা পার্টি কিংবা সাক্ষীর উপর ধৈর্য্য হারিয়ে রেগে যেতাম। 'সাহেবজী, আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন ? ক্রোধ আপনার বিরাট শত্রু। এ শত্রুকে কখনও ঘরে ঢুকতে দিতে নেই। আপনি সঠিক রাস্তায় থাকলে রেগে যাবার দরকারই হবে না। এবং, চোখ টিপে বলত সে, 'ভুল কিছু করে বসলেও আপনার করার কিছু থাকবে না। রাগ করে কখনও যুদ্ধে জেতা যায় না।'

একবার আমার অফিসে বসে আছি। সোহনি শাহ্ এটা সেটা নিয়ে গল্প করছে। আমি বললাম, 'শাহ্জী, আপনার রসবোধ আর অসীম ধৈর্যের আমি প্রশংসা করি। আপনাকে সবসময়ে সুখী আর হাসিখুশি দেখেছি। তবে মাঝে মাঝে আপনাকে নিয়ে বেশ কৌতূহল হয়। আপনি কি কোনদিনই কারও উপর রাগ করেননি ?

হাসিটা মুছে গেল সোহনি শাহ্'র মুখ থেকে, ভাঁজ পড়ল কপালে। 'হ্যাঁ,' গম্ভীর চেহারায় জবাব দিল সে যেন ভুলে যাওয়া অতীতের কোনও স্মৃতি মনে পড়েছে। 'হ্যাঁ, একবার আমি রেগে গিয়েছিলাম।'

'বলুন না সেই ঘটনা,' অনুরোধ করলাম আমি। সোহনি শাহ্ আমার আহ্বানে সাড়া দিল না।

গলা খাকারি দিয়ে চেয়ারের কুশন ধরে মোচড়াতে লাগল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরেক দিন। আরেক দিন আপনাকে বলব কেন আমি রেগে গিয়েছিলাম আর রেগে গিয়ে বিয়েও করে ফেলি।'

আমাকে রহস্যের মধ্যে রেখে চলে গেল সে।

এরপর বেশ কিছুদিন পরে রোববারের এক সন্ধ্যায় সোহনি শাহ্'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমার। বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমরা পরস্পরের কুশল জিজ্ঞেস করলাম। নানা বিষয় নিয়ে গল্প হলো। হাঁটতে হাঁটতে ওর বাড়ির কাছে চলে এলাম। আমি থেমে দাঁড়ালাম। বিদায় নেব। বেশ প্রফুল্ল মনে আছে সোহনি শাহ্। আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'সাহেবজী, আজ রাতে আমার সঙ্গে দুটো ডালভাত খাবেন।' আমি ইতস্তত করছি দেখে মিষ্টি হাসল। 'চলুন বন্ধু। রোববার আমার জন্য শুভ দিন। এ দিনে আমার মন খুব ভাল থাকে। আমার রেগে যাওয়ার গল্প আজ বলব। গল্পটা শোনার আগ্রহ ছিল আপনার। তা-ই না ?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।

সোহনি শাহ্ শহরের কেন্দ্রস্থলে বিরাট একটি বাড়িতে থাকে। পুরানো স্টাইলে তৈরি বাড়ি। বেশ সাজানো। অপ্রয়োজনীয় অনেক খিলান আর সিমেন্টের মূর্তি চোখে পড়ল। বাড়ির ভেতরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উঠোনের মাঝখানে বড়বড় কয়েকটি ঘর। সোহনি শাহ্ তার পুরো পরিবার নিয়ে এখানে থাকে। সে, তার তরুণী স্ত্রী আর দুই সন্তান বাড়ির সামনের অংশটা দখল করেছে, বড় ছেলে আর তার স্ত্রী তাদের বাচ্চাকাচ্চা

নিয়ে থাকে উঠোনের শেষ প্রান্তে। দুটি পরিবার একই রান্নাঘর ব্যবহার করে। সকল হিন্দু যৌথ পরিবারে তা-ই হয়ে আসছে। আমাকে সামনের বড় ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। এ ঘরের জানালার কাঁচ রঙিন, রাস্তা দিয়ে দেখা যায়। অতিথি এলে ঘরটি একই সঙ্গে বৈঠকখানা এবং খাবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিচ্ছন্ন ঘরটিতে অল্প কিছু আসবাব। দেয়ালে সোনালি ফ্রেমের বড় বড় রঙিন ছবি ঝুলছে, মেঝেতে লাল কার্পেট। একপাশে ধবধবে সাদা একটি চাদর পেতে রাখা। তার উপর মুঘল ঢঙে প্রকান্ড একটি তাকিয়া। জুতো খুলে এ ঘরে ঢুকতে হলো।

সোহনি শাহ্ রাতের খাবারের হুকুম দিল। একটু পরে এক চাকর নিচু, সরু একটি টেবিল এনে তাকিয়ার সামনে রাখল। তারপর নিকেলের মুরদাবাড়ি-বেসিন এনে দরজার পাশে রেখে হাতে তোয়ালে আর জলের লোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আমি হাত মুখ ধুয়ে নিলাম।

চাকর দুটো বড় রূপোর ট্রে নিয়ে এল। তাতে ছ'সাতটি রূপোর বাটিতে সাজানো সব্জির নানা পদ। মাংস নেই। সোহনি শাহ্ নিরামিশাষী জানি। তাই এ জিনিসের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তবে একটা ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তিন বাটি দই। তিন রকমের। প্রথম বাটিতে টক দই, দ্বিতীয়টিতে মিষ্টি, তৃতীয় বাটিতে টক-মিষ্টি দই। আমি না বলে পারলাম না, 'শাহ্জী, আপনি বোধহয় দই খুব পছন্দ করেন। জিনিসটা ভাল। তবে শুনেছি রাতে দই খেতে নেই।

চুপ করে রইলাম আমি বিষয়টি নিয়ে আর কথা বাড়ানো শোভন হবে না ভেবে। খাওয়ায় মন দিলাম।

আমার নিমন্ত্রণকর্তা হঠাৎ ফেটে পড়ল হাসিতে। আমার বিব্রত ভাবটা উপভোগ করছে। বলল, 'শুনে অবাক হয়েছেন, না ? তবে এটাই সত্যি যে আমি খুবই কম দই খাই। যদিও প্রতিদিন দু'বার করে তিনরকম দই আমাকে দেয়া হয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য আজ আপনাকে আমার বাড়িতে ডেকে এনেছি। আমি কেন রেগে গিয়েছিলাম দইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে।' বলে নীরব হয়ে গেল সোহনি শাহ্, কিছুক্ষণ চুপচাপ খেয়ে গেল।

বেশ আয়েশ করে ধীর গতিতে খায় সোহনি শাহ্। চাপাতির ছোট টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে তাতে সব্জি রোল করে মুখে পুরল। চাপাতি খাওয়া শেষ, মুখে এখনও খাবার, প্রথমে ধীর গতিতে কথা বলা শুরু করল সে, তারপর দ্রুত হয়ে উঠল ভঙ্গি।

'আপনি জানেন ব্যারিস্টার সাহেব,' বলল সোহনি শাহ্, 'আপনাকে বহুবার বলেছি ঈশ্বর আমাকে ঢেলে দিয়েছেন। একজন মানুষ যা যা চায় সবই পেয়েছি আমি-পুত্র, কন্যা (এদের দু'জনেরই ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছে) নাতি, লাভজনক ব্যবসা, চমৎকার একটি বাড়ি, ভাল বন্ধুবান্ধব, সকলের কাছ থেকে সম্মান। আমার জীবনে অভাব বলে কিছু নেই। আমি ভাবি আমি বিধাতার পছন্দের মানুষ। প্রতিদিন ভগবানের কাছে

প্রার্থনা করি যেন তার আশীর্বাদ এবং দয়া সবসময় আমার উপর বর্ষিত হয়। আমার প্রথম স্ত্রী দেখতে সুন্দরী ছিল না, তবে তার মনটা ছিল অত্যন্ত সুন্দর। আমার হৃদয় জয় করে নিয়েছিল সে। আমি তার কাছে ছিলাম ক্রীতদাসের মত। তার মত স্নেহশীলা, নিঃস্বার্থ নারী জীবনে দু'টি দেখিনি আমি। আমাকে নিয়ে সারাক্ষণ ভাবত সে, আমাকে খুশি করার জন্য সর্বক্ষণ প্রচেষ্টা থাকত তার। আমার গলার স্বর শুনেই বুঝে ফেলত আমি কী চাই, সন্ধ্যাবেলা দোকান থেকে ফিরে আসার পরে আমার হাতের সামান্য ইঙ্গিতেই বুঝে নিত আমার কী দরকার। জানত কখন হাসতে হবে, কখন কী করতে হবে। জানত আমি কী খেতে পছন্দ করি। সবসময় সে খাবার প্রস্তুত করে রাখত। আমার দিকে এমনভাবে খেয়াল রাখত, অবাকই লাগত আমার।

'লোকে বলত আমার স্ত্রী বাড়ির লক্ষ্মী। অবশ্যই সে তা-ই ছিল। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে আমার ব্যবসা এমন ফুলে-ফেঁপে ওঠে যে সাধারণ কাট-পিস ডিলার থেকে আমি শহরের অন্যতম ধনী ব্যবসায়ীতে পরিণত হই। শৈশব কাটিয়েছি যে বাড়িতে সেটা ছেড়ে দিয়ে এ বাড়িটি তৈরি করি। ঈশ্বর আমাদেরকে একটি ছেলে এবং দু'টি মেয়ে উপহার দেন। আমরা ছেলের বিয়ে দিই। পুত্রবধূ ঘরে এলে আমার স্ত্রী তার গহনার অর্ধেকটা দিয়ে দিয়েছিল নববধূকে। মেয়েটিকে সে নিজের মেয়েদের চেয়েও বেশি ভালবাসত। আমাদের মেয়ে দুটিকেও সুপাত্রে, ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছি। খুব শান্তিতে বাস করছিলাম আমরা। ঘরের শান্তি এবং সুখ কোনভাবেই বিঘ্নিত হওয়ার অবকাশ ছিল না।

'কিন্তু আমার স্ত্রী যখন দশ বছর আগে, এক শীতে নিউমোনিয়ায় হঠাৎ মারা গেল, বাজ ভেঙে পড়ল মাথায়। মনে হলো আমার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে কোনও অপদেবতা আমার স্ত্রীকে কেড়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। প্রচন্ড শোক এবং হতাশায় মুষড়ে পড়ি আমি, এমনভাবে আচরণ করতে থাকি যেন পৃথিবীর ধ্বংস চলে আসছে। দোকানে যেতাম না, ছেলে পুরো ব্যবসার ভার নিয়ে নেয়। বাড়িতে সারাদিন নিস্তেজ হয়ে বসে থাকতাম কিংবা রাতে একাকী হাঁটাহাঁটি করতাম। বন্ধুরা আমার সঙ্গে কথা বলত, ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইত মূর্খের মত আচরণ করছি আমি। "ঈশ্বরের ইচ্ছে ছিল এটাই," বলত তারা। "কাজেই হতাশা ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসো। ছেলেমেয়েদের নিয়ে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করো।"

'আমার বন্ধু চুনিলাল বিয়ের প্রস্তাব দিল: "আবার বিয়ে করছ না কেন তুমি ?" জিজ্ঞেস করল সে। "যারা বউদেরকে খুব ভালবাসে তারা একা থাকতে পারে না। স্ত্রীর শোক তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। যদি বেঁচে থাকতে চাও আর স্ত্রীর স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে চাও তা হলে তার জায়গায় কাউকে নিয়ে এসো। তার উপস্থিতি তোমাকে শান্ত করে তুলবে, তোমাকে সে ভালবাসায় ভরিয়ে দিতে পারবে।" ব্যাংক কর্মকর্তা পরশুরাম বলল, "প্রকৃতিগত ভাবেই তুমি একজন যথার্থ স্বামী; আবার বিয়ে করো এবং পুরানোর

বদলে নতুন ভালবাসা নিয়ে উজ্জীবিত হও। দুঃখ ভুলে গিয়ে পুরুষ মানুষের মত হয়ে ওঠো। লোহা ব্যবসায়ী শান্তা রামের বিবাহযোগ্যা একটি কন্যা আছে। তোমার কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে তার কোনও আপত্তি নেই।"

'সবাই যে যার মত করে তাদের মতামত জানাতে লাগল। আমার কাছে কথাগুলো অর্থহীন মনে হচ্ছিল। আমি কী করে আমার স্ত্রীর জায়গায় আরেকজনকে বসাব ? ভাবতেই বিদ্রোহী হয়ে উঠত মন। আমি বন্ধুদের অনুরোধ কিংবা পরামর্শ কানে তুলতাম না। বিয়ের সমস্ত প্রস্তাব এক এক করে প্রত্যাখ্যান করে চলি আমি।

'ভাবতাম আমার পক্ষে বিয়ে করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু বিধাতার কর্মকান্ড বড় রহস্যময়। জগতে যা ঘটে প্রতিটির পিছনে কারণ থাকে। আমরা যা করি বা ভাবি সবই আমাদের কর্ম এবং তা আমরা করি ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য। কারও জীবনে খারাপ কিছু ঘটলে সেটাকে সে দুর্ভাগ্য বা নিয়তি বলে ধরে নেয়। তবে আসল সত্য এটাই, সবকিছুই পরিকল্পিত এবং আমাদের কর্মের অংশ।

'তো আমার ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটল। মাস যায়, ধীরে ধীরে আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকি, আমার বেদনার মাত্রা কমতে থাকে। আমার ছেলে এবং পুত্রবধূ আমাকে খুশি রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে। আমার আরাম-আয়েশের প্রতি তাদের তীক্ষ্ণ নজর। কিন্তু শোকের প্রথম ধাক্কা খানিকটা সামলে ওঠার পরে ঘরে আর অলস বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। আমি ফিরে এলাম দোকানে। কয়েকদিনের মধ্যে আবার মন দিলাম কাজে। এমনকী পুরানো দিনের মত হাসি-ঠাট্টাও করতে লাগলাম। আমার বন্ধুরা এসব দেখে খুব খুশি।

'একদিন দুপুরে খেতে বসছি। হঠাৎ মন চাইল দই খাব। খাওয়ার প্রতি খুব বেশি আকর্ষণ আমার নেই। তবে সেদিন চিনি মিশিয়ে একবাটি দই খেতে কেন ইচ্ছে করল জানি না। আগের দিন হলে, বউ বেঁচে থাকলে দই খাওয়ার বাসনা মুখে ফুটে বলারও দরকার হত না। আমি কি চাই না চাই বুঝে ফেলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। কিন্তু ছেলের বউ'র কাছে দই খেতে চাইলে সে বলল আজ দই বানাতে পারেনি। দুর্ভাগ্যক্রমে দুধটা পাত্র থেকে পুরোটাই পড়ে গেছে। আমি এ নিয়ে তাকে মন খারাপ করতে নিষেধ করে নিজের খাওয়া শেষ করলাম।

'আমি সারা জীবন চেষ্টা করেছি লোভ না করতে। গুণীজনরা বলেছেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে লোভ জয় করার জন্য। আমি জানি, ব্যারিস্টার সাহেব, এসব তত্ত্ব কথা আপনার কাছে হাস্যকর শোনাবে, আমাদের ধর্মে আছে সুন্দরী নারীর মুখ দেখলে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে, যাতে মনে কোনও কুভাবের জন্ম নিতে না পারে। আপনার ভিতরে খিদে বোধ হলে অনেক কিছু খেতে ইচ্ছে করবে। সেক্ষেত্রে এ চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে উপবাস করা উচিত। কিন্তু আমরা সে কাজটি কখনোই করি না। আমি নিশ্চয় দই খেতে না পেয়ে একটু অসন্তুষ্ট ছিলাম, যে কারণে অর্ধেক পথ যাওয়ার পর

মনে পড়ল ক্যাশ বাক্সের চাবিটি বাড়িতে ফেলে এসেছি। আবার বাড়ির পথ ধরলাম। মনে মনে নিজেকে তিরস্কারও করলাম। সামান্য দই খেতে না পেয়ে আমি এমন ভুলো মন হয়ে গেলাম কীভাবে। ঘরে ঢুকে দেখি আমার ছেলে আমার জায়গায় খেতে বসেছে। ওখানে ক্যাশ বাক্সের চাবি রেখে গেছি। ওর থালার পাশে প্রকান্ড একটা বাটিতে দই-কমপক্ষে চারজন খেতে পারবে। আমার পুত্রবধূ তার স্বামীর পাশেই দাঁড়ানো ! ভয়ঙ্কর ক্রোধের একটা হল্কা উঠে এল শরীর বেয়ে, পুত্রবধূর দিকে কটমট করে তাকালাম। প্রচন্ড রাগে আমার মুখে কথা জড়িয়ে গেল, "তুমি বললে না যে দই নেই ? সমস্ত দুধ পড়ে গেছে ?"

আমার পুত্রবধূ বুঝতে পেরেছিল ভয়ানক রেগে গেছি আমি। আমাকে এ চেহারায় কোনওদিন দেখেনি সে। ভয়ে রীতিমত কাঁপতে লাগল সে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল তারপর এক ছুটে পালিয়ে গেল রান্নাঘরে। সামনে দই'র বাটি নিয়ে পাথর হয়ে বসে থাকল আমার ছেলে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম আমি, চাবির গোছা মুঠিতে পুরে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

'দোকানে যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম আর কখনও ও বাড়িতে ফিরব না আমি। ব্যারিস্টার সাহেব, আমি মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলাম। এ জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম সামান্য দই'র জন্য কী কেলেঙ্কারি কান্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারতাম। এরকম ঘটনা আবার ঘটলে ভয়াবহ কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। আমি আমার পুত্রবধূর গায়ে হাত তুলতে পারি। আমি-আমি এমনকী খুনও করে ফেলতে পারি। এসব চিন্তা মাথায় আসার পরে দোকানে যাওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম। গেলাম বন্ধু পরশুরামের বাড়িতে। জানতে চাইলাম লোহার ব্যবসায়ী শান্তারামের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে কিনা। না হয়ে থাকলে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে কিনা। আমার কথা শুনে আনন্দের সঙ্গে পরশুরাম বলল শান্তারামের মেয়ের বিয়ে এখনও হয়নি। সে তক্ষুনি শান্তারামের বাড়ি গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে শান্তারামের মেয়ের সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট হয়ে গেল। আমি পরশুরামের বাড়িতে থাকলাম। দুইদিন পরে বিয়ে হয়ে গেল। বউ নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম।'

সোহনি শাহ্ তাকিয়ায় হেলান দিল। রূপোর কৌটা থেকে একটা পান নিয়ে মুখে পুরল। আমি গভীর একটি শ্বাস ফেললাম- আমার আমন্ত্রণ কর্তার জন্য সহানুভূতির বহিঃপ্রকাশ। সোহনি শাহ্ কিছুক্ষণ পান চিবানোর পরে বলল, 'ব্যারিস্টার সাহেব, এই হলো আমার রেগে যাওয়া এবং বউ পাওয়ার গল্প।'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সোহনি শাহ্‌কে এমন তৃপ্ত এবং সুখী লাগছে, বলার প্রয়োজন বোধ করলাম না। তবে তিন রকমের দইয়ের রহস্য এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়। প্রতিদিন দু'বার তিনবাটি দই খেতে দেয়া হয় সোহনি শাহ্‌কে অথচ সে নাকি এগুলো ছুঁয়েও দেখে না। এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস

করব কিনা ভাবছি। সোহনি শাহ্ হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়েছে, আমার উপস্থিতিও যেন ভুলে গেছে। নীরবতা আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করল। সহ্য করতে না পেরে শেষে বলেই ফেললাম, 'কিন্তু শাহ্‌জী, আপনি তো তিন রকম দইয়ের রহস্য ব্যাখ্যা করলেন না ?'

হাতের তালু দিয়ে হাঁটু ঘষছিল সোহনি শাহ্। থেমে গেল। মুচকি হাসল।

'ব্যারিস্টার সাহেব, ওই দই আমাকে মনে করিয়ে দেয় আমি আমার পুত্রবধূর সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছিলাম। নিজেকে ছোট্ট একটা শাস্তি দিই আমি এ জন্য। যখন দই খেতে ইচ্ছে করে না তখন জোর করে খাই। তবে আমার চেয়েও বড় শাস্তি পেয়েছে আমার ছেলে আর তার বউ। দ্বিতীয় স্ত্রীর দৌলতে আমি দুটি সন্তান পেয়েছি। আমার বড় ছেলেরই পুরো সম্পত্তি পাবার কথা ছিল। কিন্তু সে এখন মাত্র তিনভাগের এক ভাগ পাবে।'

হয়তো আমার কল্পনা, তবে মনে হলো কথাটা বলার পরে সোহনি শাহ্'র ঠোঁটে ফুঠে উঠল শয়তানী একটা হাসি।

লেখক পরিচিতি

জিডি খোসলার জন্ম ১৯০১ সালে, লাহোরে। পড়াশুনা করেছেন ক্যামব্রিজে। ১৯২৫ সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন তিনি। ১৯৪৪-এ পাঞ্জাব হাইকোর্টে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় তাঁকে এবং ১৯৫৯ সালে পাঞ্জাবের প্রধান বিচারক পদে পদোন্নতি ঘটে। তিনি প্রচুর বই ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'হিন্দু-মুসলিম রাজনীতি এবং ভারত ভাগের ঘটনা নিয়ে 'স্টার্ন রেকনিং', হিমালয়ের ভ্রমণ নিয়ে ট্রাভেল 'হিমালয়ান সার্কিট,' মহাত্মা গান্ধীর গুপ্তহত্যার উপর ভিত্তি করে 'মার্ডার অভ দা মহাত্মা', উপন্যাস 'দ্য লাস্ট মুঘল' এবং ছোট গল্পের সংকরণ 'দ্য হরস্কোপ ক্যান নট লাই'।

খিদে

কৃষেন সিং ধোড়ি

নিশাত প্রেক্ষাগ্রহে 'প্রেমিকের রক্ত' রজত জয়ন্তী পার করছে। গত পঁচিশ হপ্তার প্রতিটি দিন হাউজফুল গেছে। ছবি হিট হওয়ার কারণ দর্শক বড় পর্দায় নিজেদের প্রেমের জীবন নিখুঁতভাবে ফুটে উঠতে দেখেছে। ছবির সাফল্যে খুশি হয়ে প্রযোজক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শহরের রাস্তায় আনন্দ মিছিল বের করবেন। পাবলিসিটির ভার দেয়া হয়েছে ঠিকাদার সুন্দর সিংকে।

সুন্দর সিং- এর বয়স পঁয়তাল্লিশের কোঠায়। খোশ মেজাজের সুন্দরের বাসা নিশাত সিনেমা হল-এর কাছেই। আপন বলতে এ দুনিয়ায় কেউ নেই তার। বচন সিং নামে বছর পনেরোর একটা ছেলে রেখেছে সে রান্না-বান্না এবং ফাইফরমাশ খাটার জন্য। বচন সিং সকালে এবং রাতে মনিবের জন্য রান্না করে, বাকি সময়টা সিনেমার প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এজন্য সে মাসে ২৫ রূপী বেতন পায়-পুরো টাকাটাই শরণার্থী শিবিরে, তার মাকে পাঠিয়ে দেয়।

'প্রেমিকের রক্ত'র আনন্দ মিছিল সকাল আটটায় শুরু হলো নিশাত সিনেমা হল থেকে। সুন্দর সিং মাথায় লাল টকটকে পাগড়ি পরেছে, তাতে পাখির পালক গোঁজা। হাতে একটা পতাকা নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে ছোটাছুটি করে মিছিলটাকে নানা নির্দেশ দিচ্ছে। মিছিলের সামনে রাজা লালের ব্যান্ড দল। দলের পিছনে একটা ট্রাক। তাতে ছবির নায়ক-নায়িকার বিশাল ছবি। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রেমিকের হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। রক্তের স্রোত গিয়ে মিশেছে প্রেমিকার পায়ের তলায়। ট্রাকের পিছনে হোর্ডিং দিয়ে সাজানো এক সার গরুর গাড়ি। গাড়ির পিছনে বুকে এবং পিঠে সিনেমার ছবি বেঁধে কয়েকজন লোক; সবার শেষে কতগুলো শিশু, হাতে প্ল্যাকার্ডসহ লাঠি। এদের মধ্যে আছে বচন সিং।

বচন সিং পরিষ্কার জামা এবং পাজামা পরেছে, জুতোও পালিশ করেছে। তবে তার চেহারায় আনন্দ নেই। দলে সবার শেষে হাঁটছে সে রাস্তায় চোখ রেখে, বিষণ্ন ভাব নিয়ে। তার মনিব সুন্দর সিং ফিল্ড মার্শালের মত হুকুম করল গরুর গাড়োয়ানদের সার

বেঁধে চলতে; বাচ্চাগুলোকে লক্ষ্য করে খেঁকিয়ে উঠল যাতে তারা লাইন ভেঙে না ফেলে।

দেখার মত দৃশ্য একটা ! ধনী লোকের আয়োজিত মিছিল এটা, তবে যারা এতে অংশ নিয়েছে তাদের সবাই খুবই গরীব-স্রেফ পেটের দায়ে ধুলোমাখা রাস্তায় ভবঘুরের মত হেঁটে বেড়াতে রাজি হয়েছে।

শহরে ঢুকল মিছিল। মূল রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল, নগরীর সবচেয়ে বড় রুটির দোকান 'ডেলবিস'-এর পাশ ঘেঁষে হাঁটছে। ডেলবিস-এর মাথায়, সাইনবোর্ডে প্রকান্ড একটি পাউরুটির ছবি। বচন সিং-এর চোখ চলে গেল ওদিকে। সাথে সাথে জিভে জল চলে এল। জিভ বের করে ঠোঁট চাটল। রুটির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, হাঁ করে তাকিয়ে আছে সাইনবোর্ডের দিকে। সুন্দর সিংয়ের কর্কশ কণ্ঠ দড়াম করে বাড়ি খেল কানের পর্দায়, 'ওই বচইন্যা, ওই হারামির পুত, দাঁড়াইয়া রইছস ক্যা ? হাঁটতে থাক।'

বচন সিং দৌড়ে গেল মিছিলের দিকে। তবে মন পড়ে রইল রুটির ছবিতে। মিছিলের সঙ্গে হাঁটছে কিন্তু ভাবছে বিজ্ঞাপনের ছবির কথা। ওর পা চলছে একদিকে, মন অন্য দিকে। নিজের কঠিন জীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

মনিবকে নাস্তা দিতে প্রতিদিন সকাল ছ'টায় ঘুম থেকে উঠতে হয় বচন সিংকে। নাস্তার মেন্যু থাকে চা, ডেলবিস থেকে আনা মন মাতানো গন্ধের পাউরুটি আর মাখন। পাউরুটিতে মাখন মাখিয়ে নাস্তা সারে সুন্দর সিং। বচনের জন্য শুধু রুটির শক্ত ছালটুকু রেখে দেয়। ওটাই চায়ে ভিজিয়ে খায় বচন। বচন সিংয়ের স্বপ্ন একদিন সে প্রচুর মাখন মাখিয়ে ডেলবিসের গোটা একটা পাউরুটি খাবে। কিন্তু মাকে বেতনের পুরো টাকাটাই পাঠিয়ে দিতে হয় বলে আস্ত একটা রুটি কিনে খাওয়ার মত বিলাসিতা করার সুযোগ নেই তার। একবার সুন্দর সিং-এর শরীর ভাল ছিল না, এক টুকরো রুটি খেয়ে বাকিটা চাকরকে দিয়ে দিয়েছিল সে। ওই দিনের স্মৃতি ভুলতে পারে না বচন। প্রার্থনা করে তার মনিবের পেটে যেন আবার গন্ডগোল হয় এবং সে যেন মাখন মাখিয়ে রুটি খাওয়ার সুযোগ পায়। দোকানের ছবিটি বচনের মনে এমন খিদের সৃষ্টি করল যে সে কল্পনায় এক কামড়ে গোটা রুটিটি গিলে ফেলল।

সকালে নাস্তা খেয়ে সুন্দর সিং প্রার্থনা করে, 'মহান গুরু ! তুমিই সত্যিকারের সম্রাট। তোমাকে লাখোবার জানাই প্রণাম। গুরু গোবিন্দ, তোমার দয়াতেই দুটো খেয়ে পরে আছি গো, গুরু। তুমিই তোমার অনুগত ভৃত্যের খিদে মেটাও।' তারপর সুন্দর সিং বেশ বড় করে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে।

প্রতিদিন সকালে এ প্রার্থনা শোনে বচন সিং। সে ভাবে কী অদ্ভুত ব্যাপার, মহান গুরু কাউকে কাউকে সব কিছু দেন আবার কাউকে কিছুই দেন না ! প্রতিদিন সকালে সুন্দর সিং গোটা পাউরুটি মাখন মাখিয়ে খেতে পায় আর তার কপালে জোটে শক্ত

ছালটুকু। সুন্দর সিং গায়ে চড়ায় সিল্কের শার্ট আর তাকে শুতে হয় ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে! সকালে উঠে বেচারা বচনকে নাস্তা সারতে হয় পাউরুটির শুকনো টুকরো টাকরা চায়ে ডুবিয়ে!

মাঝে মাঝে বচন প্রশ্ন করে নিজেকে, সে কেন মহান গুরুকে ধন্যবাদ জানায় না। একদিন সে প্রার্থনায় বসল। বলল, 'মহান গুরু, সত্যিকারের সম্রাট! তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার জন্য লাখোবার জানাই প্রণাম।' এ কথা বলার পরে নিজেকে বোকা বোকা লাগে বচনের। সে কেন গুরুকে ধন্যবাদ দিল? শুধু রুটির শুকনো ছালের জন্য? সুন্দর সিং কৃতজ্ঞতা জানাতে পারে কারণ সে প্রতিদিন গোটা পাউরুটি আর মাখন খাওয়ার সুযোগ পায়। সে (বচন) যদি গুরুকে ধন্যবাদ জানায় তাহলে সারাজীবনই তাকে হয়তো রুটির ছাল খেয়েই থাকতে হবে।

একবার নাস্তায় দিন কয়েকের জন্য রুটি খাওয়া বাদ দিল সুন্দর সিং, বদলে দুধ খেতে লাগল। বেচারা বচনের এখন রুটির ছালও জোটে না সকালে। পাউরুটির কথা ভাবলেই মুখ ভরে ওঠে জলে। মাখন আর রুটি কিনতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু টাকা পাবে কোথায়?

রাস্তায় মিছিল শেষে বেজায় ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরল বচন। সুন্দর সিং ঘরে এল। জামা কাপড় বদলে চলে গেল 'প্রেমিকের রক্ত'র অভ্যর্থনা পার্টিতে।

বচন সিং-এর কারও কাছ থেকে ধার নেয়ার অবস্থাও নেই। মিছিলে কয়েকজনের কাছে আট আনা পয়সা ধার চেয়েছিল। দেয়নি কেউ। হয়তো তাদের কাছে পয়সা ছিল না কিংবা ভেবেছে বচন ধার শোধ করতে পারবে না। সিনেমা হলের রেস্টুরেন্ট থেকে বাকিতে মাখন-রুটি আনার চেষ্টা করেছিল বচন। কাজ হয়নি। সুন্দর সিং-এর হুকুম দেয়া আছে তার চাকরকে বাকিতে কিছু দেয়া যাবে না। বচন সিং তার চারপায়াতে শুয়ে পড়ল। পেটে দাউ দাউ খিদের আগুন।

ঘুমানোর আগে প্রার্থনা করল সে। সে তো লাখ টাকা কিংবা মোটর গাড়ি চাইছে না-শুধু আধখানা পাউরুটি আর খানিক মাখন পেলেই সে খুশি। অথচ এটুকু থেকেও সে বঞ্চিত। সে প্রাণপণে প্রার্থনা করে চলল: 'মহান গুরু, সত্যিকারের সম্রাট, আমি সবাইকে ফেলে তোমার দুয়ারে এসেছি। লোকে বলে তোমার দয়ার অন্ত নেই। আমি তো দেখেছি নিশাত সিনেমা হলের মালিককে আর ঠিকাদার সুন্দর সিংকে দু'হাত ভরে দিয়েছ। কিন্তু তুমি কেন অন্যদের মত আমাকে কিছু দিচ্ছ না? তা হলে আমরা কার কাছে যাব? তুমি যদি সত্যি অসীম দয়াময় হও তা হলে তোমার ভৃত্যকে একটি গোটা পাউরুটি খেতে দাও। যদি তা না দাও তাহলে বুঝব তুমি শুধু অল্প ক'জন ধনী মানুষের গুরু। আমি তখন নতুন একজন গুরুকে খুঁজে নেব।' প্রার্থনা করতে করতে ঘুমে জড়িয়ে এল বচন সিংয়ের চোখ।

সে রাতে অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে জেগে গেল বচন। ঘরটা উজ্জ্বল আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। এক ঝলমলে, কান্তিমান পুরুষ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বচনের ঘরে ঢুকলেন। তার হাতের উপর সাদা রঙের একটি বাজপাখি ডানা ঝাপটাচ্ছে। স্বয়ং গুরু গোবিন্দ সিং এসেছেন ! বচন এক ছুটে গুরুর পায়ের কাছে মাথা দিয়ে পড়ল। তারপর তিন পেয়ে কাঠের টুলটি এগিয়ে দিল গুরুকে বসতে দিতে। গুরু জড়িয়ে ধরলেন বচনকে।

'বেটা, প্রার্থনার সময় তুমি আমাকে স্মরণ করেছ !'

'জ্বী, গুরু !' হাতের তালু দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে বলল বচন।

'তুমি আমার কথা স্মরণ করলে কেন, বেটা ?' সহৃদয় গলায় জানতে চাইলেন গুরু।

'সত্যিকারের সম্রাট ! আমাদের হৃদয়ের গোপন অভিলাষ কোন কিছুই তো আপনার কাজে অজানা নেই। আপনি তো জানেন কী দুঃখ কষ্টে কাটছে আমার জীবন !'

'বেটা, তুমি আমার কাছে কী চাও, বলো। যা চাইবে, পাবে।' বচন চুপ করে রইল।

'বেটা, লজ্জা পাবার কিছু নেই। তোমার মন যা চায় বলে ফেলো।'

'সত্যিকারের সম্রাট ! আমি যা চাইব আপনি সত্যি তা আমাকে দেবেন ?'

'হ্যাঁ, বেটা; তুমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমার কথা মনে করেছ। কাজেই তুমি যা চাইবে তা পাবে।'

'তা হলে আমাকে ডেলবিস থেকে গোটা একটা পাউরুটি আর মাখন এনে দিন।' ঠোঁট চেটে অস্পষ্ট গলায় বলল বচন।

'ডেলবিসের রুটি আর মাখন ! মাত্র সাত আনার জিনিস তুমি আমার কাছে চাইলে ! বেটা, তোমাকে যখন কেউ কিছু দিতে চায় তার পদমর্যাদা বুঝে চাইতে হয়। তুমি এ জীবন এবং পরের জীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষমতা চাও, আমি তোমাকে তা দেব। তোমাকে আমি ত্রিভুবনের অধীশ্বর বানিয়ে দেব।'

'না, প্রভু ! আমি আধিপত্য কিংবা ক্ষমতা চাই না। আজকাল রাজাদেরকে সাধারণ মানুষ রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমি শুধু গোটা একটি পাউরুটি পেলেই সন্তুষ্ট থাকব। আরও অনেক গরীব মানুষের মত আমিও রুটি খেতে চাই। আমার রাজ্য শাসনের লোভ নেই; তবে আমি সারাটা জীবন খিদে আর অভাব নিয়েও কাটাতে চাই না। আমার এ জীবন থেকে খিদে দূর করুন; পরের জীবন নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই।'

'তুমি যা চেয়েছ শীঘ্রি পেয়ে যাবে। আমি এ পৃথিবীতে আবার আসব। ভারতকে বিদেশী হামলার হাত থেকে শুধু রক্ষা করতে নয়, প্রতিটি ভারতীয়কে রুটি-মাখন খাওয়ানোর জন্য। আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা কর।'

'মহান গুরু ! আমি অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি। দয়া করে আর বেশি সময় নেবেন না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসবেন।'

'দেরি করব না।'

কান্তিমান পুরুষটি ঘোড়ায় চেপে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'ওই বচইন্যা। ওঠ শালা অলসের ধাড়ি ! দুপুর হইয়া গেছে আর তুই এখনও ঘুমাইতাছস। যা, ডেলবিস থিকা রুটি আর মাখন নিয়া আয়।'

বচন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। তবে ডেলবিস কথাটা কানে যেতে লাফ দিয়ে উঠে বসল সে বিছানায়- এখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন।

'মহান গুরু ! আপনি সত্যি চলে এসেছেন, আর এত তাড়াতাড়ি ! আমার ডেলবিসের রুটি আর মাখন কই ?' সুন্দর সিং ঠাট্টার দৃষ্টিতে তাকাল ছেলেটার দিকে। 'ওই, কোন্ গুরুর সঙ্গে কথা কস ? নেশা টেশা করস নাইতো ? তোর জন্য আমি নাস্তা আনব নাকি তুই আমার জন্য আনতে যাবি ? হারামজাদা, তাড়াতাড়ি ডেলবিসে যা। মাখন-রুটি নিয়ায়।'

'একজন আমার জন্য খুব শিগ্‌গির ডেলবিস থেকে মাখন-রুটি নিয়ে আসবেন।'

চোখ মেলে চাইল বচন। সুন্দর সিং কটমট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। চট করে চোখ বুজে ফেলল বচন। আবার শুয়ে পড়ল চারপায়াতে।

সুন্দর সিং চারপায়ার একটা কোণা তুলে ধরে উল্টে দিল। বচন গড়িয়ে ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।

লেখক পরিচিতি

কৃষেন সিং ধোড়ি পাঞ্জাবী ভাষার লেখক। তবে তাঁর এ-গল্পটি প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করেন খুশবন্ত সিং। কৃষেন সিং আরও ছোট গল্প লিখেছেন। দিল্লীতে তাঁর গাড়ির ব্যবসা আছে।

দেবতার বিচার

গুলজার সিং সান্ধু

পীরের কবরের পাশে আম গাছের নিচে চুপচাপ বসে আছে নূরা। শিক্ষকের দেয়া বাড়ির কাজে মগ্ন। তার বোন রহমতি পীরের সমাধিস্থলের কাছে, শহীদ শিখদের মাঠ থেকে গরুর জন্য জাব কাটছে।

আমাদের মাঠের ধারের শহীদদের কবরের নাকি অনেক শক্তি, শুনেছি আমি। আমরা শিখধর্মের অনুসারীরা এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। এতই ভক্তি করি যে শহীদদের সমাধি উদ্দেশ্য করে কিছু অর্ঘ্য নিবেদন না করা পর্যন্ত স্কুলে যাওয়ার অনুমতিও মেলে না। দাদুর বিশ্বাস শহীদদের আশীর্বাদ আছে বলেই আমি সব পরীক্ষায় পাশ করে যাচ্ছি।

গরমের এই দিনে, আমিও নূরার সঙ্গে বসে আছি আম গাছের নিচে। নূরা স্কুলের পড়ায় মনোযোগী, আমি রহমতিকে লক্ষ করতে লাগলাম। ও আমাদের মাঠ থেকে জাব কাটছে। রহমতিকে আমি খুব পছন্দ করি। ওকে নিয়ে নূরার সঙ্গে কথা বলার লোভ সামলাতে পারলাম না।

'দুই বোনের মধ্যে কাকে তুই বেশী পছন্দ করিস ?' জিজ্ঞেস করলাম, 'রহমতি নাকি জয়না ?'

'জয়না,' বড় বোনের কথা বলল নূরা। ওর বড় বোনের বিয়ে হয়েছে চার বছর হলো।

'রহমতিকে কেন পছন্দ করিস না ?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলাম। নূরা না আবার ভুল বুঝে বসে আমাকে।

'একবার ও আমাকে মেরেছিল। কিন্তু জয়না কোনদিন হাত তোলেনি আমার গায়ে,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জবাব দিল নূরা। মনোযোগ দিল পড়ায়। আমার কথার উল্টো অর্থ করেনি বলে খুশি হলাম মনে মনে। রহমতির দিকে তালালাম আবার। ওর ছন্দায়িত ভঙ্গিতে জাব কাটার দৃশ্যটি বড় মনোহর।

এমন সময় শহীদদের সম্মানিত সমাধিস্তম্ভের পিপুল গাছে কর্কশ গলায় ডেকে উঠল একটা ময়ূর, বিরাট ডানা মেলে উড়াল দিল। গা থেকে খসে পড়া একটা পালক

বাতাসে ভাসতে ভাসতে নেমে আসতে লাগল মাটিতে। আমি তখন ময়ূরের পালক নিয়মিত জমাই। ঝলমলে রঙের পালকটাকে বাতাসে ভাসতে দেখে পড়া মাথায় উঠল আমার। বই টই ফেলে পড়িমরি ছুটলাম পালকের জন্য। তবে মাটিতে নামার সুযোগ পেল না ময়ূরের পালক, তার আগেই, শূন্যে থাকতেই খপ্ করে ওটাকে ধরে ফেলল রহমতি।

'আমাকে পালকটা দাও,' উদ্বেগ নিয়ে বললাম আমি।

'আমি আগে এটা ধরেছি,' ঠান্ডা গলায় জবাব এল।

'তাতে কিচ্ছু আসে যায় না।' হুমকি দিলাম আমি। 'দিতে বলছি, দিতে হবে।'

'আচ্ছা, তাই নাকি ? দিতে হবে ?' মুখ বাঁকাল রহমতি।

'দেবো না।'

'দাও বলছি। তোমার কাছে আমি জীবনেও আর কিছু চাইব না।' বললাম আমি।

'এই নাও,' বলে পালকটা দূরে ছুড়ে দিল রহমতি। কাটা জাব জড়ো করে আঁটি বাঁধল, তুলে নিল মাথায়। তারপর হাঁটা দিল বাড়ির দিকে। ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না আমি। দেখলাম ওজনের ভারে সামান্য কুঁজো হয়ে গেছে রহমতি। ওর সঙ্গে বেশি খারাপ ব্যবহার করে ফেললাম কিনা ভেবে কিঞ্চিৎ মন খারাপ হলো।

সমাধিস্তম্ভে দেখলাম নূরার দরবেশতুল্য বাবা নামাজ পড়ছেন। নূরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। দু'জনের ঘাড়ে শিখ ধর্মের প্রতীক হলদে রুমাল পেঁচানো। বেখাপ্পা লাগছে। ওরা মুসলমান থেকে কিছুদিন হলো শিখ ধর্ম গ্রহণ করেছে। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন দেশজুড়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। পুব পাঞ্জাবে মুসলমানদেরকে নিরাপত্তার খাতিরে গলায় হলদে রুমাল বেঁধে রাখতে হতো।

দেশ বিভাগ ভারতকে দু'টুকরো করে ফেলেছে। শিখরা নিয়ম করেছে ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত হতে হবে। পাকিস্তানের মুসলমানরাও প্রতিশোধ নিতে সেখানকার হিন্দু কিংবা শিখদেরকে মুসলমান হতে বাধ্য করছে। আমাদের এলাকার বেশিরভাগ মুসলমান, তাও গোড়া সুন্নি। কিন্তু তবু তাদের কিছু করার নেই। কারণ তারা ভারতে রয়েছে আর ধর্মান্তরিত না হলে খুন হয়ে যেতে হবে।

মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার জন্য আমাদের গাঁয়ে একটা অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে লোহার বালা, কাঠের চিরুনি এবং হলদে রুমাল নিয়ে আসা হয়। মুসলমান থেকে শিখ ধর্মে ধর্মান্তরের জন্য প্রস্তুত মুসলমানদেরকে প্রসাদ খাওয়ানোর প্রক্রিয়া চলছে, এমন সময় শ্লেষা জড়িত একটি কণ্ঠ বলে উঠল।

'ধর্মান্তরিত করে লাভ কী ? ওরা কিন্তু অন্তরে মুসলমানই থেকে যাবে।' মুখে আফিমের গুলি গুঁজে দিয়ে কথাটা বলেছেন বাবা ফুমান সিং।

'তাহলে আপনি আমাদেরকে কী করতে বলেন ?'

'ওদেরকে শুয়োরের মাংস খাইয়ে দাও।' বললেন তিনি।

'সীমান্তে আমাদের লোককে ধরে ওরা জোর করে গরু খাইয়ে দিয়েছে,' বলল একজন।

ধর্মান্তরিত করতে মুসলমানদেরকে শুয়োরের মাংস খাওয়ানোর ব্যাপারে একমত হলো সবাই। সাথে সাথে চারপাঁচটা শুয়োর মেরে চড়িয়ে দেয়া হলো রান্না। আশপাশের গাঁয়েও একই কাজ করা হলো।

মুসলমানরা শুনল তাদেরকে শুয়োরের মাংস খেতে হবে। ভাবলেশহীন রইল তাদের চেহারা। কারণ তারা তো জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছে।

'আমাদের গুরুরা কিন্তু শুধু প্রসাদ খাইয়ে দীক্ষিত করেন,' আমার বাবা মৃদু প্রতিবাদের সুরে ফিসফিস করলেন বাবাজীর কাছে।

'তোমার মুখখানা একটু বন্ধ রাখো বাপু। নীরবতার চেয়ে ভালো কিছু নেই।' বললেন বাবা ফুমান সিং। পা বাড়ালেন মাংসের পাত্রের দিকে। রান্নার স্বাদ পরখ করবেন।

অল্প সময়ের মধ্যে সকল মুসলমানকে শিখ ধর্মে দীক্ষিত করা হলো। শিখ ধর্মের পাঁচটি প্রতীক গায়ে চড়িয়ে তারা শুয়োরের মাংস খেতে লাগল।

'আমরা তো আগে হিন্দুই ছিলাম। হারামজাদা আওরঙ্গজেব এসেই না আমাদেরকে ধর্মান্তরিত করল।' শূয়োরের মাংস খাওয়ার পক্ষে নিজের যুক্তি দাঁড় করাতে চাইল একজন। বাবাজী এবং গাঁয়ের বয়োজ্যেষ্ঠ কয়েকজন বাকিদের কাছ থেকে খানিক দূরত্ব বজায় রেখে বসেছেন। তারা সবাই অভিজাত সান্ধু হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করেন।

'পাতিওয়ালার মহারাজা একজন সিধু,' বাবাজীকে বলতে শুনলাম আমি। 'সিধু আর সান্ধুরা একই গোত্রের মানুষ। পার্থক্য হলো আমাদের জায়গীরদার আমাদেরকে শুধু অফিসের গুলি খেতে দেয়। আর মহারাজা সকল আরাম আয়েশ ভোগ করার সুযোগ পান।' এদের এসব কথা অর্থহীন মনে হলো আমার কাছে। কী বলছে বুঝতেও পারছি না।

'নূরার পরিবারের লোকজনকে তো দীক্ষা দেয়া হলো না, বাবা,' বললাম আমি।

'চুপ !,' বাবা ধমক দিলেন আমাকে। 'আমি ওদের সবাইকে পাঁচটি প্রতীকই দিয়েছি ওরা ওগুলো পরছেও। নূরার বাবা সুফী মানুষ। আমাদেরকে সম্মান করেন। আমি সবার সামনে তার সম্মানহানি করতে পারব না।'

বদরু আর তার পরিবারকে দীক্ষা দেয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন আমার ঠাকুরদা। বাবা তাকে বোঝাতে সমর্থ হলেন বদরু বাবার সামনে শুয়োরের মাংস খেয়েছেন। কারও মনে যাতে সন্দেহ না জাগে এজন্য বাবা গম্ভীর মুখে কসমও খেলেন।

রহমতি এখন হাতে লোহার চুড়ি পরে, গলায় জড়িয়ে রাখে হলদে রুমাল। ওর বাবা বদরু এবং নূরার হাতেও লোহার বালা, গলায় হলদে রুমাল। তবে এগুলো পরেই ওরা নামাজ আদায় করে লুকিয়ে লুকিয়ে। এ মুহূর্তে আমি ছাড়া মাঠে কেউ নেই বলে

নামাজ পড়ার সাহস পাচ্ছেন নূরার বাবা। কারণ আমি তার ছাত্র। ওরা জানে আমি গাঁয়ের কাউকে ওদের নামাজ পড়ার খবর ফাঁস করে দেব না। কেন করব যেখানে রহমতির সাহায্য ছাড়া আমি ক্লাস থ্রীর অঙ্ক কুলিয়েই উঠতে পারি না।

আমার চোখে এখনও ভেসে ওঠে সেই দিনটি- রহমতি জাবের আঁটি মাথায় চেপে হাঁটছে, বদরু আর নূরা নামাজে ব্যস্ত। মাটিতে নতজানু হওয়ার সময় জমিন স্পর্শ করল ধার্মিক মানুষটির মেহেদী রাঙানো লম্বা দাড়ি। তার লক্ষ্ণৌ শার্ট সামান্য ময়লা। আমি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ওদের নামাজ দেখছি। এমন সময় ভেসে এল চিৎকার করছে শিখরা। ভয়ে জমে গেল সবাই। ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল নূরা। ঘোড়ায় চড়ে এল ওরা। কতগুলো বর্শার আঘাতে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল নূরার শরীর। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এল। চিৎ হয়ে পড়ে থাকল মৃত নূরা।

আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে আমি চেয়ে থাকলাম ঘোড়সওয়ারদের দিকে। ওরা ইতিমধ্যে ঘিরে ফেলেছে বদরুকে। সুফি মানুষটা হাতজোড় করে প্রাণভিক্ষা চাইছেন। হাতের বালা আর গলার হলদে রুমাল দেখিয়ে বলছেন তিনি একজন শিখ। শেয়ালের মত গোঁফঅলা এক নিহাং শিখ খেলার ছলে কোপ মারল বদরুর বালা পরা হাতে। কনুই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল হাত। বদরু অন্য হাতটা তুলে অনুনয় করতে গেলেন, শয়তানটা তার এ হাতটাও কেটে ফেলল।

'এ শুয়োরটাকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দাও,' একজন চেঁচিয়ে উঠে ছুটে এল আমার দিকে।

পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়ার মানে এ মুসলমানকে হত্যা করো।

'ও শিখের ছেলে, গর্দভ,' একটা কণ্ঠ বাধা দিল তাকে। এ সেই নিহাং যে নূরাকে প্রথম বর্শা মেরেছে। সে ঝুঁকে আমাকে কোলে তুলে নিল।

এরপর কী হয়েছে আমি জানি না। কারণ এরপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

জ্ঞান ফিরে দেখি বারান্দার বিছানায় শুয়ে আছি। কাঁদতে কাঁদতে আমার মা'র চোখ লাল। ফুলে গেছে।

'ওর জ্ঞান ফিরেছে। আর ভয় নেই। বাচ্চা তো তাই ধাক্কাটা সামলাতে পারে নি,' বাবাজী বললেন মাকে।

'আমার বাচ্চাটাকে তো ওরা প্রায় মেরেই ফেলছিল,' চোখ মুছলেন মা। 'ঈশ্বরই তোকে বাঁচিয়েছেন, বাবা।' তিনি দোপাট্টা দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দিলেন।

'শহীদ শিখদের আশীর্বাদেই ও এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে। সমাধিতে পুজো দিয়ে এসো।' বললেন বাবাজী। সবাই সায় দিল তার কথায়। পুজোর জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নূরার মৃত্যুর কথা মাকে বললাম আমি। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম রহমতির কোনও খবর জানেন কিনা। মা অশ্রু সজল চোখে বললেন শিখ রায়টিরা গাঁয়ের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে জয়না আর রহমতিকেও ধরে নিয়ে গেছে।

অনেককেই খুন করেছে ওরা, প্রায় পঞ্চাশজনের মত। নতুন হলদে রুমাল আর চকচকে লোহার বালা হাতে যাকে দেখেছে তাকেই হত্যা করেছে ওরা।

গাঁয়ের সবাই শহীদদের উদ্দেশ্যে পুজো দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। সবার মধ্যে আতংক। বাবা ফুমান সিং চুপ মেরে গেছেন। কী করবেন বুঝতে পারছেন না। কিছুক্ষণ আগে খবর পেয়েছেন তার দীর্ঘদিনের বন্ধু ঘনশ্যামদাসকে শিখরা ভুল করে মেরে ফেলেছে। সে তার মুসলমান বন্ধুর জন্য হলদে রুমাল নিয়ে যাচ্ছিল। বন্ধুটি নব্য ধর্মান্তরিত। দাঙ্গাকারীরা ঘনশ্যামকে মাঠের মধ্যে পেয়ে যায়। তার পরিচয় জানার প্রয়োজনও বোধ করেনি। মহা ব্যস্ততা তাদের। তারা আরও কয়েকটি গ্রাম লুঠ করেছে। হলদে রুমাল দেখলেই হলো, তারা ধরে নেয় এরা 'ধর্মান্তরিত।'

শহীদদের মাঠে প্রার্থনা করার সময় বাবাজী মানে আমার ঠাকুরদা ঘনশ্যামদাসের কথা ভাবছিলেন। ওকে একদিন মরতে হতো। কিন্তু এই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত, নিষ্ঠুর মৃত্যু মেনে নেয়া যায় না কিছুতেই। ঘনশ্যামদাসের মৃত্যু সবার মধ্যে অনিশ্চয়তা নিয়ে এসেছে। এর মানে হলো হলদে রুমাল ব্যবহারকারী, সে হিন্দু বা শিখ যা-ই হোক, রেহাই মিলবে না। এখন প্রাণের ভয়ে আতংকিত মুসলমানরাই রেহাই পেয়ে যাচ্ছে আর মারা পড়ছে শিখরা।

বাবাজী গুরু গোবিন্দর পুত্রদের উদ্দেশ্যে জোরে জোরে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইলেও তার মন কাঁদছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতার জন্য। সবশেষে যারা নিজেদের ধনসম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন দুঃখী মানুষের জন্য, লড়াই করেছেন পাপীদের বিরুদ্ধে, বিশ্বাসের জন্য উৎসর্গ করেছেন জীবন, তাদের উদ্দেশ্যে স্তোত্র পাঠ করলেন তিনি। 'বিশ্বাসের জন্য জীবন উৎসর্গ' করার সময় গলা বুজে এল বাবাজীর। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। প্রার্থনার বাকি অংশ শেষ করলেন আমার বাবা। প্রার্থনা শেষে বাবা আমাকে শহীদদের সমাধিতে প্রসাদ দিয়ে আসতে বললেন। আমি সমাধির উপর প্রসাদ রাখলাম। পিপুল গাছ থেকে উড়ে এল কাকের দল। চোখের পলকে সাবাড় করল প্রসাদ।

বাবা সবাইকে প্রসাদ বিতরণ শেষে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছেন, বাবাজী এগিয়ে গেলেন তার দিকে। হাত ধরে বললেন, 'তোমার ছেলেটাকে পীরের কবরেও কিছু প্রসাদ দিতে বলো।' পীরের সমাধির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। ওদিকে তাকিয়ে নূরার কথা মনে পড়ে গেল আমার। পিপুল গাছটা মনে করিয়ে দিল রহমতিকে ওটার নীচে দাঁড়িয়ে মুখ ভেংচাচ্ছিল ও আমাকে। কাজটা ও রাগ করে করেছে নাকি ভালোবেসে কোনদিনই তা জানতে পারব না আমি।

'পীরের কবরে প্রসাদ দেব কেন ?' বিস্মিত হলেন বাবা।

'হত্যাযজ্ঞের কথা ভুলে যাওনি নিশ্চয়,' বাবাজী ফিসফিস করে বললেন আমার বাবাকে। মাঠের সীমানা ছাড়িয়ে দূরে টেনে নিয়ে গেলেন। সম্ভবতঃ শহীদদের সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। শহীদরা যদি অভিশাপ দেয়।

'হুঁ, মনে আছে,' তেতো গলা বাবার।

'যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে তারা খুন হয়েছে, তাই না ?'

'তো ?' বাবার বিস্ময় এখনও কাটে নি।

'যারা ধর্মত্যাগ করতে চায়নি তারা বেঁচে গেছে প্রাণে জানোই তো।'

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না,' ভুরু কুঁচকে আছে বাবার।

'বুঝতে না পারলে কিছু করার নেই,' ধমকে উঠলেন বাবাজী, বাবা তার কথার মর্ম উদ্ধারে ব্যর্থ বলে বিরক্ত।

'শোনো,' গলার স্বর আরও নামল বাবাজীর যাতে শহীদরা শুনতে না পান। 'যারা মুসলমান থেকে গেছে তাদের কোনও ক্ষতি হয়নি। কাজেই কে বলতে পারে আগামীকাল পীররা আমাদের শহীদদের চেয়ে শক্তিশালি হয়ে উঠবেন না ?'

বাবাজীর কথা বুঝতে পারলাম আমি। এক ছুটে কিছু প্রসাদ রেখে এলাম পীরের কবরে। বাবা আমাকে বাধা দিলেন না।

হয়তো পীরের পক্ষে কথা বলছেন বলে বাবাজী এখনও বেঁচে আছেন, কে জানে !

লেখক পরিচিতি

গুলজার সিং সান্ধু (১৯৩৫-) পেশায় সাংবাদিক। তার সৃজনশীল লেখার মধ্যে রয়েছে টেস অব দ্য দুবেভিল এর পাঞ্জাবী অনুবাদ এবং উপন্যাস সাদে হার শ্রীনগর।

একজন যাত্রী

সন্তোখ সিং ধীর

সূর্য পুব দিকে উকি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছাড়ল টোঙাওয়ালা বারু। টোঙার সঙ্গে জুড়ে দিল তার ঘোড়া। রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে পৌছে গেল সবার আগে। ' খান্নায় যাওয়ার আছে কেউ?' হাঁক ছাড়ল সে। ' খান্না?'

বারু জানে শীতকালে, এত সকালে যাত্রী পাবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে কোনও কিছুই তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন প্রবল শীতের সকালেও প্রচণ্ড ঠান্ডায় হি হি করে কাঁপতে থাকা বারুর চিন্তা থাকে একটাই– কী করে সবার আগে স্ট্যান্ডে পৌছুবে।

বাজারের দিকে ফিরল বারু। গলার রগ ফোলাল একজন যাত্রীর জন্য। যেন স্রেফ একজন যাত্রীর জন্যই অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু বাজারে কোনও যাত্রীর দেখা মিলল না। ফুটপাতের দিকে ঘুরল বারু। ওদিকে নানা মেঠোপথ চলে গেছে কয়েকটি গ্রামে। প্রতিটি মেঠোপথের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ল বারু। জীবনের কোনও চিহ্নই নেই! যেন পৃথিবীর সকল যাত্রীকে সাপে কেটেছে। বারু রাস্তার এক হকারের সঙ্গে যোগ দিল। বিড়ি ধরাল।

বারুর ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে থেকে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বেশ কয়েকবার চিহিহি করে ডাক ছাড়ল। ঝাপটা মারল লেজে। এগিয়ে এল তিন কদম। 'সবুররে বাপ, সবুর! বেশি দেরি লাগবে না। পকেটে রেস্ত বোঝাই, খালে মস্তিকের কাউকে পেলে হলো। রওনা হয়ে যাব আমরা।'

রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের হুইসলের শব্দ বারুর কানে যেন তীরের আঘাত হানল। মাটিতে থুতু ছিটাল সে। ট্রেন আর ট্রেনের আবিস্কর্তার উদ্দেশ্যে গালি দিল। বজ্রের শব্দ তুলে চলে গেল এক্সপ্রেস ট্রেন। তারপর গেল শাট্‌ল ট্রেন।

'শালা বানচোত ট্রেন।' অভিশাপ দিল বারু। 'প্রতি ঘন্টায় একটা করে আসছে।' আবার গলা ফাটাল সে একজন যাত্রীর জন্য।

আরেকটা বিড়ি ধরাল বারু। জোরে জোরে টানছে। লম্বা এক টানে অর্ধেকে নামিয়ে ফেলল বিড়ির দৈর্ঘ্য। নাক দিয়ে বের করল ধোঁয়া। বিড়িটাকে একটা গালি দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। ধোঁয়ায় মুখের ভেতরটা জ্বলছে। যেন কতগুলো ঝাল মরিচ গিলেছে।

স্থির হয়ে থাকতে পারছে না ঘোড়া। খুর দিয়ে লাথি কষাচ্ছে মাটিতে, দাঁতে দাঁত ঘষছে, কড়মড় শব্দ হচ্ছে। মাথা নাড়ছে, ঝাঁকি খাচ্ছে টোঙার শ্যাফট আর হারনেস। মাথায় গোঁজা বহুরঙা পালক উড়ছে বাতাসে; লাগামের কড়িয়ালে বাঁধা মখমলের রুমাল ব্যানারের মত পতপত করছে। গর্ব নিয়ে ঘোড়াটাকে দেখল বারু। 'সবুর, ভাইয়া! একটু পরেই বাতাসের বেগে ছুটব আমরা...'

'বারু, তোমার ঘোড়াটা দারুণ তেজী; সারাক্ষণ অস্থির থাকে,' মন্তব্য করল হকার।

'আমার ঘোড়ার মত ঘোড়া আর কারও নেই!' বলল বারু। 'ওর চকচকে চামড়াটা দ্যাখো! গায়ে মাছি বসলেও পিছলে যাবে। ওকে আমি আমার ছেলের মত যত্ন করি।'

'ঠিক মত যত্ন করলে জানোয়ারদের কাছ থেকে সেবাও পাওয়া যায় ভাল,' সায় দিল হকার।

সূর্য উঠে আসছে মাথার উপর; কিন্তু এখনও খান্নার যাত্রীর দেখা নেই। স্ট্যাণ্ডে আরও কয়েকটি টোঙা এসে ভিড় করেছে। রাস্তার ওপারে আরেক টোঙাঅলা কুন্দনও খান্নার যাত্রীদের জন্য হাঁক পাড়ছে।

ব্যাগ হাতে, সুবেশ এক লোককে বাজারের দিক থেকে আসতে দেখল বারু। বাজপাখির চোখে তার নড়াচড়া লক্ষ করছে সে। লোকটা স্টাণ্ডের ধারে এল বটে তবে বোঝা যাচ্ছে না কোথায় যাবে। টোঙাঅলারা চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

'এদিকে আসুন সিরহিন্দ!... মালোতে যাবেন নাকি, ভাইয়ো!' কিন্তু লোকটা কারও দিকেই ফিরে চাইল না।

বারু খান্নার নাম ধরে ডাকল, লোকটা তাকাল না।'এই ভদ্দরলোকগুলো খুব পাজি!' বিড়বিড় করল বারু। 'মুখ খুলতেই চায় না।'

লোকটা বারুর টোঙার সামনে চলে এল। প্রায় অস্পষ্ট গলায় জানতে চাইল, 'তোমার আর কোনও যাত্রী...'

বারু লাফ মেরে এগোল লোকটার দিকে, ঝুঁকল তার ব্যাগ নেয়ার জন্য, অত্যন্ত বিনীত গলায় বলল, 'সার, আপনি সামনের সীটে বসুন... আমরা একটু পরেই রওনা হব... শুধু আরেকজন যাত্রী পেলেই হলো'।

ব্যাগ ছাড়ল না লোকটা। টোঙায় এক ঘন্টা বসে থাকার কোনও মানে নেই। সে টোঙার সামনে হেঁটে গেল, দাঁড়াল পাদানীর কাছে।

বারু আরেকজন যাত্রীর জন্য গলা ফাটাতে লাগল।

লোকটা সামনের সীটে তার ব্যাগ রাখল। ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পায়চারি শুরু করল। বারু তার ঘোড়ার পেটে চাপড় দিল। তারপর ঠিকঠাক করতে লাগল পেছনের সীট। একটা সাইকেল-রিকশা এসে থামল টোঙার পাশে। বারুর যাত্রী

রিকশাঅলার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি শুরু করে দিল। দৃশ্যটা দেখে দমে গেল বারুর মন। শেষ পর্যন্ত রিকশাঅলার জয় হলো। প্রবল শৈত্য প্রবাহের কথা বলে পটিয়ে ফেলল সে লোকটাকে। বারুর যাত্রী উঠে পড়ল রিকশায়। রিকশাঅলা টানতে লাগল তার বাহন।

বারু হকারের পাশে এসে ফুটপাতের উপর বসল। প্রিয় ব্রাণ্ডের সিগারেট ফুঁকতে মন চাইছে খুব। কিন্তু একটা সিগারেটের পেছনে সে পুরো দুটো পয়সা কী করে খরচ করে? আজকের দিনটা ভাল যাবে না বলে মনে হচ্ছে। খান্নায় যাত্রী প্রতি ভাড়া চার আনা। আর ছয় আনার বেশি ভাড়া কোনও ভাবেই নেয়া যাবে না, আইন আছে। একবার পুরো যাত্রী বোঝাই করতে পারলে তার আয় হবে দেড় টাকা... প্রতিদিন তিন টাকা লাগে তার ঘোড়াকে খাওয়াতে। সে ফুটপাতে বসে বেহুদা সময় নষ্ট করছে কেন? টোঙায় গিয়ে পেছনের সীটে বসে থাকল বারু। লোকে ভাববে অন্তত একজন যাত্রী আছে গাড়িতে। তারা টোঙায় চড়তে আসবে।

হীর রান্ঝা সিনেমার একটা গান গুনগুনিয়ে গাইতে লাগল বারু। থেমে গেল হঠাৎ। দূরের মাঠে আটকে গেছে নজর। শস্য খেতের আল ধরে এগিয়ে আসছে চাষাদের একটা দল। দলটার সামনে জনাচারেক লোক। গায়ে সাদা আর কালো চাঁদর মোড়ানো। আদালতে যাচ্ছে বোধহয়। বারু তাদের দিকে লম্বা করে টোঙা ঘোরাল, ডাক দিল, 'খান্নায় যাচ্ছেন নাকি, ভাই? আমিও ওদিকেই যাব।'

পরস্পরের দিকে তাকাল কৃষকরা। একজন বলল, 'আমরা খান্নায় যাচ্ছি। তবে এখুনি রওনা হলে তোমার টোঙায় উঠতে পারি।'

'অবশ্যই,' বারু আশ্বস্ত করল তাদেরকে। 'আপনারা টোঙায় উঠে বসেন। আমি রওনা দেব।' ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল বারু, স্টাণ্ডের দিকে ঘোরাল টোঙার মুখ।

'তহশীলদারের কোর্টে যাব আমরা। সামরালায় শুনানি আছে।'

'টোঙায় উঠে পড়ুন। আমি ঝড়ের গতিতে আপনাদেরকে পৌছে দেব গন্তব্যে।'

লোকগুলো টোঙায় উঠে পড়ল। বারু স্টাণ্ডের দিকে ফিরে 'আরেকজন যাত্রী'র জন্য তারস্বরে চেঁচাতে লাগল।

'তুমি এখনও যাত্রী খুঁজছ?' জিজ্ঞেস করল এক চাষা।

'আসলে আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল। টোঙাঅলাদের স্বভাব কখনও বদলায় না।'

'আরে, ওকেও তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে,' বলল আরেকজন।

'আরেকটু দেরি করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

স্ট্যাণ্ড থেকে টোঙা নিয়ে বাজারে চলে এল বারু। শ্যাফটের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচাল, 'কেউ খান্নায় যাবেন নাকি ভাইয়ো-ও খান্নার জন্য এখনও একটা সীট খালি।'

'বাড়ি থেকে যাত্রী ধরে নিয়ে এলেই পারো', ফুটপাতে দাঁড়ানো একজন খেঁকিয়ে উঠল। তার কথায় হেসে উঠল অন্যরা। লাল মাড়ি বের করে হাসল বারু। জনতার

হাসির সঙ্গে যোগ দিল বটে, তবে 'একজন যাত্রী' বলে ঠিকই হাঁক ছেড়ে যেতে লাগল। খান্নায় যাওয়ার রাস্তার একপাশে টোঙা রেখে হকারের কাছে এল বারু।

' তুমি দেখছি অন্য টোঙাঅলাদের মতই আচরণ করছ,' অনুযোগ করল একজন যাত্রী।

' ভাই টোঙাঅলা, আমাদের দেরি করিয়ে দিচ্ছ কেন?' বলল আরেকজন।

' দেরি হবে না ভাইসাব। শুধু আরেকজন যাত্রী পেয়ে গেলেই হলো। আরেকজন পেয়ে গেলাম তো ভাল। না পেলেও অসুবিধা নেই। আমরা টোঙা ছেড়ে দেব।'

কুন্দন বারুর যাত্রীদের অসহিষ্ণুতা লক্ষ করছিল। সে নিজের টোঙা নিয়ে বারুর টোঙার কাছে চলে এল।

' তোমার যাত্রীদেরকে আমি খান্নায় নিয়ে যাই?'

' ভাগ্, নাপতার পো। এখুনি কেটে পড়।'

বারু জ্বলন্ত চোখে তাকাল কুন্দনের দিকে। দেখল কয়েকজন মহিলা আসছে।

'আমরা এখুনি রওনা হব, সর্দারজী। আরও যাত্রী চলে এসেছে।'

চাষারাও মহিলাদের দেখতে পেল। আরেকটু অপেক্ষা করতে রাজি হলো তারা।

কাছে চলে এল দলটা। কয়েক মহিলার হাতে কাপড়ের ঢাকনা দেয়া ট্রে। বয়সীরা ঘোমটা দিয়ে ঢেকে রেখেছে মুখ। মেয়েদের পরনে রঙিন কাপড়। বারু মহিলাদের দলটির সামনে চলে এল, মাকে যেন বাধ্যগত ছেলে বলছে এমন ভঙ্গিতে বলল, মাইজি, আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি। খান্না যাবেন তো চলুন।'

' নারে ভাই। আমরা মন্দিরে যাচ্ছি পুজো দিতে।'

' হ্যা, তা তো যাবেনই, মাইজি,' একটু হতাশ বারু।

' অই , তুমি যাবে কিনা বলো?' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল একজন যাত্রী।

ওহ্, যাত্রীরা এমন অধৈর্য হয়!

ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌছে গেছে বারু। নিরীহ গলায় বলল, 'আর বেশী সময় লাগবে না। স্রেফ আর একজন যাত্রী। আমার গাড়ির খরচটা তো উসুল করতে দেবেন।'

তোমার গাড়ির খরচ উসুল করতে দিতে গিয়ে আমাদের মামলা ডিসমিস হয়ে যাবে।'

এগিয়ে এল কুন্দন। ' সরল মানুষেরা এভাবেই ফাঁদে পড়ে। এ লোক ইহজীবনে শুরু করবে না যাত্রা। আর শুরু করলেও আপনারা গন্তব্যে পৌছুতে পারবেন না। খানাখন্দে পড়ে হাত-পা ভাঙবেন। তার ঘোড়াটার মত বেয়ারা জানোয়ার এই তল্লাটে দ্বিতীয়টি নেই।'

রাগে বেগুনি হয়ে গেল বারুর চেহারা। কুন্দনের সঙ্গে কথা বলার সময় নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করল মেজাজ। ' নাপতার পো, তোকে কি স্বয়ং যম এসব কথা বলার জন্য পাঠিয়েছে? যা, বাড়ি যা, তোর মাকে গিয়ে বল জংধরা, ভাঙা গাড়িটাতে তেল মালিশ করতে। ওটার গিঁটে গিঁটে ব্যথা। এখানে বাচালের মত বকবক করিস না।'

হাতের চাবুক দিয়ে নিজের গায়ে সপাং করে বাড়ি মারল কুন্দন। বিব্রত গলায় বলল, ' আপনারা যাবেন আমার গাড়িতে? এক মিনিটে খান্নায় পৌঁছে দেব সবাইকে। তিন আনা করে দেবেন।'

টোঙা নিয়ে এগিয়ে এল কুন্দন।

রাগে অন্ধ হয়ে গেল বারু। কুন্দনের মাকে উদ্দেশ্য করে কুৎসিত গালি দিল। বলল, '...পোলা, গাড়ি থেকে নাম।'

বারুর চেহারা দেখে মনে মনে ভয় পেল কুন্দন। তবু নেমে পড়ল টোঙা থেকে। ' মুখ খারাপ করবি না, খবরদার!'

বাতাসে সপাং করে চাবুক কষাল বারু। 'আরে, শালা, তোর পাছার মধ্যে আমার গাড়ির চাকো ঢুকিয়ে দেব।'

' সাহস থাকলে লাগতে আয়!' ভয় পেলেও চেহারায় ভাবটা ফুটতে দিল না কুন্দন।

' ভাগ নাপতার পো। ভাল চাইলে কেটে পড়। 'নইলে তোর রক্ত খাব আমি'।

কুন্দন ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এই অপেক্ষায় আছে বারু।

' আমি এমন কি করলাম যে তুমি এমন মুখ খারাপ করছ,' নার্ভাস কুন্দন তুই থেকে 'তুমি' তে নেমে এল।

' আমার যাত্রী ভাগিয়ে নিয়ে যেতে চাস।' রাগে গরগর করছে বারু। তোর এতবড় সাহস! তোকে মাটিতে পুঁতে ফেলব।'

' যা, যা, পারলে পুঁতিস।' ওকে সম্মান করছে না দেখে কুন্দনও সম্মানের ধার ধারল না। সে একজন যাত্রীর কাঁধ স্পর্শ করল। ' চলে আসেন বাবাজী।'

আর সহ্য হলো না বারুর। খপ্ করে চেপে ধরল কুন্দনের শার্টের কলার। কুন্দন ওকে ছেড়ে কথা কইল না। দু'জনে মিলে শুরু করে দিল কুস্তি। লোকজন ছুটে গেল ওদেরকে ছাড়িয়ে দিতে। টোঙাঅলা আর যাত্রীদের বেশ বেগ পেতে হলো যুদ্ধরত দুই শত্রুকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। স্ট্যান্ডের ঠিকাদার দু'জনকেই বকাঝকা দিল। সবাই একমত হলো যাত্রীদের বারুর গাড়িতেই যাওয়া উচিৎ। যাত্রীরা আবার যে যার আসন দখল করল।

যাত্রীদের মায়া লাগল বারুর জন্য। তাই আরেকজন যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করার সুযোগ দিল বারুকে।

পুলিশের এক হেড কনেস্টবল এসে জানতে চাইল, ' ভায়েরা, খান্নায় যাওয়ার কোনও টোঙা যাচ্ছে?'

বারু ভাবল এ লোককে গাড়িতে তুললে পয়সা পাওয়া যাবে না। কিন্তু পুলিশের লোককে 'না'ও বলা যায় না। অবশ্য কনেস্টবলের পাশে সে আরও দু'জন যাত্রী বসাতে পারবে। 'আসুন, হাবিলদারজী। আমি এখনই রওনা হব। সামনের সীটে বসুন।'

হেড কনেস্টবল উঠে পড়ল টোঙায়। বারু গলার স্বর সপ্তমে তুলে

'আরেকজন যাত্রী'র জন্য ডাক শুরু করে দিল।

বাজার থেকে এক দোকানদার এল। কোনও কথা না বলে বারুর টোঙায় উঠে বসল সে। দুই বৃদ্ধা আসছিল স্ট্যান্ড সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে। বারু ডাকল, 'মাই খান্না যাবেন?' দ্রুততর হলো মহিলাদের পদক্ষেপ। একজন হাত তুলে বলল, ' একটু দাঁড়াও, ভাই।'

' জলদি আসেন,' বলল অধৈর্য বারু।

দুই বৃদ্ধা দ্রুত হেঁটে উঠে পড়ল টোঙায়। 'কত নেবে, ভাই?'

' আগে তো বসুন । ভাড়ার চিন্তা করতে হবে না।'

আটজন যাত্রীতে পূর্ণ এখন টোঙা। দু'টাকা ভাড়া পাবে বারু। যাত্রা শুরু করার আগে করুণাময় হয়তো আরেকজন জুটিয়ে দেবেন ওকে। ফেরার পথেও হয়তো একরকম যাত্রী পাবে। বারু ঠিকাদারকে ট্যাক্স দিয়ে দিল।

'টোঙা তো বোঝাই হয়ে গেল।' চেঁচাল একজন যাত্রী। ' এখনও ছাড়ছ না কেন গাড়ি? আরও যাত্রী চাই নাকি?'

' না, সার। যথেষ্ট হয়েছে। ঈশ্বরের নাম নিয়ে এখুনি যাত্রা শুরু করব।' বারু ঘোড়ার পিঠে চাপড় দিল, শ্যাফট থেকে খুলে ফেলল রশি।

এবার একটা সিগারেট কেনার বিলাসিতা করা যায়, ভাবল বারু। টোঙা থেকে নেমে পড়ল সে। হকারের কাছে গেল প্রিয় ব্রান্ডের সিগারেট কিনতে।

এমন সময় বারুর টোঙার পাশে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল আমবালা-লুধিয়ানা রুটের বাস। যাত্রীরা টোঙা থেকে নেমে পড়ল হুড়মুড় করে। অদৃশ্য হয়ে গেল বাসের পটে। ড্রাগনের মত ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে চলে গেল বাস টোঙা চালকদের মুখে কালো ধোঁয়া আর ধুলোর মেঘ ছড়িয়ে।

বারু স্ট্যান্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চাবুকসহ হাত উঁচু করল, তারপর ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেঁচাল, ' খান্না যাওয়ার সীট খালি আছে, ভাইয়ো!'

লেখক পরিচিতি

সন্তোখ সিং ধীরের জন্ম ১৯২২ সালে। তিনি পেশায় সাংবাদিক ও সৃজনশীল পাঞ্জাবী লেখক। তাঁর গুরুত্বপূর্ন্য প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে কবিতার বই গুড়িয়া পাটোলে ও পো ফুটালা।

ফুলশয্যা

মূল: উপেন্দ্রনাথ আশক

নব বিবাহিতা স্ত্রীর চোখ থেকে দৃষ্টি তুলে চাইল কেশি। তাকাল প্রাচীন আদলে তৈরি খাটের মাথায়। ওখানে দেয়ালে ঝুলছে তার মায়ের বাঁধানো একখানা ছবি। মা দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন, সুগঠিত শরীর, বড় বড় চোখ, লম্বা, বাঁকানো পাপড়ি; সামান্য ফাঁক হয়ে আছে পাতলা ঠোঁট জোড়া হাসির ভঙ্গিতে, ধবধবে, মুক্তোর মত সাদা দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে। মা'র চেহারাই যেন পেয়েছে বিয়ে করে আনা নতুন বউ। দুই নারীর মধ্যে কী অদ্ভুত মিল! মাথাটা চট করে ঘুরে উঠল; মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গেল শীতল স্রোত। মাথায় ঝাঁকি দিল কেশি, ছবি থেকে সরিয়ে নিতে চাইল চোখ। পারল না।

মাত্র ক'বছর আগেও মা'র বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকত কেশি, এখন যেমন শুয়ে আছে স্ত্রীর বুকে। সেই সব স্মৃতি ধেয়ে এল বন্যার মত। স্ত্রীর পটল চেরা চোখ এবং তৃষার্ত অধরে চুম্বন করার বদলে শরীর থেকে পিছলে নেমে এল কেশি, শুয়ে থাকল পাশে বিধ্বস্ত পুরুষের মত। বিছানার ওপর চাঁদোয়ার মত করে সাজানো ফুলের মালাগুলোর দিকে ফাঁকা চোখ। হাত নিঃসাড় পড়ে আছে জেসমিনের পাঁপড়ির ওপর। ইচ্ছা করছে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নামে, পালিয়ে যায় এই সুগন্ধি ফুলশয্যা থেকে। এখানে নিজেকে বন্দির মত লাগছে কেশির।

তবে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল না কেশি যেখানে ছিল শুয়ে থাকল সেখানেই। নিশ্চল, নীরব। ওর বউ কী ভাববে! ভয়টা গ্রাস করল কেশিকে। আবার ঝাঁকি দিল মাথা। আগের চেয়ে জোরে। তবে এতে মা'র চেহারা মনের আয়না থেকে মুছতে তো পারলই না বরং স্মৃতিগুলো বাধভাঙ্গা বন্যার মত ভিড় করতে লাগল মনে।

...সেই একই বিছানা, একই ঘর। কেশির বাবা-মা পাশাপাশি শুতেন। কেশি বারান্দায় নিজের খাটিয়া থেকে দেখছে ওদেরকে। বাবার পাশে মাকে কী অদ্ভুত সুন্দর লাগছে!

আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছেন মা। কেশি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে তাঁকে। রূপকথার গল্পে শোনা পরীর মত সুন্দরী তার মা। মা আয়নায় ছেলেকে

দেখে কাছে ডাকলেন। সে এগিয়ে এসে মা'র কোলে মাথা গুঁজল। একহাত দিয়ে মা তার মাথায় হাত বোলাচ্ছেন, অন্য হাতে চুল আঁচড়াচ্ছেন।

...বাবার কী হয়েছে? এক লোক আসছে বাবাকে দেখতে। লোকটার গলায় পেঁচিয়ে থাকে একজোড়া সাপ। সে সাপের লেজ কানে ঢুকিয়ে বাবার কব্জিতে ছোঁয়ায় সাপের মাথা। এরপর বাবার হাতে বড়বড় সূই ফুটিয়ে দেয়। বাবা চিৎকার করেন না তবে ভয়ে আর্তনাদ ছাড়ে কেশি। মা তাকে বুকে চেপে ধরেন, নিয়ে যান পাশের ঘরে।

...মাটিতে শুয়ে আছেন বাবা। নড়াচড়া করছেন না। সবাই কাঁদছে। মা কাঁদছেন; তিনি ছেলেকে একটা চুমু খেলেন তারপর আবার কাঁদতে লাগলেন। মহিলারা মা'র হাতের চুড়ি ভেঙে ফেলল, মুছে দিল সিথির সিঁদুর। কেশিকে তারা মা'র কোল থেকে প্রায় টেনে হিচড়ে নামিয়ে আনল। কেশি গলা ফাটিয়ে কাঁদতে থাকে। কিন্তু তাকে সান্ত না দেয়ার কেউ নেই।

সেই একই বিছানা। বাবা আগে যেখানে ঘুমাতেন সেখানে শুয়েছে কেশি। মা তার পাশে। মা'র পরনে সাদা শাড়ি। দেয়ালের ঘুলঘুলি দিয়ে রোদ ঢুকছে, কিন্তু মা ঘুমাচ্ছেন মরার মত। কেশি স্থির চোখে দেখছে মাকে। সত্যি পরীর মত রূপবতী তার মা। চোখ বোজা, আলুথালু চুল ছড়িয়ে রয়েছে দু'কাঁধে। এ যেন গল্পের সেই ঘুমন্ত রাজকন্যা যাকে জাদু দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। রাজকুমার এসে তার ঘুম ভাঙাবে। কেশি ঝুঁকল মা'র দিকে, চুমু খেল গালে। চোখ মেলে চাইলেন মা, বাড়িয়ে দিলেন হাত, কোলে টেনে নিলেন তাকে। ছেলের কপালে, চোখে এবং ঠোঁটে চুমু খেলেন।

...মা'র বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে সে। মা রাজকুমারের গল্প শোনাচ্ছেন। সাতসাগর পাড়ি দিয়ে রাজারকুমার যাচ্ছে তার প্রেয়সীর সঙ্গে দেখা করতে। গল্প শেষ করে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী কোনও রাজকুমারীকে বিয়ে করবে ?'

'আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

'পাগল ! ছেলে কী কখনও মাকে বিয়ে করতে পারে !'

মা কথা দিলেন তিনি ছেলের জন্য অবিকল তাঁর মত দেখতে এক কনে খুঁজে আনবেন।

'তারপর এই বিছানাটাও আমার হয়ে যাবে,' মা'র অপূর্ব সুন্দর চোখে চোখ রেখে বলল সে।

'অবশ্যই। এ খাট এবং বিছানা আমি তোমাকে এবং তোমার বউকে আমার তরফ থেকে বিয়ের উপহার দেব।'

'কী হলো ? শরীর খারাপ লাগছে ?' কেশির দিকে ফিরে শুলো নববধূ, কপালে হাত রাখল। আঙুল চালিয়ে দিল চুলের মধ্যে।

'কিছু হয়নি,' বলল কেশি। হাসার চেষ্টা করল। বদলে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

মা কথা রেখেছেন। যে মেয়েকে পছন্দ করেছেন কেশির জন্য সে হুবহু তার মা'র প্রতিচিত্র। কেশির বউ'র চোখ জোড়া পটলচেরা, ধারাল দেহকলবর, নরম ওষ্ঠ, হাসলে

ঝিকিয়ে ওঠে মুক্তোর মত দাঁতের সারি। যৌতুকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে প্রকান্ড বিছানাও পাঠানো হয়েছে তবে মা নিজের বিছানা ছেলেকে বিয়েতে উপহার দিয়েছেন। এমনকী নব-দম্পতির জন্য নিজের শোবার ঘর পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন।

কনে তার বরের দিকে ঝুঁকে এল। চোখে চোখ রাখল। স্বামী হঠাৎ ঠান্ডা মেরে গেল কেন তার কারণ খুঁজছে। কিন্তু রহস্য উদ্ধার করা গেল না। এক মুহূর্ত ইতস্তত: করল সে তারপর চুলে আদর করতে লাগল।

একমুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল কেশি; তারপর হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল বধূর ঘাড়, চেনে নিল কাছে। আদর করল চুলে, গালে এবং ঠোঁটে। মস্তিষ্ক থেকে দূর হয়ে গেছে মাকড়সার জাল। নারীর নরম, উষ্ণ শরীর তার রক্ত গরম করে তুলল। চুমু খেল স্ত্রীকে, মুখ গুঁজে দিল কবোষ্ণ বক্ষে। নববধুর সঙ্গে প্রেম করার এই-ই সময়, ভাবল সে। ছবিটির দিকে তাকাতে চাইল না কেশি। মাথা না তুলে খাটের ওপরে, হেড-বোর্ডে একটা বালিশ খুঁজে দিল। তারপর চাইল মুখ তুলে। তার মা বালিশের আড়াল থেকে এখনও উঁকি দিচ্ছেন। 'না, না, না' চিৎকার করে উঠল কেশি। বিছানায় পিঠ দিয়ে পরাজিত'র মত শুয়ে পড়ল। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তার, লাফ মেরে নেমে এল বিছানা থেকে।

পূর্ণিমার আলো আসছে পর্দার ফাঁক দিয়ে। বারান্দা ভেসে যাচ্ছে নরম রূপোলি জোছনায়। বাগানে চাঁদের আলোর রেখার দিকে কেশির অন্যমনস্ক দৃষ্টি। ঠান্ডা বাতাসে উত্তেজিত স্নায়ু ক্রমে শীতল হয়ে আসছে। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল কেশি। নেমে এল বাগানে। বাতাসে দোল খাচ্ছে ডালিয়া। বাগান ঘিরে রেখেছে সুন্দর করে ছাঁটা হেনার ঝাড়। তার ওপাশে মেরীগোল্ড। কেশি কয়েকটি ফুলের গন্ধ নিল, আদর করে হাত বোলাল দু'একটি ফুলের গায়ে। দিনের বেলা, সূর্যালোকে ফুলগুলোর বর্ণালি রঙে যেন ঝলসে যায় চোখ। চাঁদনি রাতে এখন নরম লাগছে ওগুলো। উত্তেজিত স্নায়ুতে প্রশান্তির প্রলেপ যেন। ঝলমলে হলুদ এবং গোলাপি রঙের ফুলগুলো দেখাচ্ছে ম্লান সাদা।

বাড়ির দেয়ালের সামনে চলে এল কেশি। ওখানে ফুটে আছে জেসমিন। দেয়ালের গাঢ় ছায়ায় জেসমিন ফুলগুলোকে মুক্তোর মত লাগছে দেখতে। জোছনার আলোয় একটা গানের কয়েকটি কলি মনে পড়ে গেল কেশির:

'বহুদিন পরে ফুটল জেসমিন আমার বাগানে
উঠোন ভরে গেল মৌ মৌ গন্ধে
স্বর্গীয় এক সৌরভে।'

উঠোন সত্যি ফুলের গন্ধে মৌ মৌ করছে। কেশি আড়স্ট ভঙ্গিতে হেঁটে গেল গেটের দিকে। পায়চারি করতে লাগল। লক্ষ করল বাড়ির কিনারের ঘরে আলো জ্বলছে। মা নিশ্চয় এখনও ঘুমাননি। হয়তো খালা আর ফুপুরা এখনও কেশি এবং নববধূর গল্পে মশগুল। বাসর সাজাতে মা'র না জানি কত কষ্ট হয়েছে। মহিলারা ডাইনিং রুম থেকে টেবিল-চেয়ার সরিয়ে ওখানে বধুর বসার জায়গা করেছে। কেশি যখন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, মহিলারা ওই সময় বিয়েতে পাওয়া উপহার সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত। উপহার এবং যৌতুক পাওয়া জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে কেশি

এবং তার মা'র ঘরে। প্রচুর লোক এসেছে কেশির বিয়েতে। তাদের আপ্যায়নে কেটে গেছে মা'র দিন। বিছানায় গা এলিয়ে দেয়ার সময় পাননি। কেশি দেখেছে মা বারবার বেডরুমে ঢুকছেন এবং বের হচ্ছেন। সঙ্গে তার খালা এবং এক তরুণী, মা'র দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়। নববধূর ঘর সাজিয়ে দিচ্ছিল সে মহাউৎসাহে। মা'র মুখ জ্বলজ্বল করছে আনন্দে। নানা ছুতোয় মা'র ঘরে ঢুকে মা কী করছেন দেখতে চেয়েছে কেশি। কিন্তু বারবারই ওরা হেসে, জোর করে ঘর থেকে ওকে বের করে দিয়েছে।

মা'র ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছিল না কেশি। মা'র বয়স চল্লিশ। কুড়ি বছর ধরে বৈধব্য জীবন-যাপন করছেন তিনি। এ জীবনের দু:খ কষ্ট তাঁর চেহারায় এনে দিয়েছিল একটা কাঠিন্য, চোখের কোলে কালি পড়েছিল তাঁর। কিন্তু কী এক যাদু মন্ত্র বলে সেই কাঠিন্য চেহারা থেকে উধাও, চোখের নিচে কালিও নেই। সাদা শাড়িতে অপূর্ব লাগছিল মাকে। কেশি তার মা'র মতো সুন্দরী জীবনে দেখেনি।

কেশি ভয় পাচ্ছিল রাত্রি জাগরণ এবং ক্লান্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়বেন মা। যে প্রতিরাতে বিছানায় যাওয়ার আগে মাকে বলে 'শুতে যাও, মা।' কিন্তু মা শুতে যান না। উল্টো ছেলের শিয়রে বসে মাথার তালুতে তেল মেখে দেন। কেশি ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত বসে থাকেন।

মাথার তালুতে তেল না ঘষলে ঘুম আসে না কেশির। পরীক্ষার সময় সারারাত জেগে পড়া তৈরি করত সে। মা মাথায় তেল ঘষে দিতেন মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখার জন্য। তারপর কপাল টিপতেন, মখমলের মত নরম হাতের স্পর্শে রাজ্যের ঘুম এসে জড়ো হতো কেশির চোখে। অবশেষে ঘুমিয়ে পরত সে।

ঘুম আনার এ কৌশল মা'র কাছ থেকেই শিখেছে কেশি। ক্লান্তি কিংবা দুশ্চিন্তায় মা যখন অনিদ্রায় ভোগেন, কেশি মা'র শিয়রের কাছে বসে। মা'র ঘুম না আসা পর্যন্ত তার কানের পেছনে ঘষে দেয় তেল। কৈশোরে, তের/চোদ্দ বছর বয়সে তার মা তার মাথা টেনে নামিয়ে চুমু খেতেন ঠোঁটে। কিন্তু বড় হবার পরে, যখন ব্যাচেলর ডিগ্রী পেল কেশি, শেষ করল মাস্টার্স ডিগ্রী এবং স্থানীয় কলেজে যোগ দিল মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে, তারপর থেকে মা আর তাকে ঠোঁটে চুমু খান না, চুম্বন করেন কপালে।

কেশি বারবারই ভাবছিল এসব আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য থেকে মাকে উদ্ধার করে জোর করে শুইয়ে দেবে বিছানায়। কিন্তু ভয়ানক ব্যস্ত মাকে মহিলাদের দঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করা গেল না। তিনি ফুলশয্যায় ফুলের পাপড়ি বেছাতে ব্যস্ত। শহরের সবগুলো ফুলের দোকানে লোক পাঠিয়ে ফুল কিনে এনেছেন তিনি। টাকা ওড়াচ্ছেন খোলামকুচির মত যেন অর্থ অতি তুচ্ছ একটি বস্তু। কেশির বলতে ইচ্ছে করল, 'মা, নিজের শরীরের ক্ষতি করে এসব কেন করছ তুমি ? এসব ফেস্টুন, ফুলের পাপড়ি, মালা, আচার-অনুষ্ঠান সবকিছুর চেয়ে আমার কাছে মূল্যবান তোমার ভালোবাসা। তুমি এসব করতে গিয়ে তো অসুস্থ হয়ে পড়বে।' মাকে এ কথা বলেওছে কেশি। জবাব পেয়েছে, 'খোকা, আমার বিয়েটা হয়েছিল খুব সাদামাটাভাবে।' কেশি প্রতিবাদ করতে গেলে মা বলেছেন,' তোমার বাবা ছিলেন নিম্ন আয়ের কেরানী। আমি চাই না আমার

পুত্রবধুর সাদামাটা বিয়ে হোক। তুমি শুধু দ্যাখো তোমার বউ'র জন্য কী সুন্দর করে ফুলশয্যা সাজাই।'

এ ঘরে বহুদিন ছিল কেশি। ঘরটির সবকিছু তার বড় চেনা- বিছানা, আসবাব। তার মা'র ড্রেসিং টেবিল, ভ্যানিটি ব্যাগ, চুড়ির বাক্স, টেবিল ল্যাম্প (এটা তিনি বোম্বে থেকে কিনেছিলেন) ইত্যাদি আগের জায়গাতেই আছে। জেসমিনের পাপড়ি এবং ফুলের মালার জন্য আরও খোলতাই চেহারা যেন পেয়েছে ওগুলো। চাদোয়া থেকে লম্বা মালাগুলো ঝুলছে যেন মশারির মত ঘিরে রেখেছে বিছানা। বিছানার চাদরেও অসংখ্য মালা ছড়ানো। তার বউ ফুলের মালার ওপর শুয়ে আছে, যেন ফুলদেবী। মুখের অর্ধেকটা ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। বিছানার চাদর ধবধবে সাদা।

মা'র বিয়ের দৃশ্য কল্পনায় দেখার চেষ্টা করল কেশি। বাবা খাল বিভাগের নিম্ন পর্যায়ের কেরাণী ছিলেন। তাদের ফুলশয্যা নিশ্চয় হয়েছে গোয়ালঘরের মত কোনও ঘরে, দড়ির খাটিয়ায়, হারিকেনের মিটমিটে আলোয়। দৃশ্যটা আবছা লাগল কেশির কাছে, পরিষ্কার হয়ে ধরা দিচ্ছে না। পরে তার বাবা পদোন্নতি পেয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী হন। মা এরপর যা যা চেয়েছেন সবই পেয়েছেন। কিন্তু বিয়ের রাতের হতাশার কথা তিনি কোনও ভাবেই ভুলতে পারেন না। তিনি ছেলের ফুলশয্যা মনের মত করে সাজিয়েছেন যেমনটি স্বপ্ন দেখতেন নিজের জন্য। কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে ছেলেকে তিনি ফেলে দিয়েছেন মানসিক যন্ত্রণায়। ওই বেডরুমে ঢুকলেই অতীতের স্মৃতি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে মনের মধ্যে।

'দার্শনিকের বুলি কপচে সময় নষ্ট কোরো না, বাছা,' ওর এক খালা হাসতে হাসতে বলেছিলেন কেশিকে। তাঁর হাসি এবং কথা কেশির মস্তিষ্কে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে... সে আসলে করছেটা কী ? তার বউ কী ভাবছে তাকে নিয়ে ? কেশি শুনেছে ফুলশয্যার রাতে স্বামীর পুরুষত্বহীনতার কারণে অনেক জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু বিয়ের প্রথম রাতেই কী একজন পুরুষের তার পৌরুষের পরিচয় দিতে হবে ? মেয়েরা এটা কেন আশা করে ? বাসর সাজানোর সময় কী তারা এক ধরনের আনন্দ অনুভব করে, মনে পড়ে যায় নিজেদের ফুলশয্যার রাতের কথা। তার মাও কী.... ?

তার মা'র মনে দু:খ, বিয়ের সময় স্বামীর দারিদ্রর কারণে বাসর সাজাতে পারেননি। ছেলের বাসর এমনভাবে সাজিয়েছেন যেমনটা আশা ছিল নিজের বিয়েতে সাজাবেন... কেশি মাথার চুল খামচে ধরল। কেন সে মাকে বাসর সাজাতে বলেছিল। কিন্তু তখন তো সে ছোট ছিল। এত কিছু বুঝত না। মা'র তো ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল।

বারান্দায় চলে এল কেশি। তার বউ ছায়া কুঞ্জের পাশে দাঁড়ানো। 'তোমার শরীর ভাল্লাগছে না ?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল সে।

'আমি ঠিক আছি।'

'আমার কোনও আচরণে কষ্ট পেয়েছ ?'

কেশির ইচ্ছে করল অট্টহাসি দেয়। কিন্তু হাসল না। তার বউ'র খালি একটাই চিন্তা-স্বামীকে খুশি রাখা। নববধূর কোমর জড়িয়ে ধরল কেশি হাত দিয়ে, ঘরে পা

বাড়াল। প্রায় ধাক্কা মেরে বিছানায় বসিয়ে দিল স্ত্রীকে। ঝুঁকল। টান মেরে খুলে ফেলল ব্লাউজ।

নববধূ বালিশগুলো আগের মত সাজিয়ে রেখেছে। কেশির চোখ আবার গিয়ে পড়ল মা'র ছবিতে। আবার টলে উঠল মাথা। বউ জড়িয়ে ধরেছিল তাকে, ঝাঁকি মেরে নিজেকে মুক্ত করল কেশি, নেমে পড়ল বিছানা থেকে। বউ খপ করে চেপে ধরল হাত।

'কী হলো ?'

কেশি দরজার দিকে তাকাল। মা যদি নিজের ঘরের বদলে কেশির ঘরে বাসর সাজাতেন কত ভালো হতো। কিন্তু কেশির ঘর যৌতুকে পাওয়া আসবাবসহ অন্যান্য উপহারে পূর্ণ। ওই ঘরের চাবি পর্যন্ত তার কাছে নেই। হতাশ চেহারা নিয়ে বারান্দায় দৃষ্টি ফেরাল কেশি। মেঝেতে থইথই করছে জোছনা। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'দ্যাখো, কী সুন্দর চাঁদের আলো। চলো, একটু ঘুরে আসি।'

নববধূ বিছানা ছাড়ল, বিন্যস্ত কাপড় ঠিকঠাক করল। আয়নায় চট করে একবার বুলিয়ে নিল নজর, আঁচড়াল চুল, কপালে তুলে দিল ঘোমটা। স্বামীর পেছন পেছন এগোল।

গেট থেকে বারান্দা পর্যন্ত বার দুই হাঁটাহাঁটি করল দু'জনে। কেউ কোনও কথা বলছে না। জোছনা নিয়ে কী যেন বলে নীরবতা ভাঙার চেষ্টা করল বধূ একবার। তবে স্বামীর তরফ থেকে সাড়া না পেয়ে চুপ হয়ে গেল। নীরবে পায়চারি করে চলল ওরা।

স্বামীর এমন অদ্ভুত আচরণে অবাক নববধূ। তার বান্ধবীদের কাছ থেকে (এদের কেউ কেউ মা বনেও গেছে) ফুলশয্যার রাতে নব দম্পতির মধ্যে মধুর কত কিছু ঘটে বলে গল্প শুনেছে। স্বামী শুরুও করেছিল সেভাবে। হঠাৎ কী হলো তার কে জানে, বদলে গেল মন। বধূ শুনেছে তার স্বামী খুব বিদ্বান মানুষ, ভদ্র, বিনয়ী, সবাই তাকে সম্মান করে। সে কলেজে পড়ায়। বধূর বাবা হবু জামাতার-ব্যাপারে শুধু সহকর্মী লেকচারারদের কাছে খোঁজখবর নেননি, ছাত্রদের কাছ থেকেও খোঁজ নিয়েছেন। ছেলের ব্যাপারে সবকিছু জেনে, সন্তুষ্ট হওয়ার পরেই কেবল এ বিয়েতে এগিয়েছেন। কেউ কখনও বলেনি ছেলে খেয়ালী কিংবা মাথায় গন্ডগোল আছে। কিন্তু স্বামী তাকে আদর করতে গিয়েও করল না, ঈশ্বর জানে তার কপালে কী আছে। চোরা চোখে স্বামীকে একবার দেখল বধূ, পাশে হাঁটতে লাগল। জোছনা রাতের মায়াবী পরিবেশ তার মনে কোনও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারছে না।

কেশির মন যেন প্রহেলিকার মত; সঙ্কট থেকে উত্তরণের কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছে না। কোমরের পেছনে হাত বেঁধে একভাবে পায়চারি করে চলেছে। আবার গেটের সামনে আসার পড়ে দ্রুত বলল কেশি, 'চলো, রাস্তা থেকে হেঁটে আসি।'

'কিন্তু এখনতো অনেক রাত,' মৃদু গলায় আপত্তি জানাল নববধূ।

কেশির মনে পড়ল ওর এক বন্ধু বলেছিল গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং জলের ট্যাংকের মাঝখানের গলিপথটুকু বেশ নিরিবিলি চমৎকার-প্রেমিক প্রেমিকার ঘুরে বেড়ানোর জন্য উৎকৃষ্ট জায়গা....

‘শুধু জলের ট্যাংক পর্যন্ত যাবো।’

গেট খুলল কেশি। স্ত্রী নীরবে অনুসরণ করল তাকে। কেশি জায়গাটির বিশদ বিবরণ দিতে শুরু করল: এক সময় এ এলাকায় রেলওয়ের সিনিয়র ইংরেজ কর্মকর্তারা বাস করতেন। ওই সময় এলাকাটি খুবই অভিজাত আবাসিক এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতার পরে বাংলোগুলো দখল করে নেয় ভারতীয়রা। ময়দার কলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কেশি ব্যাখ্যা করল কীভাবে এখানে গম এবং শস্যদানা পেষা হয়। কোল্ড স্টোরেজ দেখিয়ে বলল এখানে চল্লিশহাজার মন আলু রাখা যায়। ছাপাখানার সামনে এসে জানালা দিয়ে উঁকি দিল কেশি। জোরে জোরে ব্যাখ্যা করল কীভাবে কাগজ ছাপা হয়। রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছিল সে। মনে পড়ে গেল গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং জলের ট্যাংকের মাঝখানের গলিপথের কথা। লেভেল ক্রসিংয়ের গেটের দিকে ঘুরল ওরা। বন্ধ। পাশের একটি গেট দিয়ে ঢুকে রেল লাইন পার হলো দু'জনে। চলে এল জলের ট্যাংকের সামনে। অর্ধেক রাস্তা আলোময় বাকি অর্ধেক অন্ধকার। অন্ধকার রাস্তার দিকে পা বাড়িয়েছে কেশি, আপত্তি জানাল নববধূ। ‘বাড়ি চলো। অনেক রাত হয়েছে।’ কেশি স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরল ডান হাতে। ‘একটু শুধু হেঁটে আসব। দেখবে গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো রাস্তায় পড়ে কী সুন্দর লাগছে।’

‘অন্ধকার রাস্তায় যাবার কী দরকার ?’

‘ভয় পেলে?’ ঠাট্টা করল কেশি। চুমু খাওয়ার জন্য মুখ নামাল।

নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিল বধূ। লজ্জায় লাল। ‘তুমি কী করছ... খোলা রাস্তায়...এভাবে.....’

হেসে উঠল কেশি। আবার জড়িয়ে ধরল স্ত্রীর কোমর। চেঁচিয়ে বলল, ‘আমার বউ'র সঙ্গে আমি যা খুশি করব। কার বাপের কী।’ আবার ঝুঁকে এল সে চুমু খেতে। এবারও চুম্বন করা হলো না। হেডলাইটের তীব্র আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ; সগর্জনে পাশ কাটিয়ে চলে গেল একটা ট্রাক। ধাক্কাটা মাত্র সামলে উঠেছে আরেকটা ট্রাক চলে এল- পেছনে ট্রাকের বিশাল বহর। ‘খালি রাস্তাই বটে। হু।’ বিড়বিড় করল কেশি। তার রোমান্টিক মূডটাই গেল নষ্ট হয়ে।

‘ফিরে চলো।’ চোখ ভরা জল নিয়ে আকুতি জানাল বধূ।

‘আমার খুব ক্লান্ত লাগছে।’

‘এটা মেইন রোড, দিন-রাত সবসময় এখানে ট্রাক আর গাড়ি চলে,’ ব্যাখ্যা করল কেশি। ‘এম টি লাইনে চলো যাই। চার্চের রাস্তাটা বেশ নিরিবিলি।’

‘আমার পা আর চলছে না,’ কাতর গলা তরুণীর।

বধূর কোমরে কেশির হাতের চাপ বাড়ল, খোলা রাস্তা ধরে পা বাড়াল মিলিটারি ট্রেইনিং লাইনের দিকে।

রাস্তার দু'পাশের বাড়িঘর ভরা জোছনায় স্নান করছে। বাতাসে ফুলের গন্ধ। স্ত্রীকে নিয়ে একটা গাছের নিচে দাঁড়াল কেশি।

'তোমার সত্যি খুব ক্লান্ত লাগছে ?' জিজ্ঞেস করল সে। জবাব দিল না বধূ। স্বামীর বুকে মাথা রাখল। দু'হাতের চেষ্টায় স্ত্রীর মুখখানা বন্দি করল কেশি, তুলে ধরল, চুমু খেল ঠোঁটে।

রাস্তার ওপাশ থেকে জ্বলে উঠল টর্চ, আলোক রেখা আছড়ে পড়ল নবদম্পতির গায়ে। বিদুৎস্পৃষ্টের মতো পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওরা। ম্লান হয়ে গেছে কেশির চেহারা; পাঁজরের গায়ে দমাদম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিন্ড। মনে পড়ে গেল এম টি লাইন-এ মাঝরাতের পরে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

গাঢ় সবুজ রঙের ইউনিফর্ম পরা একদল সৈন্য লেটেস্ট একটি হিন্দি ছবির গানের সুর ভাজতে ভাজতে এগিয়ে এল ওদের দিকে। ওরা গাইছিল

তুমি কী চাঁদ
নাকি সূর্যের আলো ?
তুমি যা-ই হও
তুমি ঈশ্বরের সৃষ্টি এক অপরূপা

ফকফকা জোছনা অথচ ওরা অসভ্যের মত টর্চের আলো ফেলছে কেশিদের গায়ে।

কেশি তার স্ত্রীকে বাহুডোরে বেঁধে চোখে চোখ রেখে গাইতে চেয়েছিল গানের প্রথম লাইন ক'টি: *'তুমি কী চাঁদ নাকি সূর্যের আলো ?'* কিন্তু সৈন্যদের অসভ্য আচরণ রোমান্টিক ইচ্ছেটাকে নষ্ট করে দিয়েছে সম্পূর্ণভাবে। একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল কেশির। তার এক বন্ধু এবং বন্ধুর বোন এম-টি লাইনের এক বাংলোতে ডিনার শেষে বাড়ি ফিরছিল। রাত যে অনেক হয়ে গেছে বুঝতে পারেনি ওরা। রিকশা খুঁজছিল। রাস্তা ধরে হাঁটছে ওরা, রাত তখন সাড়ে বারোটা, সৈনিকরা হঠাৎ পথ রোধ করে দাঁড়ায়। ওদেরকে নিমন্ত্রণ-কর্তার বাড়ি গিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছে যে তারা ভাই-বোন...

বউ ফিরে যাওয়ার কথা আবার উচ্চারণ করার আগেই কেশি বাড়ির দিকে পা বাড়াল। সৈন্যরা যখন টর্চের আলো ফেলছিল তার বউ'র মুখে, রাগে আগুন ধরে গিয়েছিল কেশির গায়ে। ইচ্ছে করছিল টর্চ হাতে সৈন্যটার কলার চেপে ধরে কষে থাপ্পর বসিয়ে দেয় গালে। কিন্তু এমনটি করতে গেলে কেউ যদি জিজ্ঞেস করত এত রাতে জনমানবশূণ্য রাস্তায় অধ্যাপক তার বউকে নিয়ে কী করছিল, তখন কী জবাব দিত কেশি ?... অনেক কস্টে রাগ দমন করল সে।

দ্রুত কদমে বাড়ি ফিরছে কেশি; পেছনে তার স্ত্রী, কয়েক হাত দূরে। গেটে ঢুকে গতি মন্থর করল সে। বধূ যে রেগে গেছে চেহারা দেখে বোঝা গেল পরিষ্কার, তাকে দ্রুত পদক্ষেপে পাশ কাটাল।

কেশি বেডরুমে ঢুকে দেখল বধূ শুয়ে পড়েছে বিছানায়। শাড়ির বেশীরভাগ অংশ লুটাচ্ছে মেঝেতে। লো-কাট ব্লাউজ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে পীনোন্নত পয়োধর। কেশির ইচ্ছে করল হাঁটু গেড়ে বসে মাথাটা রাখে বধূর কোলে। কিন্তু তার চোখ কী এক অমোঘ আকর্ষণে বধূকে ছেড়ে ঘুরে গেল মা'র ছবির দিকে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাবনায় ডুবে গেল কেশি। মেয়েটি তাকিয়ে আছে ছাদে, চোখের কোণ বেয়ে গড়াচ্ছে জল। কেশি তার ঘরের দরজায় একবার তাকাল। 'এ দরজা তো বাইরে থেকে বন্ধ করা যায়' না ?

'যায়,' সিলিং থেকে চোখ না সরিয়েই জবাব দিল বধূ। কেশি বার দুই পায়চারি করল ঘরে। 'চাবি কই ?'

'বোধহয় খালার কাছে। উনি ওই ঘরে সমস্ত আসবাব ঢুকিয়েছেন।'

কেশি বাড়ির অপর প্রান্তে চলে এল। মা'র বেডরুমের বাতি নেভানো। অন্যান্য মহিলারাও নিশ্চয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাকে ডেকে তুলবে কেশি ? ডাক শুনে খালা যদি উঠে পড়েন, ওকে নিয়ে নির্ঘাত মশকরা শুরু করে দেবেন। শোবার ঘরে ফিরে এল কেশি। কিছুক্ষণ পায়চারি করল। চোরা চোখে দেখল স্ত্রীকে। এখনও পাথর-দৃষ্টি সিলিং-এ। কেশি নিজের বেডরুমের দরজায় গিয়ে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল। শক্ত ছিটকিনি। ধাক্কায় কাজ হলো না। খুলল না। মা দরজার নিচের দিকে ছিটকিনিটা সবসময় টেনে রাখেন। ওপরের ছিটকিনি বন্ধ থাকলে কাঁচ ভেঙে হাত বাড়িয়ে সে ছিটকিনি খুলে ফেলতে পারত।

পিছিয়ে এল কেশি। পরখ করল দরজা। দরজার দু'পাশে তিনজোড়া কাঁচ লাগানো, সেই সঙ্গে কাঠের কাজও আছে। তিন নম্বর কাঁচটা ভেঙে ফেলতে পারলে হাত বাড়িয়ে নিচের ছিটকিনির নাগাল পাওয়া সম্ভব। ঘুসি মেরে কাঁচ ভাঙার চিন্তা করল কেশি। কিন্তু কাঁচ ভাঙার শব্দে মা জেগে উঠবে ভাবতেই চিন্তার গোড়ায় ঠান্ডা জল পড়ল। হাত মুঠো করে ঘরে পায়চারি করতে লাগল সে। বার কয়েক পায়চারি শেষে আবার এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। তাকাল দরজার নিচে। দরজার ডানদিকের খানিকটা অংশ ভাঙা। মেঝেতে বসে পড়ল কেশি। পিঠ ঠেকাল খাটে, গায়ের সমস্ত শক্তিতে ফাটা দরজায় পা দিয়ে চাপতে লাগল। খাট সরে গেল পেছন দিকে কিন্তু দরজার কিছুই হলো না।

বধূ নি:সাড় পড়ে আছে বিছানায়; সিলিং থেকে চোখ সরছে না। খাট যে সরে গেছে তাও খেয়াল করেনি। কেশি আড়চোখে দেখল বউকে। বউ ফিরল তার দিকে। চোখে চোখ পড়ল দু'জনের। বধূর চোখে রাগ এবং বিতৃষ্ণা। যেন একটা পাগল দেখছে। হঠাৎ কী হয়ে গেল কেশির জানে না, লাফ মেরে সিধে হলো। প্রচন্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল দরজার মাঝখানের কাঁচে। ঝনঝন শব্দে ভাঙল কাঁচ। টুকরোগুলো পড়ে গেল ওপাশে।

দারুণ একটা ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসল বধূ। চেহারায় বিস্ময়। বিছানা থেকে নামল সে, দাঁড়াল স্বামীর পাশে। 'করছ কী তুমি ?' পরিষ্কার বিরক্তি কণ্ঠে।

জবাব দিল না কেশি। স্ত্রীর দিকে তাকাল না পর্যন্ত। ভাঙা কাঁচের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল হাত, ওপাশের ছিটকিনি খূলে ফেলল। ডান হাতটা ফাঁক থেকে সাবধানে বের করতে গেল কেশি, ভাঙা কাঁচে খোঁচা খেল কনুই। কেটে গেল। দরদর ধারায় ঝরতে শুরু করল রক্ত।

'সর্বনাশ, কী করলে তুমি !' আর্তনাদ করে উঠল বধূ। পাগলের মত এদিক-ওদিক তাকাল ব্যান্ডেজ করার মত কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখতে।

বউ'র দিকে মনোযোগ নেই কেশির। সে দু'হাত দিয়ে ধাক্কা মারল কপাটে। ক্যা আ আচ শব্দে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল কেশি। সুইচ টিপে বাতি জ্বালল। ঘর বোঝাই যৌতুক আর উপহারে-ড্রেসিং টেবিল, আলমারি, সারি সারি কাপড়, মিষ্টির হাড়ি, ফল। যৌতুকে পাওয়া খাটখানাও আছে বিছানাসহ। তবে বিছানা ভরে আছে জামা-কাপড়ের স্তুপে। কাপড়ের স্তুপগুলো দু'হাতে তুলে ধরে সোফায় ছুঁড়ে ফেলল কেশি।

বধূ তার স্বামীর পেছন পেছন চলে এসেছে। তার চোখে এখন বিস্ময় নেই, আছে ভয়। ঘুরল কেশি। বউ'র কাঁধে হাত রাখল। ভয়ার্ত চোখে চোখ রাখল; তারপর টেনে নিল নিজের কাছে, চুমু খেল মুখে। ভীত বধূ স্বামীর পরিবর্তনটা টের পেল সহজেই। স্বামীর ভেতরে কিছুক্ষণ আগের সেই আড়ষ্টতা অদৃশ্য, সেখানে ভর করেছে আবেগ। বধূ টের পেল তার কানের পেছনে গরম নিশ্বাস পড়ছে। স্বামীর উষ্ণ আলিঙ্গনে তার পেশীতে ঢিল পড়ল, নরম হয়ে উঠল শরীর, সে কেশির চুলে হাত বোলাতে লাগল।

পরদিন সকালে কেশি'র মা ঘুম থেকে উঠে চলে এলেন বধূর বাসর ঘরে। দরজা খোলা দেখে পা টিপে টিপে এগোলেন। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলেন। দৃশ্যটা দেখে চোখ কপালে উঠল তাঁর। সুসজ্জিত ঘর খালি। তাঁর চোখ চলে গেল অপর দরজার দিকে। মেঝেতে ভাঙা কাঁচের টুকরো দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। চোর-টোর আসেনি তো ? তিনি পা বাড়ালেন ওদিকে। দোরগোড়ায় এসে মূর্তির মত জমে গেলেন। সোফার কুশন বিছানায় বিছিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে নবদম্পতি।

লেখক পরিচিতি

উপেন্দ্রনাথ আশক (১৯১০–) সৃজনশীল লেখালেখি শুরুর আগে তিনি রেডিও এবং সাংবাদিক হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ে তোলেন। তিনি ৭৫টির ও বেশী বই লিখেছেন, এর মধ্যে রয়েছে ১২টি উপন্যাস, ১৩টি পূর্ণাঙ্গ নাটক, এবং ১৩টি ছোট গল্পের সংকলন। তিনি হিন্দি এবং উর্দু উভয় ভাষায় লিখেছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লেখার মধ্যে রয়েছে: বারগাদ কি বোট (কবিতা) ১৯৪৭; গিরতি দিওয়ারে ১৯৪৭; শেহর মে ঘুমটা আয়না, ১৯৬২; এক নানহি কিন্তিল, ১৯৬৯; বান্ধো না নাভ ইস থানভ, ১৯৭৪ (সবগুলো উপন্যাস); তুফান সে পহলে (নাটক); এবং উদাসী শাম, কালে সাহেব, যব শান্তরাম নে বলনা উঠায়া, কংকরা কা তেলি, দাচি, নসুর ও আজগর (সবগুলো গল্পগ্রন্থ)। উপেন্দ্রনাথ ১৯৬৫ সালে সঙ্গীত নাটক আকাদেমী সেরা চিত্রনাট্য পুরস্কার পেয়েছেন এবং ১৯৭২ সালে অর্জন করেছেন সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহেরু অ্যাওয়ার্ড।

লাজবন্তি

রাজেন্দর সিং বেদী

লাজবন্তির পাতা শুকিয়ে যায়
মানুষের হাতের স্পর্শে
পাঞ্জাবী লোকগীতি

ভয়ানক দাঙ্গার পরে মানুষ তাদের শরীর থেকে রক্ত মুছে নেয়ার পরে মনোযোগ ফেরাল সেইসব লোকের প্রতি দেশ বিভাগের কারণে যাদের হৃদয় ভেঙে গেছে।

প্রতিটি রাস্তায় এবং গলিপথে তারা পুনর্বাসন কমিটি তৈরি করল। শুরুতে শরণার্থীদের ক্যাম্প, বাড়িতে, ভূমিতে শরণার্থীদের পুনর্বাসনে বেশ উৎসাহ নিয়ে কাজ শুরু করল লোকজন। তবে অপহৃত নারীদের পুনর্বাসনের বিষয়টি তখনও শুরু হয়নি। এদেরকে উদ্ধার করে বাড়ি পাঠানোর কাজটি বেশ কঠিন মনে হলো। সমর্থকদের শ্লোগান ছিল, 'তাদেরকে আপনাদের হৃদয়ে পুনর্বাসিত করুন।' তবে নারায়ণ বাবার মন্দির এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন এর সাংঘাতিক বিরোধী ছিল।

প্রচার অভিযান চালু করে মোল্লা শাকুরের অধিবাসীরা। তারা 'হৃদয়ে পুনর্বাসন' কমিটি গঠন করে। স্থানীয় এক আইনজীবীকে এর সভাপতি করা হয়। তবে এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সেক্রেটারির পদটি দেয়া হয় বাবু সুন্দরলালকে। সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে এগার ভোট বেশি পেয়েছে। বুড়ো দরখাস্ত লেখকসহ মহল্লার বেশীরভাগ গণ্যমান্য লোকের অভিমত, সুন্দরলালের চেয়ে আন্তরিকভাবে কাজ কেউ করে না। কারণ দাঙ্গায় অপহৃত নারীদের মধ্যে তার স্ত্রীও ছিল। তার স্ত্রী লাজবন্তিকে এখনও উদ্ধার করা যায় নি।

হৃদয় পুনর্বাসন কমিটি প্রতিদিন সকালে রাস্তায় মিছিল নিয়ে বের হয়। মিছিল নিয়ে যেতে যেতে তারা গান গায়। যখন সুন্দরলালের বন্ধু রাসালু এবং নিকি রাম গাইতে শুরু করে, 'লাজবন্তির পাতা শুকিয়ে যায় মানুষের হাতের স্পর্শে' নীরব হয়ে যায় সুন্দরলাল। সে যেন ঘোরের মধ্যে হাঁটতে থাকে। লাজবন্তি কোথায়? তার কী সুন্দরলালের কথা মনে পড়ে ? সে কী কোনওদিন ফিরে আসবে সুন্দরলালের কাছে?... তার গতি আরও মন্থর হয়ে যায় ইটের রাস্তায়।

লাজবন্তিকে ফিরে পাবার সকল আশা বিসর্জন দিয়েছে সুন্দরলাল। সে ভেবে নিয়েছে বহু মানুষের মত এটা তার জীবনের একটা লস। সামাজিক নানা কাজ-কর্মে ব্যস্ত থেকে ব্যক্তিগত দু:খকষ্টগুলো আড়াল করে রাখতে চায় সুন্দরলাল।

লাজবন্তির সঙ্গে একসময় খুব খারাপ ব্যবহার করেছে সুন্দরলাল। লাজবন্তি যা-ই করত, প্রতিটি কাজে সে খুঁত ধরত-এমনকী মেয়েটির হাঁটা, বসা, রান্না, খাবার পরিবেশন কোনও কিছুই মন:পূত হতো না সুন্দরলালের। সামান্য ভুলচুক হলেই লাজবন্তির গায়ে হাত তুলত সুন্দরলাল।

তার লাজো ছিল দেবদারু গাছের মত নমনীয়, কমনীয়। খোলা বাতাস এবং সূর্যের আলোর স্পর্শে লাজবন্তির চামড়া ছিল উজ্জ্বল, তার মধ্যে এনে দিয়েছিল পশুর ক্ষিপ্রতা। সে গ্রামের মেঠোপথে হেঁটে বেড়াত যেন পাতার ওপর শিশির বিন্দুর মোহনীয়তায়। তার সুঠাম শরীরে ফেটে পড়ত স্বাস্থ্য। তবে লাজবন্তিকে প্রথম দেখায় তেমন ভালো লাগেনি সুন্দরলালের। লাজবন্তির গায়ে প্রায়ই হাত তুলত সে। কিন্তু মানুষের সহ্যের তো একটা সীমা আছে। যদিও প্রচন্ড মার খেয়েও হাসত লাজবন্তি। বলত, 'আমাকে যদি আবার মারো তুমি, তোমার সঙ্গে কথা বলব না আমি।'

স্বামীর প্রহারের কথা খুব সহজে ভুলে যেত লাজো। সে ধরে নিয়েছিল স্বামীরা স্ত্রীদের মারবেই। এ তাদের ন্যায্য অধিকার। বরং স্বামী স্ত্রীকে প্রহার না করলে মহিলারা ভাবতে থাকে... 'সে কেমন পুরুষ মানুষ ! ওইরকম একটা মেয়েকেও সামলাতে পারে না !'

যেসব স্বামী স্ত্রীদের প্রহার করে তাদের নিয়ে গানও বাধা হয়েছে। লাজো এ গানের কয়েকটি কলি গুনগুনিয়ে গাইত:

'আমি শহুরে বাবুকে করব না বিয়ে
শহুরে বাবুরা জুতো পরে
আর আমার নিতম্ব যে ছোট।'

তবে লাজো শহর থেকে আসা এক তরুণেরই প্রেমে পড়ে গিয়েছিল প্রথমে। সে সুন্দরলাল। সে লাজবন্তির বোনের বিয়েতে এসেছিল। তার বন্ধু ছিল বর। লাজবন্তিকে দেখে বরের কানে কানে বলেছিল, 'তোমার শ্যালিকা তো রসে টসটস করছে। ইচ্ছে করছে খেয়ে ফেলি।' সুন্দরলালের কথা শুনে ফেলেছিল লাজো। তার মস্তিষ্কে ঢুকে যায় কথাগুলো। তবে সুন্দরলালের পায়ের শক্ত জুতো লক্ষ করেনি সে, মনেও ছিল না তার নিতম্ব খুব বেশী প্রশস্ত নয়।

পরদিন সকালে মিছিলে সুন্দরলাল বিড়বিড় করে বলছিল 'আমি যদি আরেকটি সুযোগ পাই, শুধু আরেকবার সুযোগ, আমি তাকে আমার হৃদয়ে পুনর্বাসিত করব। আমি মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব-এই বেচারী নারীদের দোষ দিয়ো না। ওরা শুধু লোভী পুরুষের শিকার। যে সমাজ এই অসহায় মেয়েদের গ্রহণ করতে অস্বীকার জানায় তারা কেন প্রায়শ্চিত্ত করবে, তারা সমাজে সমঅধিকার পাবার যোগ্য।'

মিস মৃদুলা সারাভাই ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে অপহৃত নারীদের বিনিময়ের ব্যবস্থা করেন। মোল্লা শাকুরের কয়েকজন এসব নারীকে ফিরিয়ে নিতে রাজি হয়।

তাদের আত্মীয়-স্বজন বাজারে গিয়ে তাদের নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে দেখা যায় অপহৃত নারী এবং তার স্বামী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে অস্বস্তিকর নীরবতা নিয়ে। তারপর তারা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে বাড়ি ফেরে। রাসালু, নিকিরাম এবং সুন্দরলাল পুনর্বাসনকারীদের উৎসাহিত করে তুলতে শ্লোগান দেয়। 'দীর্ঘজীবী হোক মহিন্দর সিং.... দীর্ঘজীবী হও মোহনলাল।' চেঁচাতে চেঁচাতে গলা ভেঙে যায় তাদের।

তবে কেউ কেউ অপহৃত নারীদের ফিরিয়ে নিতে আগ্রহী নয়। 'ওরা আত্মহত্যা করল না কেন? বিষ খেয়ে মরলেই পারত। সম্মান বাঁচত। কুয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়লেও হতো। ওরা ভীতুর দল, এত অপমান সয়েও বাঁচতে চায়....'

সম্মান বাঁচাতে অবশ্য হাজার হাজার নারী আত্মহত্যা করেছে... তারা জানে না ফিরে আসা মহিলাদের কী তীব্র মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়।

মিস সারাভাই ট্রাক বোঝাই করে হিন্দু মেয়েদের নিয়ে এসেছেন পাকিস্তান থেকে। ভারতীয়রা যে সব পাকিস্তানি মহিলাদের অপহরণ করেছে তাদের সঙ্গে এদের বিনিময় হবে। লাজবন্তি এদের মধ্যে নেই। ট্রাক থেকে এক এক করে শেষ হিন্দু মেয়েটি নামার পরে লাজবন্তিকে এদের মধ্যে না দেখে দারুণ হতাশ হলো সুন্দরলাল। সে বুকের মধ্যে দু:খ চেপে ফিরে গেল কমিটির কাজে। কমিটির ব্যস্ততা বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। এখন তারা সকাল-সন্ধ্যা দু'বার মিছিল করে গান গায়। বুড়ো আইনজীবী কালকা প্রসাদ সর্দি বসা গলায় মাইকের সামনে বক্তৃতা করেন। নিকিরামও দু'একটা কথা বলে। তবে সুন্দরলাল বেশীক্ষণ বক্তৃতা করতে পারে না। তার গলা শুকিয়ে আসে, চোখ দিয়ে জল পড়ে। বুক ভরা অনেক কথা তার। কিন্তু বলতে পারে না কিছুই। অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে আসে দর্শকদের মধ্যে।

একদিন দুপুরে হৃদয় পুনর্বাসিত কমিটি বেরিয়েছে মিছিল নিয়ে। তারা মন্দিরের কাছে এসেছে, দেখল পিপুল গাছের নিচে, সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো রোয়াকে বসে একদল লোক রামায়নের গল্প শুনছে। নারায়ণ বাবা বলছেন গল্প। রাম শুনছেন এক ধোপা তার স্ত্রীকে বলছে, 'আমি শ্রী রামচন্দ্র নই যে তোমার মত মেয়েকে গ্রহণ করব যে কিনা বহুদিন পরপুরুষের ঘরে ছিল।' এ ঘটনা রামকে এতই প্রভাবিত করে তিনি ঘরে ফিরে স্ত্রী সীতাকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেন।

'নৈতিকতার এরচেয়ে বড় উদাহরণ কী হতে পারে ?' নারায়ণ বাবা জিজ্ঞেস করলেন তাঁর দর্শকদের। 'তাঁর রাজ্যে এভাবেই সবার প্রতি সমান দৃষ্টি ছিল শ্রী রামের, এমনকী এক গরীব ধোপার প্রতিও তাঁর পূর্ণ বিবেচনা ছিল। এ হলো সত্যিকারের রাম রাজ্য-পৃথিবীর বুকে দেবতার রাজ্য।'

মিছিলটি দাঁড়িয়ে নারায়ণ বাবা'র ব্যাখ্যা শুনছিল চুপচাপ। সুন্দরলাল বলে উঠল, 'এ ধরণের রাম রাজ্যের আমাদের দরকার নেই।'

'চুপ করো.... এ লোকটা কে ? ....চুপ।' দাবরে উঠল দর্শক। সুন্দরলাল ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সামনে। উঁচু গলায় বলল, 'আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমি কথা বলবই... তেতে উঠল দর্শক। 'চুপ'...তুমি আর একটা কথাও বলবে না,' একজন গলা ফাটাল। 'তোমাকে আমরা হত্যা করব।'

নারায়ণ বাবা মৃদু গলায় বললেন, 'সুন্দরলাল, তুমি আসলে বেদব্যাসের পবিত্র ঐতিহ্য বুঝতে পারছ না।'

সুন্দরলাল বলল, 'আমি একটা কথা বেশ বুঝতে পারছিঃ রামরাজ্যে ধোপার কথা শোনা হয়েছিল, কিন্তু একালের রামরাজ্যে কেউ সুন্দরলালের কথা শুনতে চায় না।'

যারা সুন্দরলালকে মারতে চেয়েছিল তারা চুপ হয়ে গেল।

'ওকে বলতে দাও,' বলল রাসালু এবং নিকিরাম। 'চুপ করো !

যারা সুন্দরলালকে মারতে চেয়েছিল তারা চুপ হয়ে গেল।

'ওকে বলতে দাও,' বলল রাসালু এবং নিকিরাম। 'চুপ করো ! ও কী বলতে চায় শুনি।'

সুন্দরলাল বলতে লাগল, 'শ্রীরাম ছিলেন আমাদের নায়ক, কিন্তু এ কী ধরনের বিচার সে এক ধোপার কথা শুনে তিনি সীতার মত নারীকে ত্যাগ করলেন !'

নারায়ণ বাবা বললেন, 'সীতা তাঁর নিজের স্ত্রী ছিলেন সুন্দরলাল। এ ব্যাপারটিই তুমি বুঝতে পারছ না।'

'বাবাজী, পৃথিবীতে অনেক ঘটনাই ঘটে যা আমার বোধগম্য নয়। আমি বিশ্বাস করি সত্যিকারের রামরাজ্য হলো সেটা যেখানে কেউ কারও প্রতি অন্যায় আচরণ করে না এবং কেউ কারও দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়না।'

সুন্দরলালের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে সবাই। সে বলে চলল, 'রাম তাঁর স্ত্রী সীতাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন রাবণ তাঁকে অপহরণ করেছিলেন বলে। কিন্তু এতে সীতার কী দোষ ? আমাদের মা-বোনেরা যে আজ নির্যাতিত হচ্ছে এজন্য কী তারা দায়ী ? আমাদের সীতাদেরকেও বিনা অপরাধে আমরা ঘর ছাড়া করি, ঘরে তুলতে চাই না... আমাদের আধুনিক সীতাদের মধ্যে আছে লাজবন্তি.... আর কথা বলতে পারল না সুন্দরলাল, কান্নায় বুজে এল গলা।

রাসালু এবং নিকিরাম মাথার ওপর তুলে ধরল তাদের ব্যানার। স্কুলের বাচ্চারা সোল্লাসে চেঁচাল 'দীর্ঘজীবী হোক সুন্দরলাল বাবু।' একজন চেঁচাল, 'দীর্ঘজীবী হোক সীতা-পবিত্রতার রাণী।' আরেকজন গলা ফাটাল, 'শ্রী রামচন্দ্র কী....' 'চুপ' বলে ধমক দিল অনেকে। অনেকে ধর্মোপদশে শোনা স্বাদ দিয়ে যোগ দিল মিছিলে। তারা গাইতে গাইতে এগিয়ে চলল। লাজবন্তির পাতা শুকিয়ে যায়....'

পুব দিগন্তে তখনও ভোরের আলো ফুটিফুটি করছে। মোল্লা শাকুরের বাসিন্দাদের ঘুম ভাঙেনি। এসময় সুন্দরলালের গাঁয়ের লাল চাঁদ ছুটতে ছুটতে এল। সুন্দরলালের হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'অভিনন্দন, সুন্দরলাল।'

সুন্দরলাল জিজ্ঞেস করল, 'অভিনন্দন কীসের জন্য, লাল চাঁদ ?

'আমি লাজোর দেখা পেয়েছি।'

সুন্দরলালের হাত থেকে খসে পড়ল চিল্লাম। ছড়িয়ে পড়ল তামাকের সুগন্ধ। 'ওকে কোথায় দেখবে ?' লাল চাঁদের কাঁধ চেপে ধরল সে।

'ওয়াগাহর বর্ডারে।'

লাল চাঁদের কাঁধ ছেড়ে দিল সুন্দরলাল। 'অন্য কাউকে দেখেছ নিশ্চয়।'

'না, ভাই, সুন্দরলাল। ও লাজো।' দৃঢ় গলায় ঘোষণা করল লাল চাঁদ। 'আমাদের লাজো।'

'ওকে দেখেই চিনে ফেললে ?' হাতের তালুতে তামাক পিষতে পিষতে বলল সুন্দরলাল। 'ঠিক আছে, কীভাবে চিনলে ওকে ?

'আরি, ওকে চিনব না কেন ! ওর থুতনিতে একটা উল্কি আঁকা আছে, ডান গায়ে আরেকটা এবং.....

'ঠিক ঠিক,' লাফিয়ে উঠল সুন্দরলাল। 'তিন নম্বর উল্কিটা আছে কপালে। '

উঠে বসল সুন্দরলাল। মন থেকে দূর হয়ে গেছে সন্দেহ। মনে পড়ল লাজবন্তির শরীরের নানা উল্কির কথা, যেন লাজবন্তি পাতার গায়ে সবুজ দাগ। যে দাগ পাতা মুড়ে গেলে অদৃশ্য হয়ে যায়। তার লাজবন্তির আচরণও ছিল একই রকম, উল্কিগুলো দেখালে বিব্রত বোধ করত মেয়েটি, শামুকের মত খোলে ঢুকে যেতে চাইত-যেন অসংখ্য মানুষের সামনে তাকে নগ্ন করা হয়েছে। লাজবন্তিকে দেখার প্রচন্ড বাসনা এবং সেই সঙ্গে অদ্ভুত একটা ভয় জেগে উঠল সুন্দরলালের মনে। সে লাল চাঁদের বাহু খামচে ধরে প্রশ্ন করল, 'লাজো বর্ডারে গেল কীভাবে ?'

'ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে অপহৃত নারী বিনিময় হচ্ছে।'

'তারপর কী হলো বলো ?' সিধে হলো সুন্দরলাল।

লালচাঁদ গল্প বলে যেতে লাগল.... 'বর্ডারে পাকিস্তানীরা ষোলটি মহিলাকে নিয়ে এসেছে, ফিরিয়ে নিয়ে গেছে ষোলজনকে। বেশীরভাগ বৃদ্ধা-কিংবা মধ্যবয়সী। বিনিময়ের সময়ে দু'পক্ষে খুব বাকবিতন্ডা হয়। আমি ট্রাকের ওপর লাজো ভাবীকে দেখতে পাই। চেঁচিয়ে উঠি 'লাজো ভাবী !' বলে। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। পুলিশ ট্রাক নিয়ে চলে যায়। পুলিশের সঙ্গে আমাদের একচোট ধস্তাধস্তি হয়েছে।'

কনুই'র কাছে জামা তুলে দেখাল লাল চাঁদ। পুলিশের লাঠির বাড়িতে লাল হয়ে আছে জায়গাটা। রাসালু এবং নিকিরাম চুপচাপ বসে রইল। ফাঁকা চোখে শূণ্যে তাকিয়ে আছে সুন্দরলাল।

সুন্দরলাল ওয়াগাহ্ বর্ডারে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, শুনতে পেল ফিরে এসেছে লাজবন্তি। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে কিনা বুঝে উঠতে পারছিল না নার্ভাস সুন্দরলাল। নাকি বাড়িতে অপেক্ষা করবে ? ইচ্ছে করল বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়, সমস্ত ব্যানার আর প্ল্যাকার্ড ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁদে প্রাণ খুলে। কিন্তু এসব কিছুই করল না সে। গেল থানায়। যেন কিছুই ঘটেনি। হঠাৎ দেখতে পেল লাজো দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। ভীত দেখাচ্ছে, পিপুল পাতার মত কাঁপছে।

চোখ তুলে চাইল সুন্দরলাল। লাজবন্তির পরনে মুসলমান মেয়েদের দোপাট্টা; মাথায় মুসলিমদের মত করে ঘোমটা জড়ানো। লাজোর শশীর-স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো হয়েছে, গায়ের রঙ ফর্সা লাগছে, ওজনও যেন বেড়েছে। দেখে হতাশ বোধ করল সুন্দরলাল। স্ত্রীকে কিছু বলবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে সুন্দরলাল। কিন্তু লাজো

যদি পাকিস্তানে সুখেই থেকে থাকে তাহলে এল কেন এখানে ! সরকার কী তাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে?

থানায় আরও অনেকে এসেছে। এদের কেউ কেউ তাদের স্ত্রীদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় না। 'মুসলমানদের উচ্ছিস্ট এই মহিলাদেরকে আমরা ফিরিয়ে নেব না।' বলল তারা। কিন্তু সুন্দরলাল তার স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে এল বাড়ি।

পুনর্বাসিতদের জন্য গঠিত কমিটিতে আগের মতই কাজ করে যেতে লাগল সুন্দরলাল। সে তার স্ত্রীকে এখন নাম ধরে ডাকে না। বলে দেবী। এ ডাকে সাড়াও দেয় লাজবন্তি। ধীরে ধীরে তার অস্বস্তি এবং জড়তা কাটতে লাগল। সে সুন্দরলালকে তার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলতে চায়। চায় সেসব কথা বলে কেঁদে, বুকটা হালকা করতে। তার সকল পাপ ধুয়ে যাবে অশ্রুজলে। কিন্তু বিষয়টি উত্থাপন করতে দেয় না সুন্দরলাল। রাতের বেলা স্বামীর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে লাজো। ধরা পড়ে গেলেও ব্যাখ্যা দেয় না। ক্লান্ত সুন্দরলাল আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

শুধু ঘরে ফেরার দিন সুন্দরলাল লাজবন্তিকে তার 'কালো দিন'গুলোর কথা জিজ্ঞেস করেছিল। প্রশ্ন করেছিল কোন্ লোক তাকে.....' লাজবন্তি চোখ নামিয়ে উত্তর দিয়েছে, 'জুম্মা।' তারপর সুন্দরলালের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে, যেন কিছূ বলতে চেয়েছে। কিন্তু সুন্দরলাল অদ্ভুত দৃষ্টিতে এমনভাবে দেখছিল লাজোকে, কথাটা বলার সাহস পায়নি সে। লাজবন্তির চুলে হাত বোলাতে বোলাতে সুন্দরলাল জিজ্ঞেস করেছে, 'লোকটা তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার গায়ে হাত তোলেনি তো ?'

লাজবন্তি স্বামীর বুকে মাথা রেখে বলেছে, 'না... আমাকে কখনও বকাও দেয়নি। মারেনি। যদিও তাকে খুব ভয় পেতাম আমি। তুমি আমাকে মারো কিন্তু তোমাকে আমি ভয় পাই না.... তুমি আমাকে আবার মারবেনাতো ?'

চোখে জল চলে এসেছে সুন্দরলালের। লজ্জা আর অনুতাপ নিয়ে বলেছে, 'না দেবী.... কক্ষনো... আর কোনও দিন তোমার গায়ে হাত তুলব না আমি।'

'দেবী !' বিড়বিড় করে শব্দটা উচ্চারণ করেছে লাজো, তারপর শুরু করেছে ফোঁপাতে। স্বামীকে সব কথা বলতে চেয়েছে সে কিন্তু তাকে বাধা দিয়েছে সুন্দরলাল। 'অতীতের কথা ভূলে যাও; তুমি কোনও পাপ করনি। পাপ করেছে এ সমাজ, তোমার এ অবস্থার জন্য দায়ী সামাজিক ব্যবস্থা যে সমাজে তোমার মত মেয়েদের সম্মান দেয়া হয় না। এতে তোমার কোনও ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি যা হওয়ার হয়েছে সমাজের।'

লাজবন্তির গোপন কথা তার বুকে আড়াল হয়ে রইল। নিজের শরীরের দিকে তাকায় সে। দেশভাগের পরে এ শরীর দেবীর শরীর হয়ে গেছে। এ শরীর আর এখন তার নয়। নিজেকে তার সুখী মনে হয়। কিন্তু সন্দেহ এবং আশঙ্কা জাগে এ সুখ হয়তো সইবে না বেশীদিন।

এভাবে চলে গেল অনেকদিন। সন্দেহ দূর হয়ে সেখানে দখল করে নিল আনন্দ। সুন্দরলাল এখন লাজবন্তির সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করে। লাজো কোনওদিন কল্পনা করেনি তার স্বামী তার প্রতি এমন সদয় আচরণ করবে। কিন্তু সে আগের সুন্দরলালকে ফিরে পেতে চায় যার সঙ্গে একটা গাজর নিয়ে ঝগড়া করত লাজো, যে তাকে বকাঝকা করত। এখন আর ওদের মধ্যে ঝগড়া হয় না। সুন্দরলালের চোখে এখন সে কাচের গ্লাসের মত যে গ্লাস যেন সামান্য ছোঁয়ায় ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে। লাজো আয়নায় দেখে নিজেকে। চিনতে পারে না নিজেকে। তাকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে কিন্তু গ্রহণ করা হয়নি। সুন্দরলাল তার চোখের জল দেখতে চায় না, তার আর্তনাদ শুনতে চায়না।

....এখনও প্রতিদিন সকালে মিছিল নিয়ে বের হয় সুন্দরলাল। লাজো ক্লান্ত শরীর নিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়। শোনে সেই গান যার অর্থ কেউ বোঝে না।

লেখক পরিচিতি (১৯১৫-১৯৮৪)

ডাক বিভাগে কেরাণী হিসেবে চাকরি জীবন শুরু, ১৯৪৮ সালে AIR-এ স্টেশন ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত হন। এরপর শুরু করেন লেখালেখি এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ। শক্তিশালী উর্দু লেখক হিসেবে একে একে তার উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে-এক চাঁদ মৈলি সি (১৯৬২) আপনা দুখ মুঝে দে দো (১৯৬৫); প্রকাশ করেন ছোট গল্পের বই দানা ও দম (১৯৩৮, গ্রহন (১৯৪১) এবং হাত হামারে) কালাম হুয়ে (১৯৭৪)। তিনি চিত্রনাট্য লিখেছেন বিজন চিজেন (১৯৪৩), সাত খেল (১৯৮১)। তিনি এক চাঁদর মৈলি সি'র জন্য ১৯৬৫ সালে সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন।

সুরমা সিং

বলবন্ত সিং

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম ওখানে তখনও হামলে পড়েনি বৃষ্টি। তবে পাহাড়ের পাদদেশের বাড়ির টিনের ছাদ থেকে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছিল পরিস্কার। যেন একদল গায়ক দলবেঁধে গাইতে গাইতে আসছে আমার দিকে। বোঝা যাচ্ছিল কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়বে বৃষ্টি। এরকম হঠাৎ বৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত মানুষজন আশ্রয়ের খোঁজে ছোটাছুটি করছে।

আকাশের মুখ কালো, বাতাসে স্যাঁতসেঁতে একটা ভাব ভেজা স্পঞ্জের মত লেপ্টে রয়েছে। ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। আমি আস্তাবলের দিকে তাকালাম। ওখানে টাট্টু ঘোড়াগুলো লেজ নেড়ে মাছি তাড়াতে ব্যস্ত। মাছিগুলো লেজের বাড়ি খেয়ে একটা ঘোড়াকে ছেড়ে আরেকটা ঘোড়ার গায়ে হামলে পড়ছে।

আমার হাঁটার গতি দ্রুত হয়ে উঠল। পাহাড়ি বৃষ্টির মতি গতি বোঝা ভার। এই ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে তো এক মিনিট পরে মেঘ কেটে হেসে ওঠে সূর্য।

টুপ টুপ বৃষ্টি হঠাৎ পরিণত হলো গর্জনে। লোকজন এবার দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। নানা দিকে ছুটছে আশ্রয়ের সন্ধানে। তবে যাদের গায়ে বর্ষাতি এবং মাথায় হ্যাট আছে তাদেরকে এই বৃষ্টিতেও তেমন উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না। তারা পয়সা দিয়ে বর্ষাতি কিনেছে। কাজেই টাকা উসুল করতে বৃষ্টি তারা পরোয়া করবেই বা কেন? এদের মধ্যে সুরমা সিংকে দেখতে পেলাম আমি।

সুরমা সিংয়ের গায়ে বর্ষাতি নেই, মাথার পাগড়ি ঢাকার চেষ্টা নেই; এমনকী একটা ছাতা পর্যন্ত নেই। তার চোখে কালো রঙের চশমা। পরনে হাতে বোনা সূতির শার্ট, হাঁটুতক লম্বা কাচ্চা এবং পায়ে একজোড়া ভারতীয় চপ্পল। তার পাগড়ি কয়েকগজ লম্বা সাদা থান কাপড় দিয়ে মোড়ানো; ডান হাতে ইস্পাতের মোটা চুড়ি। হাতে একটা লাঠি নিয়ে জোর কদমে হেঁটে চলেছে রাস্তা দিয়ে। বৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা পেতে চায় সুরমা সিং। তবে আশ্রয়ের জন্য আস্তাবলে ঘোড়াদের সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছে নেই তার।

ভুল ভেবেছি আমি। সুরমা সিং আরেক লোকের কাঁধে হাত রেখে হেঁটে আসছিল। কী যেন বলল তাকে। লোকটা তার হাত ধরে ঘোড়ার আস্তাবলে নিয়ে এল। তখন বুঝতে পারলাম সুরমা সিং অন্ধ।

হিন্দুদের মধ্যে অন্ধ লোকদের নাম সাধারণত: হয় সুরদাস, মুসলিমরা অন্ধদেরকে ডাকে হাফিজ্জি বলে, তেমনি শিখরা অন্ধদের নাম দেয় সুরমা সিং।

সুরমা সিং আস্তাবল থেকে কয়েক হাত দূরে, এমন সময় স্রোতের মত ধেয়ে এল বৃষ্টি। গোসল করিয়ে দিল সুরমা সিংকে। তার সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দিল। দাড়ি এবং গোঁফ থেকে টপটপ করে পড়তে লাগল বৃষ্টির ফোঁটা। সুরমা সিং চোখ থেকে চশমা খুলে নিল, পকেট থেকে প্রকাণ্ড রুমাল বের করে মুছতে লাগল কালো কাঁচ। তারপর আবার চোখে গলাল চশমা। লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকল আমার কাছ থেকে কয়েক কদম দূরে।

যে লোকটি আস্তাবলে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল সুরমা সিংকে, সে নেমে পড়ল বৃষ্টির মধ্যে। ছুটতে গিয়ে কাদার মধ্যে ধপাশ করে পিছলে গেল। হেসে উঠল লোকটা। ঝট করে খাড়া হলো তারপর সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোতে লাগল।

সুরমা সিং-এর মুখ অর্ধেকটা হাঁ হয়ে আছে; সামনের পাটির একটা দাঁত নেই। চক্ষুহীন কোটরের মত লাগছে দেখতে। আমি এমনভাবে তার দিকে তাকালাম যেন ভিনগ্রহবাসীকে দেখছি। সুরমা কীভাবে যেন বুঝে গেল এখানে আরও একজন আছে। আমার দিকে অনিশ্চিত কদম বাড়াল। চিহিহি করে ডেকে উঠল একটা টাট্টু। চট করে নিজের জায়গায় ফিরে গেল সুরমা-ভেবেছে ওটা মানুষ নয়, ঘোড়া।

আমি আছি স্থানীয় গুরুদোয়ারায়। এখানে যে কেউ সর্বাধিক চারদিন থাকতে পারে। টাকা-পয়সা লাগবে না। তারপর এক রূপী প্রণামী দিতে হয় পবিত্র গ্রন্থের জন্য। এক মাসের জন্য এক রূপীই যথেষ্ট। এক রূপী দিলে আলাদা ঘরও মেলে থাকার জন্য। গুরুদোয়ারায় প্রতিটি ঘরের সঙ্গে সংযুক্ত রান্নাঘর আছে। নিচতলায় আছে চারটে বাথরুম এবং পায়খানা, করুগেটেড শীট দিয়ে তৈরি। মল-মূত্রের গন্ধে টেকা দায়। গুরুদোয়ারার পেছন দিকে বৈঠকখানা; ওপরতলায় প্রার্থনা করার ঘর। বেশ বড়সড়। ওখানে বাথরুমের গা গোলানো বদবু যায় না। গুরুদোয়ারার ফটকের পরে রাস্তা। ফটকের পাশে আছে ছোট একটি ওষুধের দোকান। এখানে বিনে পয়সায় ওষুধ মেলে।

দোতলায় একটি ঘর দেয়া হয়েছে আমাকে। রান্নাঘর নেই। পাহাড়ি একটা ছেলে আমার ফুটফরমাশ খেটে দেয়, চা বানায়, স্টোভে খাবার রান্না করে।

গুরুদোয়ারা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় হলেও আশপাশের ঘরবাড়ির লোকজন এখানে ভিড় জমায় না। সমতল ভূমি থেকে ট্রেন আসে মাল সামাল নিয়ে, গুরুদোয়ারার সামনে দিয়ে ঝকরমকর শব্দে চলে যায়। সকাল দশটায় মেথর এসে পরিস্কার করে দিয়ে যায় পায়খানা; দুর্গন্ধ দূর করতে ছিটিয়ে দেয় ফিনাইল। ওই সময় পাহাড়চুড়ো থেকে খচ্চরের গলায় বাঁধা ঘন্টার শব্দ শোনা যায়। খচ্চরের সারি গুরুদোয়ারার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বিচিত্র শব্দের ঘন্টাধ্বনি উচ্চকিত হয়ে ওঠে। পায়খানার গন্ধ ঢাকা পড়ে যায় খচ্চরের মলের গন্ধে।

গুরুদোয়ারায় তীর্থযাত্রী এবং ডজনখানেক অন্যান্য অতিথি নিয়ে এ অন্যরকম জগৎ।

এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে তেমন ভাব নেই আমার, তবে কেউ কেউ আছে যাদেরকে এড়িয়ে চলা যায় না। আমার পাশের ঘরে দুই ভাই থাকে, দু'জনেই শিখ। ওদের দাড়ি দেখে শুধু বুঝতে পারি বয়সে কোন্‌জন বড়। জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের দাড়ি নাভি

ছুঁয়েছে; ছোটজনের দাড়ি বুক ছুঁইছুঁই করছে। তাছাড়া বড়ভাইয়ের দাড়ির রঙ প্রায় ধূসর; ছোটভাইয়ের ঘনকালো দাড়ির মধ্যে দু'একটা রূপালি ঝিলিক দেখা যায়। দু'জনেরই মাথায় পাগড়ি, গায়ে লম্বা কোট। এদের সকাল শুরু হয় ট্রে বোঝাই ভেষজ নিয়ে গলা ফাটিয়ে, ঝগড়া করে। সারাটা দিন তাদের কেটে যায় হারবাল মেডিসিন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে। তাদের ভেষজ ওষুধ খেয়ে কেউ কোনওদিন সুস্থ হয়েছে বলে শোনা যায়নি। সন্ধ্যার পরে দুই ভাই হাশিস গুড়ো করে, ভাং খায়। মাঝে মধ্যে দু'একজন অতিথি আসে তাদের কাছে-এরা গুরুদোয়ারার কেয়ারটেকার, বাজার থেকে পয়সাপাতি মারার সুযোগ পেলে তারা অতিথির জন্য মিষ্টি কেনে।

গুরুদোয়ারা থেকে বেরুতে মূল রান্নাঘরের সামনে থেকে যেতে হয়। দুই ভাই'র সঙ্গে মাঝে মাঝে দু'একটা কথা হয়। ওদেরকে দেখি রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। রান্না বলতে ডাল, সব্জি এবং প্রকাণ্ড লোহার তাওয়ায় ভাজা চাপাতি । এ হলো গুরু'র রান্নাঘর যেখানে বিনে পয়সায় খেতে পায় সবাই। গুরুর রান্নাঘর একটি ক্লাবের মত যেখানকার সদস্য হতে হলে যোগ্যতা চাই প্রচণ্ড খিদে।

গুরুদোয়ারায় একজন গ্রন্থি আছে, লোকে তাকে সম্বোধন করে জ্ঞানীজী বলে। প্রতিটি দর্শনার্থীর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে হয়; তার অনুমতি ছাড়া কেউ এখানে থাকতে পারে না। তিনি প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের রুম পরিদর্শনে আসেন, আমরা পরস্পরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করি। তাঁর মাথায় সাদা পাগড়ি, গলায় জাফরান রঙের রুমাল যা দিয়ে ঘন ঘন নাক মুছে চলেছেন তিনি। মনে হয় সারাক্ষণই সর্দি লেগে আছে তার-নাক ঘষতে ঘষতে লাল করে ফেলেছেন। সুরেলা কণ্ঠ শুনলে নারী বলে ভ্রম হয়। এত আস্তে কথা বলেন, শোনার জন্য খাড়া করে রাখতে হয় কান।

রাত দশটা বাজে। শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি।

আমার প্রতিবেশী দুই ভাই'র ঘরে অনেক লোক ভিড় করেছে। আড্ডা দিচ্ছে। এরা সবাই পাঞ্জাবী ভাষায় গলার স্বর সপ্তমে তুলে চেচাঁমেচি করছে। বোঝা যায় ভালোই গিলেছে ভাং। হঠাৎ থেমে গেল সবাই। আমি একটা ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসলাম বিছানায়। কেউ বেশ করুণ গলায় শিখদের দশ গুরুর নবম গুরু তেজ বাহাদুরের বন্দনা করে গাইছেঃ

মৃত্যু নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না; জন্মিলে মরিতে হইবে
শুধু ভাবো সেইসব ঘটনা নিয়ে যা অতিক্রম করে যাইবে

গুরুদোয়ারায় এই শ্লোক বহুবার শুনেছি আমি। তবে সে রাতের মত আমাকে এমন প্রভাবিত করতে পারেনি আর কখনও।

হঠাৎ নিভে গেল বাতি। ঘরগুলো থেকে আবার চেচাঁমেচি শুরু হয়ে গেল। যার ঘরে মোম ছিল সে বাতি জ্বালাল; অন্যেরা দোকানে ছুটল মোম কিনতে। তবে গায়ক গেয়েই চলল। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় তার বোধহয় কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। কারেন্ট চলে যাওয়ায় বইটা ফেলে দিলাম বিছানায়। পায়খানা থেকে ভয়ানক গন্ধ আসছে, গন্ধ অগ্রাহ্য করে পাশের ঘরের খোলা দরজায়

তাকালাম। ঘরের মাঝখানে মোটাসোটা একটি মোমবাতি জ্বলছে, মোমবাতি ঘিরে বসেছে দাড়িঅলা শিখরা। তখন বুঝতে পারলাম গায়ক অন্য কেউ নয়, সুরমা সিং। এই রাতের বেলাতেও তার চোখে চশমা । পাগড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছে লম্বা কালো চুল। ছাদের দিকে মুখ তুলে গাইছে সে। সুরের ওঠা-নামার সঙ্গে গলার পেশীর নড়াচড়া পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

সুরমা সিং যতক্ষণ গাইল, ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি।

দুই নিহাং (শিখ) ভাই নিজেদের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। তারা প্রায় সমস্ত দিন কাটিয়ে দেয় রান্নাঘরে। নতুন কোনও দর্শনার্থী এলে বলে:'আমরা হেমকুন্ড যাচ্ছিলাম। কিন্তু এখানে যাত্রা বিরতি দিই কারণ এটিও গুরুর নিবাস। জ্ঞানীজী আমাদেরকে ছাড়তে চান না।'

বদ্রিনাথের পথে, ঋষিকেশের পরে হ্রদ হেমকুন্ড। এখানে দশম গুরু গোবিন্দ সিং পৃথিবীতে আসার আগে মগ্ন ছিলেন ধ্যানে। দুই নিহাং কোনও কারণে ক্ষুব্ধ হলে বা রেগে গেলে বাক্সপেটরা গুছিয়ে নিয়ে ভয় দেখায় হেমকুন্ড চলে যাবে। তখন জ্ঞানীজী আসেন রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে। দুই ভাইকে মিনতি করেন কোথাও না যেতে। নিহাংরা মিনতিতে গলে যায়। জ্ঞানীজী তখন নিজের ঘরে ফিরে যান-রুমালে নাক মুছতে মুছতে।

নিহাংদের রেগে উঠতে বেশী সময় লাগে না। তারা কোনওদিন রান্নাবান্না করেনি। কিন্তু এছাড়া করার মত কাজও নেই; তাই তাদেরকে রান্নার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা যে কাজটি করে তা হলো চুল্লিতে আগুন জ্বালিয়ে নাস্তার আয়োজন করা। বিরাট কড়াইতে তারা পবিত্র 'হালুয়া' বানায়। আরেক চুল্লির কড়াইতে ফুটতে থাকে কালো রঙের ডাল। তৃতীয় চুল্লিতে পানি ফুটতে থাকে চা'র জন্য। ডালের চেহারা কোনওদিন হয়ে উঠে টলটলে স্যুপ, কোনওদিন নুনে পোড়া আবার কখনও নুনই পড়ে না ওতে। রান্না না থাকলে দুই ভাই লোহার লম্বা হাতা নিয়ে রান্নাঘরে পায়চারি করতে থাকে তরবারি লড়াই করার ভঙ্গিতে।

সুরমা সিংয়ের মূল কাজ ছিল গুনগুনিয়ে গাওয়া। অবসরে সে ধর্মোপদেশ শোনে এবং প্রতি দু'টি বাক্যের পরে 'ওয়াহ্ গুরু, ওয়াহ্ গুরু' বলে চেঁচিয়ে ওঠে।

নিহাংরা কাউকেই সম্মান করে কথা বলে না-সুরমা সিংকে তো তারা পাত্তাই দেয় না। তবু সুরমা সিং রান্নাঘরে ঢোকে একটু আগুন পোহাবার আশায়। সে জানে কেউ তার কথায় কান দেয় না। তবু রান্না নিয়ে উপদেশ কিংবা পরামর্শ তার দেয়া চাই। ডাল কেন লবণপোড়া হয় এ নিয়ে তার সবচেয়ে বেশী অভিযোগ। এ অভিযোগে দুই নিহাং স্বভাবতই বিব্রত বোধ করে। কারণ তাদের ধারণা তারা পৃথিবীর সেরা রাঁধুনী। কীভাবে রান্না করতে হবে তা সুরমা সিং বলার কে ! সুরমা সিং অসন্তোষ প্রকাশ করলে তারা খেঁকিয়ে ওঠে, 'আরে ব্যাটা, যাও না। বউ'র রান্না গিয়ে খেয়ে এসো।'

এ কথা শুনে হাসে অনেকে। কিন্তু সুরমা এতে কিছুই মনে করে না। সে দাঁত বের করে হেসে বলে, 'আমি মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করি না।'

'হো হো,' নিহাং গোফ চুমড়ে বলে ওঠে। 'তুমি মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ কর না কারণ তোমাকে দিয়ে মহিলাদের কোনও কাজ হবে না।

এ কথায় কান লাল হয়ে যায় সুরমা সিং-এর। আর নিহাং ভাইরা একবার এ বিষয় নিয়ে কথা শুরু করলে তাদেরকে থামায় কার সাধ্য ? 'এই সুরমা সিং একটা বদমাশের ধাড়ি। আমার কথা বিশ্বাস না হলে যে কোনও সকালবেলা ওর ওপর লক্ষ রেখো। মহিলারা যখন উঠোনে বসে রোদ পোহাতে, বুড়ো সুরমা সিং যায় তাদের কাছে। মহিলাদের প্যাচাল শোনে, তাই না সুরমা? বুড়ি মহিলাদের গপ্পো শুনে কী মজা পাও, সুরমা ? ...এবং মি. সুরমা সিং বাজপাখির চোখে তাকিয়ে থাকে উঠোনের অপরপ্রান্তে। ওখানে মেয়েরা কাপড় ধুতে আসে। সে ওখানে ঘোরাঘুরি করে। হাঁটাহাঁটি করতে গিয়ে কোনও কাপড় জড়িয়ে যায় তার গায়ে, কোনও কাপড় পায়ে বেঁধে হোঁচট খায়। তুমি সত্যি দারুণ জিনিস, সুরমা সিং। সত্যি গ্রেট ম্যান।'

দুই ভাইয়ের একজন ক্ষণিক বিরতি দেয়, অপরজন হাতের তালু ঘুরিয়ে সোৎসাহে বলতে থাকে, 'এইতো সেদিন সাজন সিংয়ের বড় বক্ষঅলা বউটা উঠোনে বসে কাপড় ধুচ্ছিল। আমাদের বন্ধু সুরমা সিং কল থেকে পানি তোলার ভান করে গেল সেখানে। ইচ্ছে করে পা পিছলাল সে। পড়ল গিয়ে মহিলার গায়ে। ভান করল এমন ব্যথা পেয়েছে যে কলতলা থেকে উঠতেই পারছে না। সগন সিং-এর বউ তখন সর্দার বাহাদুর সুরমা সিং-এর দাড়ি চেপে ধরে হিড়হিড় করে টেনে বের করে আনল বাথরুম থেকে। মাথায় কষে ক'ঘা লাগিয়ে দিল পায়ের চপ্পল খুলে। এদিকে চেচাঁমেচি শুনে তার স্বামী অকুস্থলে এসে হাজির। ঘটনা দেখে সে রাগে কাঁপছে। সুরমা সিং-এর তখুনি সে পটল তুলে দিত। কিন্তু লোকজনের বাধার মুখে পারেনি। বেচারা সুরমা সিং! পাগড়িটা খুলে দেখিয়ে দাও জুতোর বাড়ি খাওয়ার পরে আর ক'গাছা চুল অবশিষ্ট আছে তোমার মাথায়।'

এমন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল জনতা, গুরু দোয়ারার বাইরে দাঁড়ানো খচ্চরগুলো পর্যন্ত কেঁপে গেল ভয়ে। একজন নরম গলায় বলল, 'বেচারা চোখে দেখে না। শরীরে সূতোটি না রেখেও যদি কোনও মহিলা এসে দাঁড়ায় সামনে, তাতে সুরমা সিং-এর কী এসে যায় ?'

এক নিহাং ভাই জবাবে বলল, 'দেখার কী দরকার ? সে শব্দ শুনেই সব মজা লুটতে পারে। সে বলে দিতে পারে মহিলার বয়স কত, চেহারা কেমন, মহিলার গোপন আকাঙ্খা কী–সবকিছু, শুধু মহিলার কথা শুনেই সে এসব বলে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

সুরমা সিংকে দেখলাম আমার দিকে আসছে। মাথায় ধবধবে সাদা পাগড়ি, গায়ে ধোয়া পরিষ্কার জামা। চপ্পলের বদলে পায়ে পাম্প শূ। চোখে যথারীতি কালো চশমা- সম্ভবত: চশমা চোখে সে ঘুমায়ও।

আমি ভুটিয়ার দোকানে এসেছি। ভূটানিদের তৈরি নানা জিনিস পাওয়া যায় তার দোকানে-রান্নার তৈজসপত্র, সস্তা গহনা, ধাতব ট্রে সহ আরও নানা হাবিজাবি। ভূটিয়া

বোধহয় আমাকে মালদার পার্টি ভেবেছে। দাম চাইছে আকাশ ছোঁয়া। আমি কেনার আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম। তাকালাম পাহাড়ের দিকে। রাস্তার ওপাশে কোনও বাড়ি-ঘর নেই; শুধু পাথরে তৈরি বারো হাত উচুঁ দেয়াল। দেয়ালের গায়ে শ্যাওলা জমেছে। কতগুলো গয়াল পাখি শ্যাওলা থেকে পোকা খুঁটে খাচ্ছে। মনে হচ্ছে সবুজ কার্পেটের ওপর ছোট লাল ফুল।

এমন সময় আমি দেখতে পেলাম সুরমা সিংকে। হনহন করে হেঁটে আসতে দেখে অবাক লাগল। যেন অন্ধ নয় সে, চোখে দেখতে পাচ্ছে। আমার পাশ দিয়ে চলে গেল সুরমা, হাতে একটা খাঁচা। খাঁচার মধ্যে একটি সবুজ রঙের টিয়ে।

'ওই টিয়েটা,' পরে বড় শিখ ভাইটি বলেছিল আমাকে বুক চুলকাতে চুলকাতে, 'সুরমা সিং-এর কাছে পৃথিবীর মত। ওটাই তার সব-তার বাবা, মা, বোন, ছেলে, স্ত্রী, চাচা, চাচী....সবকিছু।'

নিহাং সুরমা সিংয়ের কথা বলছিল তীব্র ঘৃণা নিয়ে। সে জানত না সুরমা সিংয়ের জীবন আমাকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছে। কথা বলার সময় সে আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত। কড়াই'র ফুটন্ত ডালে রান্নার হাতা দিয়ে নাড়ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'টিয়েটা কথা বলতে পারে?'

'জ্বী, স্যার। সুরমা তাকে অনেক কথা বলতে শিখিয়েছে।'

'কী কথা বলতে শিখিয়েছে?'

'টিয়ে বলেঃ আসুন সর্দার মনজিৎ সিংজী।'

'ওটাই তার আসল নাম। কেউ সুরমার আসল নাম নিয়ে মাথা ঘামায় না। সবার কাছে সে স্রেফ সুরমা নামে পরিচিত। কেউ কেউ তাকে সরুমা সিং বলে।' হাসল নিহাং। 'সরুমা মানে শুয়ারের গু।' বলে চলল সে। 'পাখিটাকে সে আরও নানান কথা শিখিয়েছে। প্রেমের সংলাপও আছে।' ছোটভাই এবারে আলোচনায় অংশ নিল। 'আমার বন্ধু পাখিটিকে আরও কথা শিখিয়েছে। যেমনঃ সুরমা নারী লোভী, সুরমা মস্ত বদমাশ; সুরমা সত্যিকারের হারামী...'

আমি প্রসঙ্গ বদলাতে চাইলাম। বড়ভাই আমার অস্বস্তি লক্ষ করে বলল, 'স্যার, এই সুরমা সিং একটা অপদার্থ। ডাল তার পছন্দ নয়। সব্জি রাঁধলেও সে নাক সিঁটকায়। চাপাতিতে নানান খুঁত খুঁজে বেড়ায়। সে একবারও ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখে না যে আমরা রাঁধুনী নই। সে যে এখানে থাকার সুযোগ পাচ্ছে, দুটো খাওয়ার সুযোগ হচ্ছে, সেজন্যে তার গুরুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

আমি ওদের কথায় সায় দিয়ে বললাম গুরুর রান্নাঘরে যা রান্না করা হয় তাই কোনও রকম প্রতিবাদ না করে খেয়ে ফেলা উচিত সুরমা সিং-এর। 'গুরুদোয়ারার রান্না পছন্দ না হলে সুরমা সিং নিজেরটা নিজে রান্না করে খায় না কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমাদেরও তো একই কথা। কিন্তু জ্ঞানীজী ওকে বড্ড বেশী প্রশ্রয় দিচ্ছেন। সে সকালবেলা গুনগুন করে কীসব গায়। জ্ঞানীজী ভাবেন পৃথিবীর সেরা গায়ক সুরমা সিং। উনি সুরমা'র থাকার জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থাও করেছেন।'

অপরভাই বাধা দিল, 'আরে দূর ওটাকে ঘর বলে ! পায়খানার পাশে ছোট একটা স্টোররুম। ওখানে কাঠ, কয়লা, ময়দা, ডালসহ রান্নার নানান উপকরণ রাখা হয়। এ ঘরের এক কোণে সরদার সুরমা সিং তার চারপাই পেতেছে। মাথার ওপর ঝুলিয়ে রেখেছে টিয়ের খাঁচা।'

একদিন রাত দশটার দিকে টিয়ে ট্যাট্যা করে চেঁচাতে লাগল। এর আগে ওটার গলা কখনও শুনতে পাইনি আমি। চেঁচামেচি শুনে মনে হলো যেন খাঁচায় বাঘ ঢুকেছে। অনেকেই ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল কী ঘটেছে দেখতে। সুরমা সিং এবার খ্যাকখ্যাক করে উঠল টিয়েটাকে উদ্দেশ্য করে। ওরা কী বলছে শুনতে পেলাম না আমরা।

চিৎকার-চেচাঁমেচি চলল কিছুক্ষণ। তারপর শোনা গেল সুরমা সিং-এর আর্তচিৎকার 'বাঁচাও ! বাঁচাও ! মেরে ফেলল।'

টর্চলাইটটা নিয়ে দৌড়ে নামতে লাগলাম সিঁড়ি বেয়ে। দেখলাম বড়ভাইটা ছুটে বেরিয়ে এল সুরমা'র ঘর থেকে, হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

সাহায্যের জন্য চেচাঁমেচি করেই চলেছে সুরমা সিং। আরও লোকজন চলে এল অকুস্থলে। আমরা সুরমা সিংকে দোতলায় নিয়ে এলাম। সে ভয়ে কাঁপছে থরথর করে। তার কথা শুনে বুঝলাম নিহাংদের এক ভাই তার ঘরে ঢুকে তাকে রুমাল দিয়ে গলা পেঁচিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।

হৈ হট্টগোলে ঘুম ভেঙে গেছে জ্ঞানীজীর। তিনি চলে এলেন কী হয়েছে দেখতে। বড় নিহাং চুপিসারে নিজের ঘরে সেঁধিয়েছিল। তলব করা হলো তাকে। সে বলল সে সুরমা সিং-এর ঘরে ঢুকেছিল খাবার আনতে। খাবার নিয়ে চলে এসেছে। সে চলে আসার পরে কী ঘটেছে জানে না।

নিহাং যে মিথ্যা কথা বলছে বোঝা যাচ্ছিল পরিষ্কার। একজন নিহাং-এর পক্ষে সাফাই গাইতে এল। 'সুরমা সিং-সবসময় এই দুই বেচারার পেছনে লেগে আছে। এরা সারাদিন রান্নাঘরে খেটে মরে। অথচ নবাবজাদা সুরমা আশা করে তার ঘরে এরা খাবার দিয়ে যাবে।'

সুরমা সিং গলা ফাটিয়ে প্রতিবাদ করল। 'এরা রান্নাঘরে বসে সারাক্ষণ আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে। বিশেষ করে দুই নিহাং। দুইভাই মাঝে মাঝে আমার ডালের বাটিতে প্রশ্রাব করে দেয়। আবার ইচ্ছে করে আমার চাপাতি পুড়িয়ে ফেলে মুখে ছুড়ে ফেলে। আজই তো একজন খাবার এনে বলল, 'নে, হারামাজাদা, খা...'

বেশ একটা হট্টগোল লেগে গেল। সুরমা সিং ফুসফুসের সমস্ত শক্তি জড়ো করে অভিশাপ দিতে লাগল নিহাংদের। জ্ঞানীজী অনুনয়ের সুরে বললেন, 'এভাবে চেঁচাতে থাকলে তো গলার রগ ছিঁড়ে যাবে। তুমি কাল সকালে গান গাইবে কী করে ?'

এ ঘটনার পরে দুই নিহাং আবার হুমকি দিল তারা হেমকুন্ড চলে যাবে। জ্ঞানীজী অনুরোধ করলেন ওরা যাতে চলে না যায় সেজন্য, তিনি রুমালে নাক মুছলেন সশব্দে। সুরমা সিংকে এ ঘর থেকে নিয়ে যাওয়া হলো। ওদিকে জ্ঞানীজী তোষামোদ করে দুই নিহাংকে পাঠিয়ে দিলেন তাদের ঘরে।

গুরুদোয়ারার প্রার্থনা ঘরখানা বেশ বড়। ধবধবে সাদা দেয়াল ধাঁধিয়ে দেয় চোখ। হলঘরের একপাশে, উঁচু প্লাটফর্মে রাখা হয়েছে পবিত্র গ্রন্থ। জ্ঞানীজী সাধারণতঃ প্ল্যাটফর্মে বসেন। তার পেছনে একটি ছেলে বসে পাখা দিয়ে মাছি তাড়ায়। দেয়ালে ডজনখানেক বড় বড় ছবি টাঙানো। এর মধ্যে কয়েকটি ছবি শিখ গুরুদের; অন্য ছবিগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে শিখ ইতিহাস।

সুরমা সিং-প্রার্থনা সভায় আসে বেশ সেজেগুজে। পরনে থাকে পরিষ্কার সাদা শার্ট, হাতে বোনা চুড়িদার খদ্দর। মাথায় সাদা পাগড়ি, নীল রুমাল জড়ানো ঘাড়ে। চোখে ঝিলিক দেয়া কালো কাচের চশমা। হাতে তাম্বুরিন। লোকে বলে সুরমা সিং-এর শ্লোক নাকি বধিরেরও কানে প্রবেশ করে এবং ধর্মের সত্যি ও প্রশস্ত রাস্তায় নিয়ে যায় শ্রোতাকে।

আমি সুরমা সিং-এর ধর্মীয় গান শুনে মুগ্ধ হয়েছি। আমার মত নাস্তিকের হৃদয় যদি আলোড়িত হতে পারে, ধর্মবিশ্বাসী মানুষতো আরও বেশি আলোড়িত হবে। অবশ্য সুরমা সিং-এর শ্লোকের অনেক অর্থই আমি বুঝতে পারি না। তবে ওর আবৃত্তি করার ভঙ্গি অপূর্ব। তার গলায় আছে স্রোতের শক্তি। সে শক্তির বর্ণনা আমি দিতে পারব না। ওর কণ্ঠ দিয়ে প্রতিফলিত হয় ওর একাকীত্ব, বিশাল এই পৃথিবীতে তার অসহায়ত্ব, তার তৃষ্ণা, তার ক্ষুধা; এ তার আত্মার কান্না। যে কান্না সুর হয়ে ঝরে তার কণ্ঠে....

এক গুচ্ছ মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য; কেবল মৃদু আলো পাহাড় চুড়োয়।

ফোরম্যান আমার মালসামালের দিকে এক নজর বুলিয়ে জানতে চাইল, 'আপনার ক'জন কুলি লাগবে ?'

'একজন হলেই চলবে।'

'আপনি একা ?'

'জ্বী, আমি একা।'

সে মনে মনে হিসাব করতে লাগল কতটা মাল কুলি নিতে পারবে। আমি বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলাম। আমার ছোট অ্যাটাচিকেসটা খাটের নিচে। বই বন্ধ করে বললাম, 'শুধু ছোট একটি বেডিং রোল এবং ছোট একটি সুটকেস।' বিছানা থেকে নামলাম আমি। ফোরম্যান ঝুঁকে পরীক্ষা করল বেডিং এবং সুটকেস। 'দু'রূপী লাগবে, সাব।'

'বাসস্ট্যান্ডে যেতে কতক্ষণ লাগবে ?'

' পোনে এক ঘন্টা।'

'সকাল আটটার বাস ধরব আমি। পোনে সাতটার মধ্যে যেন চলে আসে কুলি।'

'আচ্ছা, সাব।'

চলে গেল ফোরম্যান। হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। এরকম চিৎকার-হট্টগোলের আওয়াজ প্রায়ই শোনা যায় এখানে, তবে চিৎকার ভেসে আসছে সুরমা সিং-এর ঘর থেকে। নিহাং দুটো সুরমা সিং-এর ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল নাতো ? আমি চট করে দরজা খুলে বেরুলাম। দেখি দুই নিহাং বসে পোর্সেলিনের মগে চা খাচ্ছে। 'চেঁচামেচি কীসের ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

কান পাতল ওরা। আমি সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে এলাম নিচে। সুরমা সিংয়ের ঘর থেকে আসছে গোলমালের আওয়াজ। ক'জন ভিড় করেছে ওখানে। আমি উঁকি দিলাম। মোটা, কুৎসিত চেহারার এক মহিলা উবু হয়ে বসেছে চারপাইতে, সুরমা সিং মেঝেতে, ছাগল দাড়ি এক শিখ সপাটে চড় মেরে চলেছে সুরমা সিং-এর মুখে। লোকটাকে দেখে মনে হলো শহরে থাকে। খাটো, ইয়া বড় ভূঁড়ি, হাত জোড়া কাঠি কাঠি, কাঠবেড়ালির থাবার মত নখ আঙুলে।

'হচ্ছেটা কী ?' জানতে চাইল জনতা।

হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল ছাগলা দাড়ি। 'এই লোকটা আমার স্ত্রীর দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে... ওকে তাকাতে মানা করেছি। তবু শোনে নি।' সে ব্যাখ্যা করল তার স্ত্রীর দিকে নাকি ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে ছিল সুরমা সিং।

এমন সময় ভিড় ঠেলে এলেন জ্ঞানীজী। দাঁড়ালেন ছাগল দাড়ির সামনে। প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'মশাই, এ সুরমা সিং। চোখে দেখতে পায় না। সে কী করে আপনার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকবে ? আর কোনও ঘর খালি নেই বলে আপনাকে তার ঘরে থাকতে দিয়েছিলাম। কিন্তু বেচারী যাবে কোথায় ?...'।

সুরমা সিং-এর চশমা ছিটকে পড়ে গেছে। তবে তার হামলাকারী তার দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছিল না। মহিলা বকা দিল স্বামীকে- 'কোনও কিছু ভালো করে না দেখেই মেজাজ গরম করার অভ্যাস তোমার আর গেল না।'

সর্দারজী চুপসে গেছে ফাটা বেলুনের মত, তাকে দাড়িতে অবিকল কাঠবেড়ালির মত লাগছে দেখতে। বোঝা যায় স্ত্রী তার ওপর ছড়ি ঘোরায়। সর্দারজী কিছু না বলে ব্যাগ হাতে বাজারে ছুটল সব্জি কিনতে। যেন পালিয়ে বাঁচল। জ্ঞানীজী ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভাইয়েরা, আপনারা আপনাদের কাজে যান। এখানে সার্কাস হচ্ছে না।'

জ্ঞানীজীর নাকি সুরের আদেশে কাজ হলো। ছত্রভঙ্গ হলো জনতা। জ্ঞানীজী মহিলার দিকে ফিরে বললেন, 'বোন, সুরমা সিংয়ের সোনার মত একটি কণ্ঠ আছে। আপনি তো আজই এলেন। কাল প্রার্থনা সভায় আসুন। ওর কণ্ঠে প্রার্থনা সঙ্গীত শুনুন। সুরমা সিং-এর কর্নের মায়াজালে বাঁধা পড়ে অনেক মন্দলোক অসৎপথ থেকে সরে এসেছে।'

মহিলা কিছু বলল না। চুপ হয়ে থাকল সুরমা সিং-ও। অপমানে মুখটা কালো। তবে জ্ঞানীজীর প্রশংসায় সে খুশি হয়েছে। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল।

লেখক পরিচিতি

বলবন্ত সিং-এর জন্ম ১৯২৬ সালে। তিনি একজন সৃজনশীল লেখক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে রাত, চোর অউর চান্দ (উপন্যাস) পাঞ্জাব কি কাহানিয়া (ছোট গল্প) জাগ্গা (গল্প ও নাটক)।